ছিন্নপত্র।

RARE B

NATIONAL LIBRARY
No. Imp. 4022
DATE 4/9/09
CALCUTTA

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রকাশক—
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শিলাইদহ, নদিয়া

30.JUN.13
182 mc 912.10

আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস্
৫৫, আপার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা
শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত
১৩১৯ সাল

ছিন্নপত্র।

১

৩০ অক্টোবর
১৮৮৫
বন্দোরা সমুদ্রতীর।

ভারি বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। এক সপ্তাহ ধরে ক্রমাগতই বৃষ্টি। এখনও বিরামের লক্ষণ নেই। আমার বারান্দার কাঁচের জানালা সমস্ত বন্ধ করে চুপ মেরে বসে আছি। নিতান্ত মন্দ লাগ্‌চেনা, আপনাতে আপনি বেশ একরকম আচ্ছন্ন হয়ে আছি—কোন প্রকার Emotion-এর প্রাবল্য নেই—ঝড় ঝঞ্ঝা যা কিছু সমস্তই বাহিরে। অসহায় অনাবৃত সমুদ্র ফুলে ফুলে ফেনিয়ে ফেনিয়ে শাদা হয়ে উঠ্‌ছে। সমুদ্রকে দেখে আমার মনে হয় কি একটা প্রকাণ্ড অন্ধ শক্তি বাঁধা পড়ে আস্ফালন করুচে—আমরা নিশ্চিন্ত মনে তীরে দাঁড়িয়ে আছি—সমুদ্রের বিস্ফারিত গ্রাসের মুখেই আমরা ঘর বাড়ি বেঁধে বসে আছি। আমরা যেন সিংহের কেশর ধরে টান্‌চি অথচ অসহায় সিংহ কিছু বল্‌তে পারচেনা—একবার যদি সমস্ত সমুদ্র ছাড়া পায় তাহলে আমাদের আর চিহ্নমাত্র থাকে না। খাঁচার মধ্যে বাঘ তার লেজ আছড়াচ্চে, আমরা কেবল দু হাত তফাতে দাঁড়িয়ে হাস্‌চি। একবার চেয়ে দেখুন কি বিপুল বল! তরঙ্গগুলো যেন দৈত্যের মাংসপেশীর মত ফুলে উঠ্‌ছে। পৃথিবীর সৃষ্টির আরম্ভ থেকে এই ডাঙায় জলে লড়াই চল্‌চে—ডাঙা ধীরে ধীরে নীরবে এক এক পা করে আপনার অধিকার বিস্তার করুচে, আপনার সন্তানদের ক্রমেই

কোল বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিচ্চে—আর পরাজিত সমুদ্র পিছু হটে হটে কেবল ফুঁসে ফুঁসে বক্ষে করাঘাত করে মরচে। মনে রাখবেন এক কালে সমুদ্রের একাধিপত্য ছিল—তখন সে সম্পূর্ণ মুক্ত। ভূমি তারই গর্ভ থেকে উঠে তার সিংহাসন কেড়ে নিয়েছে, উন্মাদ বৃদ্ধ সমুদ্র তার শুভ্র ফেনা নিয়ে King Lear-এর মত ঝড়ে ঝঞ্ঝায় অনাবৃত আকাশে কেবল বিলাপ করচে।

২

সোলাপুর
অক্টোবর
১৮৮৫

আপনি ত সব্‌-ডেপুটি সাহেব—বন্যার মুখে বাংলা মুল্লুকে ভেসে বেড়াচ্চেন—আমরা কলকাতায় যাচ্চি সে খবর রাখেন কি? এই চিঠি এবং আমরা শুক্রবারের সকালের ডাকে কলিকাতায় বিলি হব। আমাদের প্রবাসের পালা সাঙ্গ করলুম—এখানকার অগাধ আকাশ, অবাধ বাতাস, উদার মাঠ, বিমল শান্তি এসব পশ্চাতে রেখে সেই বাঁশ-তলার গলি, যোড়াসাঁকোর মোড়, সেই ছেক্‌ড়া গাড়ির আস্তাবল, সেই ধুলো, সেই ঘড়্‌ ঘড়্‌—হুড়্‌ মুড়্‌—হৈ হৈ, সেই মাছি-ভন্‌ভন্‌ ময়রার দোকান, সেই ঘোরতর হিজিবিজি হ-য-ব-র-লর মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন করতে চল্‌লুম। সেখানে তিন হাজার গির্জ্জের চূড়ো, কলের চিমনি, জাহাজের মাস্তুল নীল আকাশে যেন গুঁতো মারতে উঠেচে, কলকাতা তার সমস্ত লোষ্ট্রকাষ্ঠ দিয়ে প্রকৃতিকে গঙ্গা পার করেছে—তার উপরে আবার এক পাঁচিল দেওয়া নিমতলার ঘাট, মানুষের মরেও সুখ নেই। এখানে আমরা ক'জনে মিলে অশোক কাননের নীড়ের মধ্যে ছিলুম, সেখানে এক প্রকার ইটের খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করতে চল্লুম। সেখানকার সেই লক্ষ লক্ষ কয়েদির সঙ্গে Municipalityর দুর্গের মধ্যে বন্দী হতে চল্লুম। শুনে সুখী হলেন ত?

এতদিন ভুলে ছিলেম কিন্তু আজ আবার আমার সেই পর্দ্দাটানা ঘোমটা-দেওয়া ঘরটি মনে পড়চে।—কিন্তু কোথায় আপনি, কোথায় আপনার সেই ছাতা, পাপোষ-শয্যায় শয়ান সেই পুরাতন জুতোযুগল! আমার সেই হৃষ্টপুষ্ট বিরহিনী তাকিয়া—সে কি আমাদের বিরহে রোগা হয়ে গেছে, আমি তাই ভাবচি। আমার বইগুলো কাঁচের অন্তঃপুর থেকে চেয়ে আছে—কিন্তু কার দিকে চেয়ে আছে? আমার শূন্যহৃদয়া চৌকি দিনরাত্রি তার দুই বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু এখন তার এই নীরব আহ্বান কেউ গ্রাহ্য করে না। আমার সেই ঘড়িটা টিক্‌ টিক্‌ করচে, সে বড় একটা কাউকে খাতির করে না, সে কেবল সময়ের পদচিহ্নের হিসেব রাখ্‌তেই ব্যস্ত।—কিন্তু আমার

সেই হার্মোনিয়ম ! সে আপনার নীরব সঙ্গীতের উপর বনাত মুড়ি দিয়ে ভাব্‌চে, ঘড়িটা ব্রাকেটের উপরে দাঁড়িয়ে মিছে মিছি তাল দিয়ে মরুচে কেন ? দেয়ালগুলো তাকিয়ে আছে—ভাব্‌চে ঘরের প্রধান আস্‌বাবটা গেল কোথায় ? কলকাতার সেই জনতাসমুদ্রের মধ্যে আমার সেই বিরহান্ধকার ঘরটিই কেবল বিজন। তার সেই রুদ্ধ দ্বারের ভিতর থেকে কাতর স্বর উঠ্‌চে—"রবি বাবু--উ--উ--উ।" রবিবাবু আজ এখান থেকে সাড়া দিচ্চেন—"এই যা--আ--আ--ই।"

কল্‌কাতায় ফিরে গিয়ে কি আর আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে না ? আপনি কি এখন ইহজন্মের মত সব্‌ ডেপুটিপুরে প্রয়ান করলেন ? শীঘ্র আর মুক্তির ভরসা নেই ? আইনের গলগ্রহ গলায় বেঁধে আপনি কি তা হলে সর্ব্বিস-সরোবরে একরকম ডুব মারলেন ? যাক্‌, তা হলে আপনার আশা একেবারে পরিত্যাগ করে আমরা আস্‌মানে বিহার করি আর বলাবলি করি "আহা, শ্রীশ বাবু লোকটা ছিলেন ভাল।"

৩

১৭ এপ্রেল

১৮৮৬

সাব্ ডেপুটি সা'ব,—

৺গয়াধামে আপনি গমন করেচেন, এখন আমার কি গতি করে গেলেন? আপনার দর্শন আমার নিয়মিত বরাদ্দের মত হয়ে গিয়েছিল এখন তার থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি মৌতাতহীন অহিফেন-সেবীর মত ছট্‌ফট করচি। বাস্তবিক আপনি আমাকে অহিফেনই ধরিয়েছেন বটে। আপনি এসে নানা কৌশলে আমাকে গোটাকতক ছোট ছোট কল্পনার গুলি গেলাতেন, আমার স্বপ্ন জাগিয়ে তুল্‌তেন, আমাকে আমারই প্রভাতসঙ্গীত সন্ধ্যাসঙ্গীতের মধ্যে আচ্ছন্ন করে ফেল্‌তেন, আমি চোখ বুজে আনন্দে আমার নিজের মধ্যে প্রবেশ করে বসে থাক্‌তুম এবং সেইখান থেকে নেশার ঝোঁকে স্বগত উক্তি প্রয়োগ কর্ত্তুম, আপনি শুনে মনে মনে হাস্‌তেন। আফিমের নেশা একেই বলে। আত্মম্ভরিতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে নিজের স্বপ্নে ভোর হওয়াকেই বলে আফিমের নেশা। আপনি সেই নেশাটাই আমাকে অভ্যেস করিয়েচেন। আপনি প্রায় আপনার নিজের কথা বল্‌তেন না, উল্‌টে পাল্‌টে আমারই কবিতা, আমারই লেখা, আমারই কথার মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে ফেল্‌তেন—আমাকে খুব মাতিয়ে রেখেছিলেন যাহোক্। ইংরেজেরা বর্ম্মায়, চীনে আফিম্ ঢুকিয়েচে, আপনি আমার সেই অয়েলক্লথ্ মণ্ডিত ক্ষুদ্র ঘরটার মধ্যে গোপনে অলক্ষ্যে আফিমের ব্যবসা প্রবেশ করিয়েচেন—আপনি সহজ লোক্‌টা নন্। কিন্তু একবার আফিম্ ধরিয়ে আপনি কৌটা সমেত কোথায় অন্তর্ধান হলেন? আমি মৌতাত-বিরহে এই দুরন্ত গ্রীষ্মে একলা ঘরে বসে দুবেলা হাই তুল্‌চি এবং গা-মোড়া দিচ্চি। নিদেন, আমার দ্বারের পার্শ্বে আপনার সেই পরিচিত ছাতিটা, জুতোটা রেখে গেলেও আমার কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা ছিল। আপনার পত্র পাঠে অবগত হলেম্ আপনি শ্রীগয়াধামে আপনার প্রেতপুরীতে মনুষ্যাভাবে নিতান্ত কাতর আছেন, কিন্তু আপনার কাজ আপনার সঙ্গী অর্থাৎ আপনি আছেন এবং আপনার চিরসঙ্গী "সাব্-ডেপুটি" আপনার ছায়ার মত সঙ্গে আছেন॥ সে সঙ্গীকে

এখনও আপনার তেমন ভাল লাগচে না কিন্তু ক্রমে তার প্রতি প্রীতি জন্মান কিছু অসম্ভব নয়।

আমি-ব্যক্তির হাতে এখন কোন কাজকর্ম্ম নেই—চাপকানের বোতামগুলো খুলে দেহ এলিয়ে এখন গায়ে বাতাস লাগাচ্চি। সৌভাগ্যক্রমে এখন অহিফেনের ততটা দরকার বোধ হচ্চে না। আমার তাকিয়ার মধ্যে স্বপ্ন পোষা রয়েচে—সেটা একটা স্বপ্নের বৃহৎ ডিবের মত বোধ হচ্চে, তার উপরে মাথা রাখলেই মাথার মধ্যে হুহু করে নেশা প্রবেশ করে। এতদিন মাথার উপরে বালক কাগজের বোঝাটা থাকাতেই মাথা যেন রুদ্ধ হয়ে ছিল, নেশা একেবারে ছুটে গিয়েছিল—এখন সমস্ত খোলাসা—দক্ষিণে বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা যেন চারদিকে উড়ে বেড়াচ্চে।

এ সময়ে আমাকে যদি একটা বাগান দিতে পারতেন। নদীর তীর, গাছের ছায়া, মাঠের বাতাস, আমের বোল, কোকিলের কুহু, বসন্তী রঙের চাদর, বকুল ফুলের মালা, এবং সেই সঙ্গে আপনাকেও চাচ্চি। কল্‌কাতা সহর, পোলিটিকেল্ এজিটেষন্, বসন্ত-কালে এ ত সহ্য হয় না। কোথায় আপনার বাগান শ্রীশ বাবু, কোথায় আপনি! সংস্কৃত কবি বলেচেন—

সঙ্গম বিরহ বিকল্পে
বরমপি বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ
সঙ্গে সৈব তথৈকা
ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।

ভাবার্থঃ "সঙ্গম এবং বিরহের মধ্যে বরং বিরহ ভাল তবু সঙ্গম কিছু না—কারণ মিলনের অবস্থায় সে একা আমার কাছে থাকে মাত্র, আর বিরহাবস্থায় ত্রিভুবন তা'তেই পূরে যায়।" কিন্তু ভট্‌চার্য্যি মশায়ের সঙ্গে আমার মতের মিল হল না—আপনার বিরহে আমার এই রকম মনে হচ্চে যে, ত্রিভুবনময় শ্রীশ বাবুর ঝাঁক থাকার চেয়ে হাতের কাছে এক্‌টা শ্রীশ বাবু থাকা ভাল। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে "ঝোপের মধ্যে গণ্ডাখানেক পাখী থাকার চেয়ে মুঠোর মধ্যে একটা পাখী থাকা ঢের ভাল।" এ সম্বন্ধে আমি এই ইংরেজের মত practical view নিয়ে থাকি। আপনি কি বলেন আমি জান্‌তে ইচ্ছে করি।

৪

৩০ এপ্রেল

১৮৮৬

ইতিমধ্যে একদিন গো—বাবুদের ওখানে যাওয়া গিয়েছিল। সেখানে আমি আপনার "বাঙ্গালার বসন্তোৎসবের" কথা পাড়লুম, আশ্চর্য্য হলুম, তাঁরাও সকলে একবাক্যে আপনার এই লেখার প্রশংসা করলেন। আশ্চর্য্য হবার কারণ এই যে, ভাল লাগা এক, এবং ভাল বলা এক। ভাল জিনিষ সহজেই ভাল লাগে, তর্কবিতর্ক যুক্তি বিচার করে ভাললাগে না—কিন্তু সমালোচনা করবার সময়ে মনের মধ্যে এমনি তর্কবিচারের প্রাদুর্ভাব হয়, যে, থপ ক'রে একটা জিনিষকে ভাল বলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে ওঠে। তখন মনে হয়, যে লেখাটা পড়লুম সেটা লিখচে কে, তাতে আছে কি, তাতে নূতন কথা বলা হয়েচে কি, এই রকম লেখাকে সমালোচকেরা কি বলে থাকে, এ কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং তার পরে দেখতে দেখতে দলে দলে "যদি" "কিন্তু" "কি জানি" "হয় ত" প্রভৃতি সহস্র রক্তশোষকের আমদানী হয়। তাঁরা চতুর্দ্দিকে তিন ক্রোশের মধ্যে রসকস কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না। "ভাল লাগা" জিনিষটি এম্নি কোমল সুকুমার যে, ভাল লেগেচে কি না এই সহজ সত্যটুকু ঘটা করে প্রমাণ কর্ত্তে বস্‌লে সে ব্যক্তি যায়-যায় হয়ে ওঠে। সমালোচকেরা আপনার বিরুদ্ধে আপনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে থাকে, ভাল লাগলেও তারা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করে দেয় যে ভাল লাগেনি। এই গেল সমালোচনতত্ত্ব। যাহোক্, আপনার বহিটা শেষ হয়ে গেলে সাধারণ পাঠকদের কি রকম লাগে জানতে ইচ্ছে রইল। হয়ত বা ভাল লাগ-তেও পারে। ভাল লাগবার একটা কারণ এই দেখচি, আপনি আপনার কেতাবের মধ্যে আমাদের চিরপরিচিত বাংলাদেশের একটি সজীব মূর্ত্তি জাগ্রত করে তুলেচেন, বাংলার আর কোন লেখক এতে কৃতকার্য্য হন নি। এখনকার অধিকাংশ বাংলা বই পড়ে আমার এই মনে হয় যে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সময় বাংলাদেশই ছিল কি না ভবিষ্যতে এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। আপনি হয় ত শুনে থাকবেন কোনো

মার্কিন দেশীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্ বলেন, পাণিনি যে ভাষার ব্যাকরণ, সে ভাষাই কোনকালে ছিল না—তিনি দেখেছেন পাণিনিতে এমন অনেক ধাতু প্রভৃতি পাওয়া যায় সমস্ত সংস্কৃত ভাষায় যা খুঁজলে মেলে না। এইরূপ নানা কারণে তিনি ঠিক করে রেখেছেন যে পাণিনি ব্যাকরণটি এমন একটি ঘোড়ার ডিম যা কোন ঘোড়ায় পাড়েনি। অনেক ভাষা আছে যার ব্যাকরণ এখনও তৈরি হয়নি কিন্তু কে জানত এমন ব্যাকরণ আছে যার ভাষা তৈরি হয় নি? এই ঘটনায় আমার মনে হয়েছে ভবিষ্যতে এমন একজন তত্ত্বজ্ঞের প্রাদুর্ভাব হতে পারে, যিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিতে পারবেন, যে, বাংলা সাহিত্য যে দেশের সাহিত্য সে দেশ মূলেই ছিল না—তখন বঙ্কিম বাবুর এত সাধের "সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং," পুরাতত্ত্বের গবেষণার তোড়ে কোথায় ভেসে যাবে! পণ্ডিতেরা বলবেন, বঙ্গসাহিত্য একটা কলেজের সাহিত্য, এটা দেশের সাহিত্য নয় কিন্তু সে কলেজটা ছিল কোথায় এ বিষয়ে কিছুই মীমাংসা হবে না। আপনার সেই লেখাটির মধ্যে বাংলাদেশের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-বিভাগের জিওগ্রাফির প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। আপনার সেই লেখার মধ্যে অধিকাংশ স্থলে বাংলার ছেলেমেয়েরা কালেজি কথা কয় না ও কালেজি কাজ করে না, তারা প্রতিদিন গৃহের মধ্যে যে রকম কথা কয় ও যে রকম কাজ করে তাই দেখতে পাওয়া যায়। অন্য কারো অথবা ক্ষুদ্র আমার লেখায় সেইটি হবার যো নেই। কিন্তু আপনাকে আর অহঙ্কৃত করা হবে না, অতএব এখানেই সমালোচনায় ক্ষান্ত হলুম।

৫

১৮৮৮।

আপনার চিঠি এইমাত্র পেলুম, বেলা দশটা বেজে গেছে। বাহিরে অসহ্য উত্তাপ আমাদের ঘরের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ—অন্ধকার—মাথার উপরে পাখা আনা-গোনা করচে; আর্দ্র খস্‌খস্‌ ভেদ করে প্রচণ্ড পশ্চিম পবন শীতল ভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করচে। ঘরের মধ্যে এক রকম আছি ভাল। সেই পুরাতন ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ে চিঠি লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছি। আপনার ফুলজানি আমি পূর্ব্বেই ভারতীতে পড়েছি এবং পড়েই আপনাকে একটা চিঠি লিখব মনে করেছিলুম। তার পরে ভাবলুম আপনি একেই ত চিঠির উত্তর বহু বিলম্বে দেন তার পর যদি বিনা উত্তরেই চিঠি লিখি তবে আপনাকে অত্যন্ত আস্কারা দেওয়া হয়। এ রকম ব্যবহার পেলে বন্ধুদের স্বভাব খারাপ হয়ে যায়। তাই নিবৃত্ত হলুম। আপনার লেখা আমার ভারি ভাল লাগে। ওর মধ্যে কোন রকম নভেলি মিথ্যা ছায়া নেই। আর এমন একটি ছবি মনে এনে দেয় যা আমাদের দেশের কোন লেখকের লেখাতে দেয় না। আপনি কোন রকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না—সরল মানবহৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে—এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস তাই আপনি দেখাবেন। শীতল ছায়া, আম কাঁঠালের বন, পুকুরের পাড়, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা এরি মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে, তরল কলধ্বনি তুলে, বিরহ মিলন হাসি কান্না নিয়ে যে মানব-জীবনস্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্চে তাই আপনি আপনার ছবির মধ্যে আনবেন। প্রকৃতির শান্তির মধ্যে, স্নিগ্ধচ্ছায়া শ্যামল নীড়ের মধ্যে যে সব ছোট ছোট হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাস করচে দয়েল কোকিল বউকথাকওয়ের গানের সঙ্গে মানবহৃদয়ের যে সকল আকাঙ্ক্ষাধ্বনি মিশ্রিত হয়ে অবিশ্রাম আকাশের দিকে উঠছে আপনার লেখার মধ্যে সেই ছবি এবং সেই গান মেশাবেন। কোন রকম জটিলতা বা চরিত্রবিশ্লেষণ বা দুর্দ্দান্ত অসাধারণ হৃদয়াবেগ এনে স্বচ্ছ মধুর শান্তিময় ঘটনাস্রোতকে

ঘোলা করে তুল্‌বেন না। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি অধিক ফলাও কাণ্ড না করেন তাহলে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসলেখকের সঙ্গে সমান আসন পেতে পারবেন। বাংলার অন্তর্দেশবাসী নিতান্ত বাঙালীদের সুখদুঃখের কথা এ পর্য্যন্ত কেহই বলেন নি— আপনার উপর সেই ভার রইল। বঙ্কিম বাবু উনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙালীর কথা যেখানে বলেছেন সেখানে কৃতকার্য্য হয়েছেন, কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙালীর কথা বল্‌তে গিয়েছেন সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে; চন্দ্রশেখর প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় মানুষ এঁকেছেন (অর্থাৎ তাঁরা সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোকই হতে পারতেন, তাঁদেব মধ্যে জাতি এবং দেশকালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙালী আঁকতে পারেন নি। আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্য্যশীল, স্বজনবৎসল বাস্তুভিটাবলম্বী প্রচণ্ডকর্ম্মশীল-পৃথিবীর এক নিভৃতপ্রান্তবাসী শান্ত বাঙালীর কাহিনী কেউ ভাল করে বলে নি। ? ? ?

৮

১৮৮৭।

মা ভৈঃ মা ভৈঃ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আস্‌বে কিন্তু "সপ্তাহ" * আর বের হবে না। অতএব বন্ধুবান্ধবেরা সকলে নিশ্চিন্ত হোন। ভেবে দেখুন কি করতে বসেছিলুম! সপ্তাহ বের করবার ছল করে জীবন থেকে সপ্তাহগুলো একেবারে লোপ কর্ত্তে বসেছিলুম। এখন যেমন আমি সপ্তাহে সাতটা দিন করে পাই তখন সপ্তাহে সাতটা দিন বাদ পড়ত। মাসের পর মাস আস্‌ত—কিন্তু সপ্তাহ নেই; দিনগুলো আমাকে লাঠি হাতে তাড়া করে বেড়াত। আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব ভেবে পেতুম না। হরিশ্চন্দ্র যেমন বিশ্বামিত্রকে সমস্ত পৃথিবী দান করে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন অবশেষে স্বর্গ টা পর্য্যন্ত অদৃষ্টে জুটলনা—আমিও তেম্‌নি আমার সমস্ত সময় পরের হাতে দিয়ে অবশেষে স্বর্গ পর্য্যন্ত খোয়াতুম—কারণ খবরের কাগজ লিখে এ পর্য্যন্ত কেউ অমরলোক প্রাপ্ত হয় নি। এই বসন্তকাল এসেছে—দক্ষিণের হাওয়া বয়েছে—এ সময়টা একটু আধটু গানবাজনার সময়—এ সময়টা যদি কেবলি রুস, চীন, পাঠানের অরাজকত্ব, মগের মুল্লুক, আবকারী ডিপার্টমেন্ট, নুনের মাশুল, তারের খবর এবং পৃথিবীর যত সয়তানের প্রতি নজর রাখতে হয় তাহলে ত আর বাঁচিনে। পৃথিবীর গুপ্তচর হয়ে বেঁচে কোন সুখ নেই। জীবনে ত বসন্তকাল বেশী আসে না। যতদিন যৌবন ততদিন গোটাকতক বসন্ত হাতে পাওয়া যায়—সে কটা না খুইয়ে মনে করচি বুড়ো বয়সে একটা খবরের কাগজ খুলুব—তখন হয়ত প্রাণ খোলা নেই, গান বন্ধ, সেই সময়টা ভাঙাগলায় পলিটিক্স প্রচার করা যাবে। এখনো অনেক কথা বলা বাকী আছে সে গুলো হয়ে যাক্‌ আগে। কি বলেন!—আপনার চিঠিতে রাণী শরৎসুন্দরীর বিবরণ পড়ে আমার বড় ভাল লাগল। আপনি তাঁর স্নেহ ভোগ করেচেন এ আপনার নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা। তাঁর জীবনসম্বন্ধে কিছু লিখলে ভাল হয়। আমাদের মহদ্দৃষ্টান্ত নানা কারণে আমাদের নজরে পড়ে না সে গুলো যাতে আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে সে চেষ্টা করা উচিত।

* সপ্তাহ নামক সাপ্তাহিক পত্র বাহির করার আয়োজন উপলক্ষ্যে লিখিত।

৭

অক্টোবর
১৮৮৭

আমি প্রায় এক মাস কাল দার্জ্জিলিঙে কাটিয়ে এলুম। আপনার পত্র কল্‌কাতায় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমি ফিরে এসে পেলুম। আপনাকে অনেক দিন থেকে লিখি লিখি করচি, কিন্তু দৈব বিপাকে হয়ে ওঠে নি। এবার আমার ততটা দোষ ছিল না। আমার কোমরে বাত হয়ে কিছুকাল শয্যাগত হয়ে পড়েছিলুম এখনো ভাল করে সারিনি। তবে এখন বিছানা থেকে উঠে বসেছি। কিন্তু বেশীক্ষণ চৌকিতে বসে থাক্‌তে পারি নে। আমার কোমর ছাড়া পৃথিবীতে আর আর সমস্ত মঙ্গল। আমার স্ত্রী কন্যা দার্জিলিঙে, আমি কলকাতায় ঘরে বসে বিরহ ভোগ করচি—কিন্তু বিরহের চেয়ে কোমরের বাতটা বেশী গুরুতর বোধ হচ্চে। কবিরা যাই বলুন আমি এবার টের পেয়েছি বাতের কাছে বিরহ লাগে না। কোমরে বাত হলে চন্দনপঙ্ক লেপন করলে দ্বিগুণ বেড়ে ওঠে—চন্দ্রমাশালিনী পূর্ণিমা-যামিনী সান্ত্বনার কারণ না হয়ে যন্ত্রণার কারণ হয়—আর স্নিগ্ধ সমীরণকে বিভীষিকা বলে জ্ঞান হয়—অথচ কালিদাস থেকে রাজকৃষ্ণ রায় পর্য্যন্ত কেউই বাতের উপর একছত্র কবিতা লেখেন নি, বোধ হয় কারু বাত হয় নি। আমি লিখ্‌ব।—এই প্রসঙ্গে আমি আপনাকে একটা তত্ত্বের মীমাংসা জিজ্ঞাসা করি—বিরহের কষ্টই বা কেন কবিতার বিষয় আর বাতের কষ্টই বা কেন কবিতার বিষয় নয়। কোমরটাকে যত সামান্য বোধ হত এখন ত তত সামান্য বোধ হয় না। হৃদয় ভেঙে গেলেও মানুষ মাথা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে—কিন্তু কোমর ভেঙে গেলেই মানুষ একেবারে কাৎ—তার আর উত্থানশক্তি থাকে না। তখন প্রেমের আহ্বান, স্বদেশের আহ্বান, সমস্ত পৃথিবীর আহ্বান এলেও সে কোমরে টার্পিন তেল মালিষ করবে। যতদিন মানুষের কোমর না ভাঙে ততদিন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি মানুষ ঠিক অনুভব কর্ত্তে পারে না—আপনি কেতাবে পড়েচেন কিন্তু তবুও জানেন না যে জননী বসুন্ধরা ক্রমাগতই আমাদের মধ্যদেশ ধরে আকর্ষণ করচেন—বাত হলেই তবে

তাঁর সেই মাতৃস্নেহের প্রবল টান সবিশেষ অনুভব করা যায়। যা হোক্ শ্রীশ বাবু বন্ধুর দুর্দ্দশা অবধান করে কোমরকে আর কখনো হেয়জ্ঞান করবেন না—কপাল ভাঙা সে ত রূপক মাত্র—কিন্তু কোমর ভাঙা অত্যন্ত সত্য—তাতে কল্পনার লেশমাত্র নেই। সেই সত্য বর্ত্তমান কালে অত্যন্ত অনুভব করচি বলে আপনাকে আর চিঠি লিখতে পারচিনে। বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আপনি প্রশ্ন করেচেন সে বিষয় পরে উত্থাপন করা যাবে আপাততঃ এই বলে রাখচি বাল্যবিবাহ যে ইচ্ছে করুক—কিন্তু কোমরে বাত যেন কারো না হয়।

Humour! Eh? -.... ——

৮

২৭ জুলাই

১৮৮৭

বহুদিন চিঠিপত্র লিখিনি, কারণ চিঠি লেখা কম কাণ্ড নয়। দিনের পর দিন চলে যাচ্চে—কেবল বয়স বাড়চে। দু বৎসর আগে পঁচিশ ছিলুম এইবার সাতাশে পড়েছি—এই ঘটনাটাই কেবল মাঝে মাঝে মনে পড়চে—আর কোন ঘটনা ত দেখচিনে। কিন্তু সাতাশ হওয়াই কি কম কথা! কুড়ির কোঠার মধ্যাহ্ন পেরিয়ে ত্রিশের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া।—ত্রিশ-অর্থাৎ-ঝুনো-অবস্থা। অর্থাৎ যে অবস্থার লোকে সহজেই রসের অপেক্ষা শস্যের প্রত্যাশা করে—কিন্তু শস্যের সম্ভাবনা কই! এখনও মাথা নাড়া দিলে মাথার মধ্যে রস থল্ থল্ করে—কই তত্ত্বজ্ঞান কই! লোকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করচে—"তোমার কাছে যা আশা করচি তা কই? এতদিন আশায় আশায় ছিলুম তাই কচি অবস্থার শ্যাম শোভা দেখেও সন্তোষ জন্মাত—কিন্তু তাই বলে চিরদিন কচি থাক্‌লে ত চল্‌বে না। এবারে—তোমার কাছে কতখানি লাভ করতে পারব তাই জান্‌তে চাই—চোখে-ঠুলি-বাঁধা নিরপেক্ষ সমালোচকের ঘানি-সংযোগে তোমার কাছ থেকে কতটুকু তেল আদায় হতে পারে এবার তার একটা হিসেব চাই!"—আর ত ফাঁকি দিয়ে চলে না। এতদিন বয়স অল্প ছিল, ভবিষ্যতে সাবালক অবস্থার ভরসায় লোকে ধারে খ্যাতি দিত। এখন ত্রিশ বৎসর হতে চল্‌ল আর ত তাঁদের বসিয়ে রাখলে চলে না। কিন্তু পাকা-কথা কিছুতেই বেরোয় না শ্রীশ বাবু। যাতে পাঁচ জনের কিছু লভ্য হয় এমন বন্দোবস্ত করতে পার্‌চিনে। ছুটো গান বা গুজোব, হাসি বা তামাসা এর চেয়ে বেশী আর কিছু হয়ে উঠ্‌ল না। যারা প্রত্যাশা করেছিল তারা মাঝের থেকে আমারই উপর চট্‌বে। কিন্তু কে তাদের মাথার দিব্যি দিয়ে প্রত্যাশা করতে বলেছিল। হঠাৎ একদিন বৈশাখের প্রভাতে নববর্ষের নূতন পত্র পুষ্প আলোক ও সমীরণের মধ্যে জেগেউঠে যখন শুনলুম আমার বয়স সাতাশ তখন আমার মনে এই সকল কথার উদয় হল। আসল কথা—যতদিন আপনি কোন লোককে বা বস্তুকে সম্পূর্ণ না জানেন ততদিন কল্পনা

ও কৌতূহল মিশ্রিয়ে তার প্রতি একপ্রকার বিশেষ আসক্তি থাকে। পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত কোন লোককে সম্পূর্ণ জানা যায় না—তার যে কি হবে কি হতে পারে কিছুই বলা যায় না, তার যতটুকু সম্ভূত তার চেয়ে সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু সাতাশ বৎসরে মানুষকে একরকম ঠাহর করা যায়—বোঝা যায় তার যা হবার তা একরকম হয়েচে—এখন থেকে প্রায় এই রকমই বরাবরই চল্‌বে—এ লোকের জীবনে হঠাৎ আশ্চর্য্য হবার আর কোন কারণ রইল না। এই সময়ে তার চারদিক থেকে কতকগুলো লোক ঝরে যায়, কতকগুলো লোক স্থায়ী হয়—এই সময়ে যারা রইল তারাই রইল। কিন্তু আর নূতন প্রেমের আশাও রইল না, নূতন বিরহের আশঙ্কাও গেল। অতএব এ এক রকম মন্দ নয়। জীবনের আরামজনক স্থায়িত্ব লাভ করা গেল। আপনাকেও বোঝা গেল এবং অন্যদেরও বোঝা গেল। ভাবনা গেল।

আজকাল আমাদের এখানে বর্ষা পড়েছে। ঘন মেঘ ও অবিরাম বৃষ্টি। এই সময়ই ত বন্ধুসঙ্গমের সময়। এই সময়টা ইচ্ছে করচে, তাকিয়া আশ্রয় করে পড়ে পড়ে যা-তা বকাবকি করি। বাইরে কেবল ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি—ঝন্ ঝন্ বজ্র— হু হু বাতাস এবং রাজপথে সেকড়া গাড়ির জীর্ণ চক্রের কদাচিৎ খড়খড় শব্দ। ইংরাজরাজের উপদ্রবে তাও ভাল করে হবার যো নেই—ইংরাজ রাজত্বে বজ্র বৃষ্টি বাতাস এবং সেকড়া গাড়ির অভাব নেই—কিন্তু এই রাক্ষসী তার দেশ-বিদেশ-ব্যাপী আফিস আদালত প্রভৃতি বদন-ব্যাদান পূর্ব্বক তাকিয়ার কোমল কোল শূন্য করে আমাদের গোটা গোটা বন্ধু-বান্ধবদের গ্রাস করে ফেল্‌চে; এই ভরা বাদরে আমাদের মন্দির হাহাকার করচে। আষাঢ়ে গল্প নামক আমাদের একটি নিতান্ত দেশজ পদার্থ অন্যান্য সহস্র দেশজ শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাবার উপক্রম করচে। আমাদের সেই বহু পুরাতন আষাঢ় সহস্র দালান ও চণ্ডীমণ্ডপের চক্ষের সম্মুখে অবিশ্রাম কেঁদে মরচে কিন্তু তার আষাঢ়ে গল্প নেই। আমাদের সেই শত শত গান গল্প সাহিত্য-চর্চ্চার স্মৃতিতে ও তুলোতে পরিপূর্ণ তাকিয়াই বা কোথায়, আমিই বা কোথায়, এবং আপনিই বা কোথায়। যদুপতিই বা কোথায়, মথুরাপুরীই বা কোথায়। অতএব হে বন্ধুবর

ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমন স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্য বধারয়।

এই আমার চিঠির Moral, তত্ত্ব, উদ্দেশ্য—অতএব কেবল এইটুকু গ্রহণ করে বাকিটুকু বাদ দেবেন কিন্তু চট্‌পট্ উত্তর দিতে ভুলবেন না।

আপনার বিশেষরূপে মনে থাক্‌বে বলে এই চিঠির কিয়দংশ পদ্যে অনুবাদ করে পাঠাই। অবধান করা হউক—বন্ধুহে

পরিপূর্ণ বরষায়
আছি তব ভরসায়,
কাজ কর্ম্ম কর সায়,—
এস চট্‌পট্‌।
শাম্‌লা আঁটিয়া নিত্য
তুমি কর ডেপুটিত্ব,
একা পড়ে মোর চিত্ত
করে ছট্‌ফট্‌।
যখন যা সাজে ভাই
তখন করিবে তাই;
কালাকাল মানা নাই
কলির বিচার,
শ্রাবণে ডেপুটি-পনা
এ ত কভু নয় সনা-
তন প্রথা এ যে অনা-
সৃষ্টি অনাচার।
রাজছত্র ফেল শ্যাম,
এস এই ব্রজধাম,
কলিকাতা যার নাম
কিংবা ক্যালকাটা!
ঘুরেছিলে এইখেনে
কত রোডে কত লেনে,
এইখেনে ফেল এনে
জুতোসুদ্ধ পা-টা!
ছুটি লয়ে কোনমতে
পোটমাণ্টো তুলি রথে,

সেজেগুজে, রেলপথে
করে অভিসার !
লয়ে দাড়ি লয়ে হাসি
অবতীর্ণ হও আসি,
রুধিয়া জানালা শাসি
বসি একবার ।—
বজ্ররবে সচকিত
কাঁপিবে গৃহের ভিৎ,
পথে শুনি কদাচিৎ
চক্র খড়খড় !—
হারেরে ইংরাজ-রাজ
এ সাধে হানিলি বাজ
শুধু কাজ শুধু কাজ
শুধু ধড়ফড় !
আম্‌লা শাম্‌লা স্রোতে
ভাসাইলি এ ভারতে,
যেন নেই ত্রিজগতে
হাসি গল্প গান !
নেই বাঁশি, নেই বঁধু,
নেইরে যৌবন-মধু,
মুচেছে পথিক-বধূ
সজল নয়ান !
যেনরে সরম টুটে
কদম্ব আর না ফুটে,
কেতকী শিহরি উঠে
করে না আকুল ;
কেবল জগৎটাকে
জড়ায়ে সহস্রপাকে

গবর্মেণ্টো পড়ে থাকে
বিরাট বিপুল।
বিষম রাক্ষস ওটা,
মেলিয়া আফিস-কোটা,
গ্রাস করে গোটাগোটা
বন্ধুবান্ধবেরে—
বৃহৎ বিদেশে দেশে
কে কোথা তলায় শেষে
কোথাকার সর্ব্বনেশে
সার্ব্বিসের ফেরে!
এদিকে বাদর ভরা
নবীন শ্যামল ধরা,
নিশিদিন ঝর্‌ঝরা
সঘন গগন।
এদিকে ঘরের কোণে
বিরহিনী বাতায়নে,
গহন তমাল বনে
নয়ন মগন।
হেঁট মুণ্ড করি হেঁট
মিছে কর অ্যাজিটেট্
খালি রেখে খালি পেট
লিখিছ কাগজ,—
এ দিকে গোরায় মিলে
কালা-বন্ধু লুটে নিলে,
তার বেলা কি করিলে,
নাই কোন খোঁজ!
দেখিছ না আঁখি খুলে,
ম্যাঞ্চেষ্টর লিভারপুলে

দিশী শিল্প জলে গুলে
করিল finish !
"আষাঢ়ে গল্প" সে কই !
সেও বুঝি গেল ওই !
আমাদের নিতান্তই
দেশের জিনিষ !
আষাঢ় কাহার আশে
বর্ষে বর্ষে ফিরে আসে,
নয়নের নীরে ভাসে
দিবসরজনী !
আছে ভাব নাই ভাষা,
নাই শস্য আছে চাষা,
আছে নস্য নাই নাসা,
এও যে তেমনি !
তুমি আছ কোথা গিয়া,
আমি আছি শূন্য হিয়া,
কোথায় বা সে তাকিয়া
শোকতাপহরা !
সে তাকিয়া, গল্প-গীতি—
সাহিত্যচর্চ্চার স্মৃতি,
কত হাসি কত প্রীতি
কত তুলো ভরা !
কোথায় সে যদুপতি,
কোথা মথুরার পতি,
অথ চিন্তা করি ইতি
কুরু মনস্থির—
মায়াময় এ জগৎ
নহে সৎ, নহে সৎ,

যেন পদ্মপত্রবৎ
তদুপরি নীর !
অতএব ত্বরা করে
উত্তর লিখিবা মোরে,
সর্ব্বদা নিকটে ঘোরে
কাল সে করাল ;
(সুধী তুমি ত্যজি নীর
গ্রহণ করিও ক্ষীর)
এই তত্ত্ব এই চিঠির
জানিও Moral ।

৮

দার্জ্জিলিং।

১৮৮৭

এইত দার্জ্জিলিং এসে পড়লুম। পথে বে—খুব ভাল রকম behave করেচে। বড় একটা কাঁদেনি। খুব চেঁচামেচি গোলমালও করেচে—উলুও দিয়েছে—হাতও ঘুরিয়েচে এবং পাখীকে ডেকেচে যদিও পাখী কোথায় দেখ্‌তে পাওয়া গেল না। সারাঘাটে ষ্টীমারে ওঠবার সময় মহা হাঙ্গাম। রাত্রি দশটা—জিনিষপত্র সহস্র, কুলি গোটাকতক, মেয়ে মানুষ পাঁচটা এবং পুরুষ মানুষ একটি মাত্র। নদী পেরিয়ে একটা ছোট রেল-গাড়িতে ওঠা গেল—তাতে চারটে করে শয্যা, আমরা ছটি মনিষ্যি। মেয়েদের এবং অন্যান্য জিনিষপত্র ladies compartment-এ তোলা গেল, কথাটা শুন্‌তে যত সংক্ষেপ হ'ল কাজে ঠিক তেমনটা হয়নি। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয়নি—তবু ন——বলেন আমি কিছুই করিনি—অর্থাৎ একখান আস্ত মানুষ একেবারে আস্ত রকম খেপ্‌লে যে রকমটা হয় সেই প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করলে ঠিক পুরুষ মানুষের উপযুক্ত হত। কিন্তু এই ছদিনে আমি এত বাক্স খুলেছি এবং বন্ধ করেচি এবং বেঞ্চির নীচে ঠেলে গুঁজেছি, এবং উক্ত স্থান থেকে টেনে বের করেচি, এত বাক্স এবং পুঁটুলির পিছনে আমি ফিরেচি এবং এত বাক্স এবং পুঁটুলি আমার পিছনে অভিশাপের মত ফিরেচে, এত হারিয়েচে এবং এত ফের পাওয়া গেছে এবং এত পাওয়া যায়নি এবং পাবার জন্য এত চেষ্টা করা গেছে এবং যাচ্চে যে, কোন ছাব্বিশ বৎসর বয়সের ভদ্রসন্তানের অদৃষ্টে এমনটা ঘটেনি। আমার ঠিক বাক্স-phobia হয়েচে; বাক্স দেখ্‌লে আমার দাঁতে দাঁতে লাগে। যখন চারিদিকে চেয়ে দেখি বাক্স, কেবলি বাক্স, ছোট বড় মাঝারি, হাল্কা এবং ভারি, কাঠের এবং টিনের এবং পশুচর্ম্মের এবং কাপড়ের—নীচে একটা, উপরে একটা, পাশে একটা, পিছনে একটা—তখন আমার ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করবার স্বাভাবিক শক্তি একেবারে চলে যায় এবং তখন আমার শুষ্ক দৃষ্টি, শুষ্ক মুখ এবং দীনভাব দেখ্‌লে নিতান্ত কাপুরুষের মত বোধ হয় অতএব আমার সম্বন্ধে

ন—র যা মত দাঁড়িয়েচে তা ঠিক। যাক্, তার পরে আমি আর একটা গাড়িতে গিয়ে শুলুম। সে গাড়িতে আর দুটি বাঙালী ছিলেন। তাঁরা ঢাকা থেকে আস্‌চেন—তাঁদের মধ্যে একজনের মাথা টাকে প্রায় পরিপূর্ণ এবং ভাষা অত্যন্ত বাঁকা—তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনার পিতা দারজিলিঙ্গে ছিল?" লক্ষ্মী থাক্‌লে এর যথোচিত উত্তর দিতে পারত—সে হয় ত বলত "তিনি দারজিলিঙ্গে ছিল কিন্তু তখন দারজিলিং বড় ঠাণ্ডা ছিলেন বলে তিনি বাড়ি ফিরে গেছে।" আমার উপস্থিতমত এক রকম বাংলা যোগাল না। * * * * * *

সিলিগুড়ি থেকে দারজিলিং পর্য্যন্ত ক্রমাগত স—র উচ্ছ্বাস উক্তি। "ও মা" "কি চমৎকার" "কি আশ্চর্য্য" "কি সুন্দর"—কেবলি আমাকে ঠেলে আর বলে "র——দেখ দেখ"। কি করি, যা দেখায় তা দেখ্‌তেই হয়—কখন বা গাছ, কখন বা মেঘ, কখন বা একটা দুর্জ্জয় খাঁদা নাকওয়ালী পাহাড়ী মেয়ে—কখন বা এমন কত কি, যা দেখ্‌তে না দেখ্‌তেই গাড়ি চলে যাচ্ছে, এবং স——দুঃখ কচ্চে যে র——দেখ্‌তে পেলে না। গাড়ি চল্‌তে লাগল। ক্রমে ঠাণ্ডা, তার পরে মেঘ, তার পরে সর্দ্দি, তার পরে হাঁচি, তার পরে শাল, কম্বল, বালাপোষ, মোটা মোজা, পা কন্ কন্, হাত ঠাণ্ডা, মুখ নীল, গলা ভার-ভার এবং ঠিক তার পরেই দারজিলিং। আবার সেই বাক্স, সেই ব্যাগ, সেই বিছানা, সেই পুঁটুলি, মোটের উপর মোট, মুটের উপর মুটে। ব্রেক থেকে জিনিষ পত্র দেখে নেওয়া, চিনে নেওয়া, মুটের মাথায় চাপান, সাহেবকে রসিদ দেখান, সাহেবের তর্ক বিতর্ক, জিনিষ খুঁজে না পাওয়া এবং সেই হারান জিনিষ পুনরুদ্ধারের জন্য বিবিধ বন্দোবস্ত করা, এতে আমার ঘণ্টা দুয়েক লেগেছিল।

১০

শিলাইদহ।

১৮৮৮

শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সাম্‌নে আমাদের বোট লাগান আছে। প্রকাণ্ড চর—ধূ ধূ করচে—কোথাও শেষ দেখা যায় না—কেবল মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা যায়—আবার অনেক সময়ে বালিকে নদী বলে ভ্রম হয়। গ্রাম নেই, লোক নেই, তরু নেই, তৃণ নেই—বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাটল-ধরা ভিজে কালো মাটি, জায়গায় জায়গায় শুক্‌নো শাদা বালি। পূর্ব্বদিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে দেখা যায় উপরে অনন্ত নীলিমা আর নীচে অনন্ত পাণ্ডুরতা। আকাশ শূন্য এবং ধরণীও শূন্য, নীচে দরিদ্র শুষ্ক কঠিন শূন্যতা আর উপরে অশরীরী উদার শূন্যতা। এমনতর desolation কোথাও দেখা যায় না। হঠাৎ পশ্চিমে মুখ ফেরাবামাত্র দেখা যায় স্রোতহীন ছোট নদীর কোল, ওপারে উঁচু পাড়, গাছপালা, কুটীর, সন্ধ্যা-সূর্য্যালোকে আশ্চর্য্য স্বপ্নের মত। ঠিক যেন এক পারে সৃষ্টি, এবং আর এক পারে প্রলয়। সন্ধ্যাসূর্য্যালোক বলবার তাৎপর্য্য এই—সন্ধ্যার সময়ই আমরা বেড়াতে বেরই এবং সেই ছবিটাই মনে অঙ্কিত হয়ে আছে। পৃথিবী যে বাস্তবিক কি আশ্চর্য্য সুন্দরী তা কল্‌কাতায় থাক্‌লে ভুলে যেতে হয়। এই যে ছোট নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্চে, এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জ্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতিরাত্রে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্চে, জগৎসংসারে এ যে কি একটা আশ্চর্য্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাক্‌লে তবে বোঝা যায়। সূর্য্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্ব্বদিক থেকে কি এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্চে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে এক প্রকাণ্ড পাতা উল্‌টে দিচ্চে সেই বা কি আশ্চর্য্য লিখন—আর, এই ক্ষীণ-পরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর, আর ওই ছবির মতন পরপার, ধরণীর এই উপেক্ষিত একটা প্রান্তভাগ—এই বা কি বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা! যাক। এ কথাগুলো রাজধানীতে অনেকটা "পৈট্রি"র মত শুন্‌তে হবে, কিন্তু এখানকার পক্ষে কথাগুলো কিছুমাত্র বেখাপ নয়।

সন্ধ্যাবেলা এই বৃহৎ চরের মধ্যে ছাড়া পেয়ে অনুচরসমেত ছেলেরা একদিকে যায়, বলু একদিকে যায়, আমি একদিকে যাই, দুটি রমণী আর একদিকে যায়। ইতিমধ্যে সূর্য্য সম্পূর্ণ অস্ত যায়, আকাশের সুবর্ণ আভা মিলিয়ে যায়, অন্ধকারে চারিদিক অস্পষ্ট হয়ে আসে, ক্রমে আপনার পাশের ক্ষীণ ছায়া দেখে বুঝতে পারি, বাঁকা কৃশ চাঁদখানির আলো অল্প অল্প ফুটেছে। পাণ্ডুবর্ণ বালির উপরে এই পাণ্ডুবর্ণ জ্যোৎস্নায় চোখে আরো কেমন বিভ্রম জন্মিয়ে দেয়—কোথায় বালি, কোথায় জল, কোথায় পৃথিবী, কোথায় আকাশ নিতান্ত অনুমান করে নিতে হয়। কাজেই সবটা জড়িয়ে ভারি একটা অবাস্তবিক মরীচিকা-জগতের মত বোধ হয়। * * * * গতকল্য এই মায়া উপকূলে অনেকক্ষণ ধরে বিচরণ করে বোটে ফিরে গিয়ে দেখি ছেলেরা ছাড়া আমাদের দলের আর কেউ ফেরেন নি—আমি একখানি কেদারায় স্থির হয়ে বস্‌লুম—Animal Magnetism নামক একখানা অত্যন্ত ঝাপ্‌সা subject-এর বই একটা বাতির ঝাপ্‌সা আলোতে বসে পড়তে আরম্ভ করলুম। কিন্তু কেউ আর ফেরেন না। বইখানাকে খাটের উপরে উপুড় করে বেরোলুম—উপরে উঠে চারিদিকে চেয়ে কাল মাথার কোন চিহ্ন দেখ্‌তে পেলুম না। সমস্ত ফেকাশে ধূ ধূ করচে। একবার বলু বলে পুরো জোরে চীৎকার করলুম—কণ্ঠস্বর হু হু করতে করতে দশ দিকে ছুটে গেল—কিন্তু কারো সাড়া পেলুম না। তখন বুকটা হঠাৎ চারদিক থেকে দমে গেল, একখানা বড় খোলা ছাতা হঠাৎ বন্ধ করে দিলে যেমনতর হয়। গোফুর আলো নিয়ে বেরোল—প্রসন্ন বেরোল—বোটের মাঝিগুলো বেরোল, সবাই ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চল্লুম—আমি একদিকে বলু বলু করে চীৎকার করচি—প্রসন্ন আর একদিকে ডাক দিচ্চে "ছোট মা"—মাঝে মাঝে শোনা যাচ্চে মাঝিরা "বাবু" "বাবু" করে ফুক্‌রে উঠ্‌চে। সেই মরুভূমির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রে অনেকগুলো আর্ত্তস্বর উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কারো সাড়া শব্দ নেই। গোফুর দুই একবার অতি দূর থেকে হেঁকে বল্লে—"দেখ্‌তে পেয়েছি" তার পরেই আবার সংশোধন করে বল্লে "না" "না"। আমার মানসিক অবস্থাটা একবার কল্পনা করে দেখ—কল্পনা করতে গেলে নিঃশব্দ রাত্রি, ক্ষীণ চন্দ্রালোক, নির্জ্জন নিস্তব্ধ শূন্য চর, দূরে গোফুরের চলনশীল একটী লণ্ঠনের আলো, মাঝে মাঝে এক এক দিক থেকে কাতর কণ্ঠের আহ্বান এবং চতুর্দ্দিকে তার উদাস প্রতিধ্বনি—মাঝে মাঝে আশার উন্মেষ এবং পর মুহূর্ত্তেই সুগভীর নৈরাশ্য এই সমস্তটা মনে আনতে হবে। অসম্ভব রকমের আশঙ্কাসকল মনে জাগ্‌তে লাগ্‌ল। কখন মনে হল চোরাবালিতে পড়েছে, কখন মনে

হল বলুর হয়ত হঠাৎ মূর্চ্ছা কিংবা কিছু একটা হয়েছে—কখন বা নানাবিধ শ্বাপদ জন্তুর বিভীষিকা কল্পনায় উদয় হতে লাগ্‌ল। মনে মনে হতে লাগ্‌ল "আত্মরক্ষা-অসমর্থ যারা, নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ।" স্ত্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠ্‌লুম। এমন সময়ে ঘণ্টাখানেক পরে রব উঠ্‌ল এঁরা চড়া বেয়ে বেয়ে ওপারে গিয়ে পড়েছেন আর ফিরতে পারচেন না। বোট ওপারে গেল—বোটলক্ষ্মী বোটে ফিরলেন—বলু বল্‌তে লাগ্‌ল "তোমাদের নিয়ে আমি আর কখনো বেরোব না"—সকলেই অনুতপ্ত শ্রান্তকাতর, সুতরাং আমার ভাল ভাল উপাদেয় ভর্ৎসনাবাক্য হৃদয়েই রয়ে গেল। পরদিন প্রাতঃকালে উঠেও কোনমতেই রাগ্‌তে পারলুম না।

১৯

কলিকাতা

জুন, ১৮৮৯

গাড়ি ছাড়বার পর বে—চারিদিক চেয়ে গম্ভীর হয়ে বসে রইল, ভাবলে এসংসারে কোথা থেকে আগমন, কোথায় গতি, জীবনের উদ্দেশ্য কি—ভাবতে ভাবতে ক্রমে দেখ্‌লুম ঘন ঘন হাই তুলতে লাগ্‌ল, তার পরে খানিক বাদে আমার কোলে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে নিদ্রা আরম্ভ করে দিল। আমার মনেও সংসারের সুখদুঃখসম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তার উদয় হয়েছিল, কিন্তু ঘুম এল না। সুতরাং আপন মনে ভৈরবী আলাপ করতে লাগলুম। ভৈরবী সুরের মোচড়গুলো কানে এলে জগতের প্রতি এক রকম বিচিত্র ভাবের উদয় হয়। মনে হয় একটা নিয়মের যন্ত্র-হস্ত অবিশ্রাম আর্গিন যন্ত্রের হাতা ঘোরাচ্চে এবং সেই ঘর্ষণ বেদনায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মর্ম্মস্থল হতে একটা গম্ভীর কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠচে। সকালবেলাকার সূর্য্যের সমস্ত আলো ম্লান হয়ে এসেচে, গাছপালা নিস্তব্ধ হয়ে কি যেন শুনচে, এবং আকাশ একটা বিশ্বব্যাপী অশ্রুর বাষ্পে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে অর্থাৎ দূর আকাশের দিকে চাইলে মনে হয় যেন একটা অনিমেষ নীল চোখ কেবল ছলছল করে চেয়ে আছে।

খিড়কি ষ্টেসনের কাছাকাছি আমাদের সেই আকের ক্ষেত, গাছের সার, টেনিস ক্ষেত্র, কাঁচের জানালা-মোড়া বাড়ি দেখতে পেলুম, দেখে মনটা ক্ষণকালের জন্য কেমন করে উঠল। এই এক আশ্চর্য্য! যখন এখানে বাস করতুম তখন এ বাড়ির উপরে যে সবিশেষ স্নেহ ছিল তা নয়—যখন এবাড়ি ছেড়ে গিয়েছিলুম তখনও যে সবিশেষ কাতর হয়েছিলুম তাও বলতে পারিনে অথচ দ্রুতগতি ট্রেনের বাতায়নে বসে যখন কেবল নিমেষের মত দেখলুম সেই একলা বাড়ি তার খেলার জায়গা এবং ফাঁকা ঘরগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তখন সমস্ত হৃদয়টা বিদ্যুৎবেগে সেই বাড়ির উপরে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ল, অমনি বুকের ভিতরে বাঁদিক থেকে ডান দিক পর্য্যন্ত ধক্‌করে একটা শব্দ হল, হুস্‌ করে গাড়ি চলে গেল, আকের ক্ষেত মিলিয়ে গেল—বাস্‌ সমস্ত ফুরোল—কেবল হঠাৎ ঘা খাওয়ার দরুন মনের ছোট বড় দু চারটে তার প্রায় দেড় সুর

আন্দাজ নেবে গেল। কিন্তু গাড়ির এঞ্জিন এ সকল বিষয়ে বড় একটা চিন্তা করে না, সে লোহার রাস্তার উপর দিয়ে এক রোখে চলে যায়, কোন্ লোক কোথায় কি ভাবে যাচ্চে, সে বিষয়ে তার খেয়াল করবার সময় নেই—সে কেবল গল গল করে জল খায় হুস্ হুস্ করে ধোঁয়া ছাড়ে, গাঁ গাঁ করে চীৎকার করে, এবং গড় গড় করে চলে যায় সংসারের গতির সঙ্গে এর সুন্দর তুলনা দেওয়া যেতে পারত কিন্তু সেটা এত পুরোণো এবং অনাবশ্যক যে কেবল একবার নির্দ্দেশ করে ক্ষান্ত থাকা গেল। খাণ্ডালার কাছাকাছি এসে মেঘ এবং বৃষ্টি। সেই সব পাহাড়গুলোর উপর মেঘ জমে ঝাপ্সা হয়ে গেছে—ঠিক যেন কে পাথর এঁকে তার পরে রবার দিয়ে ঘসে দিয়েছে; খানিক খানিক outline দেখা যাচ্চে এবং খানিকটা পেন্সিলের দাগ চারিদিকে ধেবড়ে গেছে। অবশেষে গাড়ির ঘণ্টা দিলে—দূর থেকে গাড়ির নিদ্রাহীন লাল চক্ষু দেখা গেল, ধরণী থর থর করে কাঁপতে লাগল, ষ্টেষনের কর্ত্তারা চটি জুতো, ঘুন্টি দেওয়া চাপকান এবং টিকির উপরে তকমা দেওয়া গোল টুপি পরে নানা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল—বিপুল হাতল্যাণ্ঠণ চারিদিকে আলো নিক্ষেপ করতে লাগল—খানসামাবর্গ সচকিত হয়ে যে যার জিনিষপত্র আগলে দাড়াল, বে—ঘুমোতে লাগল। গাড়িতে উঠা গেল। * * * * বে—অকারণে খুঁৎ খুঁৎ আরম্ভ করলে—বেলা বাড়তে লাগ্‌ল—যদিও রোদ্দুর নেই তবুও গরম বোধ হতে লাগ্‌ল, কিন্তু সময় আর কাটে না। প্রত্যেক মিনিটকে যেন স্পর্শ করে ঠেলে ঠেলে এগোতে হচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে খানিক দূর গিয়ে ঘোরতর বৃষ্টি আরম্ভ হল—চারদিক বন্ধ করে কাঁচের জানালার কাছে বসে মেঘবৃষ্টি দেখ্‌তে বেশ লাগ্‌ল। এক জায়গায় একটা বর্ষার নদীর কাণ্ড যে দেখলুম সে আর কি বল্‌ব—সে একেবারে ফুলে ফেঁপে ফেনিয়ে পাকিয়ে ঘুলিয়ে, ছুটে, মাথা খুঁড়ে, পাথর গুলোর উপরে পড়ে আছড়ে বিছড়ে তাদের ডিঙিয়ে, তাদের চারদিকে ঘুরপাক খেয়ে একটা কাণ্ড কর্ত্তে লাগল। এরকম উন্মত্ততা আর কোথাও দেখিনি। সোহাগপুরে বিকেলে এসে যখন খেলুম তখন বৃষ্টি থেমেছে—যখন গাড়ি ছাড়লে তখন দেখলুম সূর্য্য অত্যন্ত রাঙা হয়ে মেঘের মধ্যে অস্ত যাচ্চে। আমি ভাবছিলুম, খাওয়া দাওয়া গল্পস্বল্প খেলাধুলো পড়াশুনোর মধ্যে আর সবার সময় কেবল অলক্ষিতভাবে কেটে যাচ্চে, সময় তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্চে—তার অস্তিত্বই তারা টের পাচ্ছে না—আর আমি সময়ের উপরে সাঁতার কেটে চলেছি, সমস্ত অগাধ সময়টা আমার

বুকে মুখে সর্ব্বাঙ্গে লাগ্‌চে। * * * * যথাসময়ে হাওড়ায় গাড়ি গিয়ে পৌঁছল। প্রথমে বাড়ির জমাদার তার পরে যো— তার পরে স— একে একে দৃষ্টিপথে পড়ল। তারপরে সেকেণ্ড ক্লাসের সেক্‌ড়া গাড়ির ছাতের উপরে গুটানো বিছানা, আয়ার দোম্‌ড়ানো টিনের বাক্স এবং নাবার টব (তার মধ্যে দুধের বোতল, লোটা, হাঁড়ি, টিন্‌পট্‌, পুঁটুলি ইত্যাদি) চাপিয়ে বাড়ি পৌছন গেল। একটা কলরব, লোকের ভিড়, দারোয়ানদের সেলাম, চাকরদের প্রণাম, সরকারদের নমস্কার, আমাদের মধ্যে কে মোটা হয়েছি কে রোগা হয়েছি সে সম্বন্ধে সাধারণের সম্পূর্ণ মতভেদ, বে— কে নিয়ে স্ব—এণ্ড কোম্পানির লুটোপুটি, চায়ের টেবিলে লোকসমাগম, স্নান, আহার ইত্যাদি।

১২

সাজাদপুর।
জানুয়ারী
১৮৯০

—কাজেই দুকুর বেলা পাগড়ি পরে কার্ডে নাম লিখে পাল্কী চড়ে জমিদারবাবু চল্লেন। সাহেব তাঁবুর বারান্দায় বসে বিচার করচেন, দক্ষিণ পার্শ্বে পুলিসের চর। বিচারপ্রার্থীর দল মাঠে ঘাটে গাছতলায় পড়ে অপেক্ষা করে আছে—একেবারে তার নাকের সাম্‌নে পাল্কী নাবালে—সাহেব খাতির করে চৌকিতে বসালেন। ছোক্‌রা-হেন, গোঁফের রেখা উঠ্‌ছে—চুল খুব কটা, মাঝে মাঝে একটু একটু কালো চুলের তালি দেওয়া—হঠাৎ মনে হয় বুড়ো মানুষ, অথচ মুখ নিতান্ত কাঁচা। সাহেবকে বল্লুম কাল রাত্রে আমার সঙ্গে খেতে এস তিনি বল্লেন আমি আজই আর এক জায়গায় যাচ্চি—Pig-sticking-এর যোগাড় করতে। বাড়ি চলে এলুম। ভয়ানক মেঘ করে এল—ঘোরতর ঝড়—মুষলধারে বৃষ্টি। বই ছুঁতে ইচ্ছে করচে না, কিছু লেখা অসম্ভব—মনের মধ্যে যাকে কবিত্বের ভাষায় বলে, কি যেন কি ইত্যাদি। এ ঘর থেকে ও ঘরে পায়চারী করে বেড়াতে লাগ্‌লুম। অন্ধকার হয়ে এসেছে—গড়গড় শব্দে মেঘ ডাক্‌চে, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুৎ—হু হু করে এক-একটা বাতাসের দম্‌কা আস্‌চে আর আমাদের বারান্দার সামনের বড় লীচু গাছটার ঘাড় ধরে যেন তার দাড়ি সুদ্ধ মাথাটা নাড়িয়ে দিচ্চে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বৃষ্টির জলে আমাদের শুক্‌নো খালটা প্রায় পূরে এল। এই রকম করে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ আমার মনে হল ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই বাদলায় আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে অনুরোধ করা আমার কর্ত্তব্য। চিঠি লিখে দিলুম। চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে ঘর তদারক কর্ত্তে গিয়ে দেখি, সে ঘরে দুটো বাঁশের ঝোলার উপর তাকিয়া গদি ময়লা লেপ টাঙান।—চাকরদের গুল টিকে তামাক, তাদেরই দুটো কাঠের সিন্দুক—তাদেরই মলিন লেপ, ওয়াড়হীন তৈলাক্ত বালিশ ও মসীবর্ণ মাদুর, এক টুক্‌রো ছেঁড়া চট ও তার উপরে বিচিত্র জাতীয় মলিনতা—কতকগুলো প্যাক্ বাক্সর মধ্যে নানাবিধ জিনিষের ভগ্নাবশেষ—যথা মরচেপড়া কাৎলির ঢাক্‌নি, তলাহীন

ভাঙা লোহার উমুন, অত্যন্ত ময়লা একটা দস্তার চাদানি, ভাঙা সেজের কাঁচ ও ময়লা শামাদান, দুটো অকর্ম্মণ্য ফিল্‌টার, meatsafe, একটা সুপপ্লেটে খানিকটা পাতলা গুড়—ধুলো পড়েপড়ে সেটা গাঢ় হয়ে এসেছে, গোটাকতক ময়লা কালীবর্ণ ভিজে ঝাড়ন, কোণে বাসন ধোবার গামলা, গোফুর মিঞার একটা ময়লা কোর্ত্তা এবং পুরোনো মকমলের Skull-cap, জলের দাগ তেলের দাগ দুধের দাগ কালো দাগ brown দাগ, শাদা দাগ এবং নানা মিশ্রিত দাগ বিশিষ্ট আয়নাহীন একটা জীর্ণ পোকাকাটা Dressing table ; তার পায়াকটা ভাঙা, আরনাটা অন্যত্র দেয়ালে ঠেসান্‌ দেওয়া, তার খোপের মধ্যে ধূলো, খড়্‌কে, ন্যাপকিন, পুরোণো তালা, ভাঙা গেলাসের তলা এবং সোডা-ওয়াটার বোতলের তার, কতকগুলো খাটের খুরো ভাঙা—ব্যাপার দেখে আমার চক্ষু স্থির—ডাক্‌ লোকজন, নিয়ে আয় নায়েব, ডেকে আন খাজাঞ্চি, যোগাড় কর কুলি, আন্‌ ঝাঁটা, আন জল, মই লাগা, দড়ি খোল্‌, বাঁশ খোল্‌, তাকিয়া লেপ কাঁথা টেনে ফেল্‌, ভাঙা কাঁচের টুক্‌রো গুলো খুঁটে খুঁটে তোল্‌, দেয়ালের পেরেকগুলো একে একে উপড়ে ফেল্‌—ওরে তোরা সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন, নে না এক্‌টা এক্‌টা করে জিনিষ নে না—ওরে ভাঙলেরে সব ভাঙলে—ঝন ঝন ঝনাৎ—তিনটে সেজ ভেঙে চুরমার, খুঁটে খুঁটে তোল্‌—ভাঙা চুপড়িগুলো এবং ছেঁড়া চট্‌টা বহুদিনসঞ্চিত ধুলোসমেত নিজের হাতে টেনে ফেলে দিলুম—নিচে থেকে পাঁচ ছটা আর্‌সলা সপরিবারে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়লেন তাঁরা আমারই সঙ্গে একান্নবর্ত্তী হয়ে বাস করছিলেন, আমার গুড়, আমার পাঁউরুটি এবং আমারই নতুন জুতোর বার্ণিশ তাঁদের উপজীবিকা ছিল। সাহেব লিখ্‌লেন "আমি এখনি যাচ্চি বড় বিপদে পড়েছি।" ওরে এলরে এল—চট্‌ পট্‌ কর। তার পরে—ঐ এসেছে সাহেব। তাড়াতাড়ি চুল দাড়ি সমস্ত ঝেড়ে ফেলে ভদ্র লোক হয়ে যেন কোন কাজ ছিলনা যেন সমস্ত দিন আরামে বসেছিলুম এই রকম ভাবে হলের ঘরে বসে রইলুম—সাহেবের সঙ্গে ঈষৎ হেসে হাত নাড়ানাড়ি করে অত্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে গল্প কর্ত্তে লাগলুম—সাহেবের শোবার ঘরে কি হল এই চিন্তা ক্রমাগত মনের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। গিয়ে দেখ্‌লুম এক রকম দাঁড়িয়ে গেছে ; রাত্তিরটা ঘুমিয়ে কাট্‌তেও পারে যদি না সেই গৃহহীন আরস্লো-গুলো রাত্তিরে তাঁর পায়ের তেলোয় সুড়সুড়ি দেয়।

১৪

লণ্ডন,

১০ই অক্টোবর, ১৮৯০।

মানুষ কি লোহার কল, যে, ঠিক নিয়ম-অনুসারে চলবে? মানুষের মনের এত বিচিত্র এবং বিস্তৃত কাণ্ড কারখানা, তার এত দিকে গতি এবং এত রকমের অধিকার যে এদিকে ওদিকে হেলতেই হবে। সেই তার জীবনের লক্ষণ, তার মনুষ্যত্বের চিহ্ন, তার জড়ত্বের প্রতিবাদ। এই দ্বিধা, এই দুর্ব্বলতা যার নেই তার মন নিতান্ত সঙ্কীর্ণ এবং কঠিন এবং জীবনবিহীন। যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি আমরা সর্ব্বদাই কটুভাষা প্রয়োগ করি সেই ত আমাদের জীবনের গতিশক্তি—সেই আমাদের নানা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত করে তুল্‌চে। নদী যদি প্রতি পদে বলে, কই সমুদ্র কোথায়—এ যে মরুভূমি—ঐ যে অরণ্য—ঐ যে বালির চড়া—আমাকে যে শক্তি ঠেলে নিয়ে যাচ্চে সে বুঝি আমাকে ভুলিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্চে—তা হলে তার যেরকম ভ্রম হয় প্রবৃত্তির উপরে একান্ত অবিশ্বাস করলে আমাদেরও কতকটা সেই রকম ভ্রম হয়। আমরাও প্রতিদিন বিচিত্র সংশয়ের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্চি—আমাদের শেষ আমরা দেখ্‌তে পাচ্চি নে—কিন্তু যিনি আমাদের অনন্ত জীবনের মধ্যে প্রবৃত্তি নামক প্রচণ্ড গতিশক্তি দিয়েচেন তিনিই জানেন তার দ্বারা আমাদের কিরকম করে চালনা করবেন। আমাদের সর্ব্বদা এই একটা মস্ত ভুল হয় যে আমাদের প্রবৃত্তি আমাদের যেখানে নিয়ে এসেচে সেইখানেই বুঝি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে—আমরা তখন জান্‌তে পারিনে সে আমাদের তার মধ্যে থেকে টেনে তুল্‌বে। নদীকে যে শক্তি মরুভূমির মধ্যে নিয়ে আসে সেই শক্তিই সমুদ্রের মধ্যে নিয়ে যায়। ভ্রমের মধ্যে যে ফেলে ভ্রম থেকে সেই টেনে নিয়ে যায়—এই রকম করেই আমরা চলচি। যার এই প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবনীশক্তির প্রাবল্য নেই, যার মনের রহস্যময় বিচিত্র বিকাশ নেই, সে সুখী হতে পারে সাধু হতে পারে, এবং তার সেই সঙ্কীর্ণতাকে লোকে মনের জোর বল্‌তে পারে—কিন্তু অনন্ত জীবনের পাথেয় তার বেশী নেই।

——:——

পতিসর

১৮৯১।

আমার বোট কাছারির কাছ থেকে অনেক দূরে এনে একটি নিরিবিলি জায়গায় বেঁধেছি। এ দেশে গোলমাল কোথাও নেই, ইচ্ছে করলেও পাওয়া যায় না, কেবল হয়ত অন্যান্য বিবিধ জিনিসের সঙ্গে হাটে পাওয়া যেতে পারে।—আমি এখন যেখানে এসেছি এ জায়গায় অধিকন্তু মানুষের মুখ দেখা যায় না। চারিদিকে কেবল মাঠ ধূ ধূ করচে—মাঠের শস্য কেটে নিয়ে গেছে, কেবল কাটা ধানের গোড়াগুলিতে সমস্ত মাঠ আচ্ছন্ন। সমস্ত দিনের পর সূর্য্যাস্তের সময় এই মাঠে কাল একবার বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। সূর্য্য ক্রমেই রক্তবর্ণ হয়ে একেবারে পৃথিবীর শেষরেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেল। চারিদিক কি যে সুন্দর হয়ে উঠ্‌ল সে আর কি বল্‌ব। বহুদূরে একেবারে দিগন্তের শেষ প্রান্তে একটু গাছপালার ঘের দেওয়া ছিল, সেখানটা এমন মায়াময় হয়ে উঠ্‌ল, নীলেতে লালেতে মিশে এমন আব্‌ছায়া হয়ে এল,—মনে হল ঐখানে যেন সন্ধ্যার বাড়ি, ঐখানে গিয়ে সে আপনার রাঙা আঁচলটি শিথিলভাবে এলিয়ে দেয়, আপনার সন্ধ্যাতারাটি যত্ন করে জ্বালিয়ে তোলে, আপন নিভৃত নির্জ্জনতার মধ্যে সিঁদুর পরে' বধূর মত কার প্রতীক্ষায় বসে থাকে, এবং বসে বসে পা দুটি মেলে' তারার মালা গাঁথে এবং গুন্ গুন্ স্বরে স্বপ্ন রচনা করে। সমস্ত অপার মাঠের উপর একটি ছায়া পড়েছে—একটি কোমল বিষাদ—ঠিক অশ্রুজল নয়—একটি নির্নিমেষ চোখের বড় বড় পল্লবের নীচে গভীর ছল্‌ছলে ভাবের মত। এমন মনে করা যেতে পারে—মা পৃথিবী লোকালয়ের মধ্যে আপন ছেলে-পুলে এবং কোলাহল এবং ঘরকন্নার কাজ নিয়ে থাকে, যেখানে একটু ফাঁকা, একটু নিস্তব্ধতা, একটু খোলা আকাশ, সেইখানেই তার বিশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য এবং বিষাদ ফুটে ওঠে, সেইখানেই তার গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা যায়। ভারতবর্ষে যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূরবিস্তৃত সমতলভূমি আছে এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এই জন্যে আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম বৈরাগ্য আবিষ্কার করতে পেরেছে,—এই জন্যে আমাদের

পূরবীতে কিম্বা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হা হা ধ্বনি যেন ব্যক্ত করচে, কারো ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একটা অংশ আছে, যেটা কর্ম্মপটু, স্নেহশীল, সীমাবদ্ধ, তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায়নি ; পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জ্জন বিরল অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মীড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান পড়ে। কাল সন্ধের সময় নির্জ্জন মাঠের মধ্যে পূরবী বাজ্‌ছিল, পাঁচ ছ ক্রোশের মধ্যে কেবল আমি একটি প্রাণী বেড়াচ্ছিলুম, এবং আর একটি প্রাণী বোটের কাছে পাগড়ি বেঁধে লাঠি হাতে অত্যন্ত সংযতভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার বাঁ পাশে ছোট্ট নদীটি দুই ধারের উঁচু পাড়ের মধ্যে এঁকেবেঁকে খুব অল্প দূরেই দৃষ্টিপথের বার হয়ে গেছে, জলে ঢেউয়ের রেখামাত্র ছিলনা, কেবল সন্ধ্যার আভা অত্যন্ত মুমূর্ষু হাসির মত খানিকক্ষণের জন্যে লেগে ছিল। যেমন প্রকাণ্ড মাঠ, তেমনি প্রকাণ্ড নিস্তব্ধতা ; কেবল একরকম পাখী আছে তারা মাটিতে বাসা করে' থাকে, সেই পাখী, যত অন্ধকার হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল তত আমাকে তার নিরালা বাসার কাছে ক্রমিক আনাগোনা করতে দেখে ব্যাকুল সন্দেহের স্বরে টী টী করে ডাকৃতে লাগল্। ক্রমে এখানকার কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলো ঈষৎ ফুটে উঠল বরাবর নদীর ধারে ধারে মাঠের প্রান্ত দিয়ে একটা সঙ্কীর্ণ পথচিহ্ন চলে গেছে, সেইখানে নতশিরে চল্‌তে চল্‌তে ভাব্‌ছিলুম।

—:—

কালিগ্রাম

৫ই মাঘ,

১৮৯১।

বেশ কুঁড়েমি করবার মত বেলাটা। কেউ তাড়া দেবার লোক নেই, তা ছাড়া প্রজা এবং কাজের ভিড় এখনো চতুর্দ্দিকে ছেঁকে ধরেনি। সবসুদ্ধ খুব ঢিলে-ঢিলে একলা-একলা কি-একরকম মনে হচ্চে। যেন পৃথিবীতে অত্যাবশ্যক কাজ বলে একটা কিছুই নেই—এমন কি, নাইলেও চলে, না নাইলেও চলে, এবং ঠিক সময়মত খাওয়াটা কল্‌কাতার লোকের মধ্যে প্রচলিত একটা বহুদিনের কুসংস্কার বলে মনে হয়। এখানকার চতুর্দ্দিকের ভাবগতিকও সেই রকম। একটা ছোট্ট নদী আছে বটে কিন্তু তাতে কানাকড়ির স্রোত নেই, সে যেন আপন শৈবালদামের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে অঙ্গবিস্তার করে দিয়ে পড়ে পড়ে ভাব্‌চে যে যদি না চল্লেও চলে তবে আর চলবার দরকার কি? জলের মাঝে মাঝে যে লম্বা ঘাস এবং জলজ উদ্ভিদ জন্মেছে, জেলেরা জাল ফেল্‌তে না এলে সেগুলো সমস্ত দিনের মধ্যে একটু নাড়া পায় না। পাঁচটা ছটা বড় বড় নৌকা সারি সারি বাঁধা আছে—তার মধ্যে একটার ছাতের উপর একজন মাঝি আপাদমস্তক কাপড় মুড়ে রোদ্দুরে নিদ্রা দিচ্চে—আর একটার উপর একজন বসে বসে দড়ি পাকাচ্চে এবং রোদ্ পোহাচ্চে, দাঁড়ের কাছে একজন আধ-বুদ্ধ লোক অনাবৃতগাত্রে বসে অকারণে আমাদের বোটের দিকে চেয়ে আছে; ডাঙার উপরে নানান্ রকমের নানান্ লোক অত্যন্ত মৃদুমন্দ অলস চালে কেন যে আস্‌চে, কেন যে যাচ্চে, কেন যে বুকের মধ্যে নিজের দুটো হাঁটুকে আলিঙ্গন করে ধরে উবু হয়ে বসে আছে, কেন যে অবাক হয়ে বিশেষ কোন-কিছুর দিকে না তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার কোন অর্থ পাওয়া যায় না। কেবল গোটাকতক পাতি হাঁসের ওরি মধ্যে একটু ব্যস্ত ভাব দেখা যাচ্চে—তারা ভারি কলরব করচে, এবং ক্রমাগতই উৎসাহ-সহকারে জলের মধ্যে মাথা ডুবোচ্চে, এবং তৎক্ষণাৎ মাথা তুলে নিয়ে সবলে ঝাড়া দিচ্চে। ঠিক মনে হচ্চে যেন তারা জলের নীচেকার নিগূঢ় রহস্য আবিষ্কার করবার জন্যে

প্রতিক্ষণেই গলা বাড়িয়ে দিচ্চে এবং তার পরে সবেগে মাথা নেড়ে বল্‌চে, "কিছুই না— কিছুই না!" এখানকার দিনগুলো এইরকম বারো ঘণ্টা পড়ে পড়ে কেবল রোদ পোহায়, এবং অবশিষ্ট বারো ঘণ্টা খুব গভীর অন্ধকার মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নিদ্রা দেয়। এখানে সমস্তক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে কেবল নিজের মনের ভাবগুলোকে বসে বসে দোলা দিতে ইচ্ছে করে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু গুন গুন করে গান গাওয়া যায়, মাঝে মাঝে বা ঘুমে চোখ একটু অলস হয়ে আসে। মা যেমন করে শীতকালের সারা বেলা রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ছেলে কোলে করে গুন্‌ গুন্‌ স্বরে দোলা দেয়, সেই রকম।

——:——

পতিসর

৭ই মাঘ,

১৮৯১।

ছোট নদীটি ঈষৎ বেঁকে এইখানে একটুখানি কোণের মত একটু কোলের মত তৈরি করেছে—দুই ধারের উঁচু পাড়ের মধ্যে সেই কোলের কোণটুকুতে বেশ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকি—একটু দূর থেকে আমাদের আর দেখা যায় না। নৌকাওয়ালারা উত্তর দিক থেকে গুণ টেনে টেনে আসে, হঠাৎ একটা বাঁক ফিরেই এই জনহীন মাঠের ধারে অকারণে একটা মস্ত বোট বাঁধা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। "হাঁ গা, কাদের বজ্‌রা গা?" "জমিদার বাবুর।" "এখানে কেন? কাছারির সাম্‌নে কেন বাঁধনি?" "হাওয়া খেতে এসেছেন।"—এসেছি হাওয়ার চেয়ে আরো ঢের বেশী কঠিন জিনিষের জন্য। যাহোক্ এরকম প্রশ্নোত্তর প্রায় মাঝে মাঝে শুন্‌তে পাওয়া যায়। এইমাত্র খাওয়া শেষ করে বসেচি—এখন বেলা দেড়টা। বোট খুলে দিয়েছে, আস্তে আস্তে কাছারির দিকে চলেছে। বেশ একটু বাতাস দিচ্চে। তেমন ঠাণ্ডা নয়—দুপুরবেলার তাতে অল্প গরম হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ঘন শৈবালের মধ্যে দিয়ে যেতে খস্ খস্ শব্দ হচ্চে। সেই শৈবালের উপরে অনেকগুলো ছোট ছোট কচ্ছপ আকাশের দিকে সমস্ত গলা বাড়িয়ে দিয়ে রোদ পোহাচ্চে। অনেক দূরে দূরে একটা একটা ছোট ছোট গ্রাম আসচে। গুটিকতক খোড়ো ঘর—কতকগুলি চালশূন্য মাটির দেয়াল, দুটো একটা খড়ের স্তূপ, কুলগাছ, আমগাছ, বটগাছ এবং বাঁশের ঝাড়, গোটাতিনেক ছাগল চরচে, গোটাকতক উলঙ্গ ছেলেমেয়ে—নদীপর্য্যন্ত একটি গড়ানে কাঁচা ঘাট, সেখানে কেউ কাপড় কাচ্‌চে, কেউ নাইচে, কেউ বাসন মাজ্‌চে; কোন কোন লজ্জাশীলা বধূ দুই আঙুলে ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করে ধরে কলসী কাঁখে জমিদার বাবুকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করচে, তার হাঁটুর কাছে আঁচল ধরে একটি সদ্যস্নাত তৈলচিক্কণ বিবস্ত্র শিশুও একদৃষ্টে বর্ত্তমান পত্রলেখকসম্বন্ধে কৌতুহলনিবৃত্তি করচে—তীরে কতকগুলো নৌকো বাঁধা এবং

একটা পরিত্যক্ত প্রাচীন জেলেডিঙি অর্দ্ধনিমগ্ন অবস্থায় পুনরুদ্ধারের প্রতীক্ষা করচে। তার পরে আবার অনেকটা দূর শস্যশূন্য মাঠ—মাঝে মাঝে কেবল দুই একজন রাখাল-শিশুকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এবং দুটো একটা গরু নদীর ঢালু তটের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত এসে সরস তৃণ অন্বেষণ করচে দেখা যায়। এখানকার দুপুরবেলার মত এমন নির্জ্জনতা নিস্তব্ধতা আর কোথাও নেই।

——:——

কালিগ্রাম

জানুয়ারী, ১৮৯১।

কাল যখন কাছারি করচি, গুটি পাঁচ ছয় ছেলে হঠাৎ অত্যন্ত সংযতভাবে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালে—কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে না করতে একেবারে বিশুদ্ধ বঙ্গ-ভাষায় আরম্ভ করে দিলে "পিতঃ, অভাগ্য সন্তানগণের সৌভাগ্যবশতঃ জগদীশ্বরের কৃপায় প্রভুর পুনর্ব্বার এতদ্দেশে শুভাগমন হইয়াছে।" এমনি করে আধ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করে গেল; মাঝে মাঝে মুখস্থ বক্তৃতা ভুলে যাচ্ছিল, আবার আকাশের দিকে চেয়ে সংশোধন করে নিচ্ছিল। বিষয়টা হচ্চে তাদের স্কুলে টুল ও বেঞ্চির অপ্রতুল হয়েছে, "সেই কাষ্ঠাসন অভাবে আমরাই বা কোথায় উপবেশন করি, আমাদের পূজনীয় শিক্ষক মহাশয়ই বা কোথায় উপবেশন করেন, এবং পরিদর্শক মহাশয় উপস্থিত হইলে তাঁহা-কেই বা কোথায় আসন দান করা যায়!" ছোট্ট ছেলের মুখে হঠাৎ এই অনর্গল বক্তৃতা শুনে আমার এমনি হাসি পাচ্ছিল! বিশেষতঃ এই জমিদারী কাছারিতে, যেখানে অশিক্ষিত চাষারা নিতান্ত গ্রাম্য ভাষায় আপনাদের যথার্থ দারিদ্র্যদুঃখ জানায়—যেখানে অতিবৃষ্টি দুর্ভিক্ষে গরু বাছুর হাল লাঙল বিক্রি করেও উদরান্নের অনটনের কথা শোনা যাচ্চে, যেখানে "অহরহ" শব্দের পরিবর্ত্তে "রহরহ," "অতিক্রমের" স্থলে "অতিক্রয়" ব্যবহার, সেখানে টুল বেঞ্চির অভাবে সংস্কৃত বক্তৃতা কানে এমনি অদ্ভুত শোনায়! অন্যান্য আমলা এবং প্রজারা এই ছোক্‌রার ভাষার প্রতি এতাদৃশ দখল দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল—তারা মনে মনে আক্ষেপ করছিল বাপ-মারা আমা-দের যত্ন করে লেখাপড়া শেখায়নি, নইলে আমরাও জমিদারের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এইরকম শুদ্ধ ভাষায় নিবেদন করতে পারতুম। আমি শুন্‌তে পেলুম একজন আর একজনকে ঠেলে ঈষৎ বিদ্বেষের ভাবে বল্‌চে—"এ'কে কে শিখিয়ে দিয়েচে।" আমি তার বক্তৃতা শেষ না হতেই তাকে থামিয়ে বল্লুম, আচ্ছা তোমাদের টুল বেঞ্চির বন্দোবস্ত করে দেব। তাতেও সে দম্‌লনা—সে যেখানে বক্তৃতা ভঙ্গ করেছিল সেইখান থেকে আবার

আরম্ভ করলে—যদিও তার আবশ্যক ছিল না কিন্তু শেষ কথাটি পর্য্যন্ত চুকিয়ে প্রণাম করে বাড়ি ফিরে গেল। বেচারা অনেক কষ্টে মুখস্থ করে এসেছিল, আমি তার টুল বেঞ্চি না দিলে সে ক্ষুণ্ণ হত না, কিন্তু তার বক্তৃতা কেড়ে নিলে বোধ হয় অসহ্য হত—সেই জন্যে যদিও আমার অনেক গুরুতর কাজ ছিল, তবু খুব গম্ভীরভাবে আদ্যোপান্ত শুনে গেলুম।

—:—

১৮

কালিগ্রাম

জানুয়ারি, ১৮৯১।

ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালবাসি! ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটাসুদ্ধ দু'হাতে আঁক্‌ড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোন স্বর্গ থেকে পেতুম? স্বর্গ আর কি দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্ব্বলতাময় এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মত এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত! আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী এর সোনার শস্যক্ষেত্রে, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত্ত্য-হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা তাদের রাখতে পারিনে, বাঁচাতে পারিনে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য তা সে করেচে। আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালবাসি। এর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে মনে আছে—"আমি দেবতার মেয়ে কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই; আমি ভালবাসি কিন্তু রক্ষা করতে পারিনে, আরম্ভ করি সম্পূর্ণ করতে পারিনে, জন্ম দিই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারিনে।" এই জন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশী ভালবাসি; এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্ব্বদা চিন্তাকাতর বলেই।

---*---

১৩

সাজাদপুরের অনতিদূরে,
১২ই মাঘ,
১৮৯১

এখনো পথে আছি। ভোর থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা সাতটা আটটা পর্য্যন্ত ক্রমাগতই ভেসে চলেছি। কেবলমাত্র গতির কেমন একটা আকর্ষণ আছে—দুধারের তটভূমি অবিশ্রাম চোখের উপর দিয়ে সরে সরে যাচ্চে—সমস্তদিন তাই চেয়ে আছি—কিছুতে তার থেকে চোখ ফেরাতে পারচিনে—পড়্তে মন যায় না, লিখ্তে মন যায় না, কোন কিছু কাজ নেই, কেবল চুপ করে চেয়ে বসে আছি। কেবল যে দৃশ্যের বৈচিত্র্যের জন্যে তা নয়—হয়ত দুধারে কিছুই নেই, কেবল তরুহীন তটের রেখামাত্র চলে গেছে—কিন্তু ক্রমাগতই চল্‌চে এই হচ্চে তার প্রধান আকর্ষণ। আমার নিজের কোন চেষ্টা নেই, পরিশ্রম নেই, অথচ বাইরের একটা অশ্রান্ত গতি মনটাকে বেশ মৃদু প্রশান্তভাবে ব্যাপৃত করে রাখে। মনের পরিশ্রমও নেই বিশ্রামও নেই এইরকমের একটা ভাব। চৌকিতে বসে বসে অলস অন্যমনস্কভাবে পা-দোলানো যেরকম এও সেইরকম, শরীরটা মোটের উপর বিশ্রাম করচে, অথচ শরীরের যে অতিরিক্ত উদ্যমটুকু কোনকালে স্থির থাক্‌তে চায়না, তাকেও একটা একঘেয়ে রকম কাজ দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হয়েচে। আমাদের কলিগ্রামের সেই মুমূর্ষুর নাড়ির মত অতি ক্ষীণস্রোত নদী কাল কোন্‌কালে ছাড়িয়ে এসেছি। সেই নদী থেকে ক্রমে একটা স্রোতস্বিনী নদীতে এসে পড়া গেল। সেটা বেয়ে ক্রমে এমন এক জায়গায় এসে পড়লুম যেখানে ডাঙায় জলে একাকার হয়ে গেছে। নদী এবং তীর উভয়ের আকার-প্রকারের ভেদ ক্রমশই ঘুচে গেছে—দুটি অল্পবয়সের ভাইবোনের মত। তীর এবং জল মাথায় মাথায় সমান—একটুও পাড় নেই। ক্রমে নদীর সেই ছিপ্‌ছিপে আকারটুকু আর থাকেনা—নানাদিক্কে নানারকমে ভাগ হয়ে ক্রমে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল। এই খানিকটা সবুজ ঘাস এই খানিকটা স্বচ্ছ জল। দেখে পৃথিবীর শিশুকাল মনে পড়ে—অসীম জলরাশির মধ্যে যখন স্থল সবে একটুখানি মাথা তুলেছে—

জলস্থলের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হয়ে যায়নি। চারিদিকে জেলেদের বাঁশ পোঁতা—জেলেদের জাল থেকে মাছ ছোঁ মেরে নেবার জন্যে চিল উড়ছে, পাঁকের উপরে নিরীহ বক দাঁড়িয়ে আছে—নানারকমের জলচর পাখী—জলে শ্যাওলা ভাসচে—মাঝে মাঝে পাঁকের মধ্যে অযত্নসম্ভূত ধানের গাছ, স্থির জলের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে মশা উড়চে। ভোরের বেলা বোট ছেড়ে দিয়ে কাঁচিকাঠায় গিয়ে পড়া গেল। একটি বারো তেরো হাত সঙ্কীর্ণ খালের মত, ক্রমাগত এঁকে বেঁকে গেছে—সমস্ত বিলের জল তারি ভিতর দিয়ে প্রবল বেগে নিষ্ক্রান্ত হচ্চে—এর মধ্যে আমাদের এই প্রকাণ্ড বোট নিয়ে বিষম কাণ্ড—জলের স্রোত বিদ্যুতের মত বোটটাকে টেনে নিয়ে যাচ্চে, দাঁড়িরা লগি হাতে করে সাম্‌লাবার চেষ্টা করচে, পাছে ডাঙার উপর বোটটাকে আছ্‌ড়ে ফেলে। এদিকে হু হু করে বাদলার বাতাস দিচ্চে, ঘন মেঘ করে রয়েছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্চে, শীতে সবাই কাঁপচে। ক্রমে খোলা নদীতে এসে পড়লুম। শীতকালে মেঘাচ্ছন্ন ভিজে দিন ভারি বিশ্রী লাগে। সকালবেলাটা তাই নিতান্ত নির্জ্জীবের মত ছিলুম। বেলা দুটোর সময় রোদ্ উঠ্‌ল। তার পর থেকে চমৎকার। খুব উঁচু পাড়ে বরাবর দুই ধারে গাছপালা লোকালয় এমন শান্তিময়, এমন সুন্দর, এমন নিভৃত—দুই ধারে স্নেহ-সৌন্দর্য্য বিতরণ করে নদীটি বেঁকে বেঁকে চলে গেছে—আমাদের বাংলাদেশের একটি অপরিচিত অন্তঃপুরচারিণী নদী। কেবল স্নেহ এবং কোমলতা এবং মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। চাঞ্চল্য নেই, অথচ অবসরও নেই। গ্রামের যে মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসে, এবং জলের ধারে বসে বসে অতি যত্নে গামছা দিয়ে আপনার শরীরখানি মেজে তুল্‌তে চায় তাদের সঙ্গে এর যেন প্রতিদিন মনের কথা এবং ঘরকন্নার গল্প চলে।

আজ সন্ধ্যাবেলায় নদীর বাঁকের মুখে ভারি একটি নিরালা জায়গায় বোট লাগিয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, জলে একটিও নৌকা নেই—জ্যোৎস্না জলের উপর ঝিকঝিক করচে—পরিষ্কার রাত্রি—নির্জ্জন তীর—বহুদূরে ঘনবৃক্ষবেষ্টিত গ্রামটি সুষুপ্ত—কেবল ঝিঁ ঝিঁ ডাক্‌চে আর কোন শব্দ নেই।

——:——

২০

সাজাদপুর।

ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১।

আমার সাম্‌নে নানারকম গ্রাম্য দৃশ্য দেখ্‌তে পাই, সেগুলো আমার দেখ্‌তে বেশ লাগে। ঠিক আমার জান্‌লার সুমুখে খালের ওপারে একদল বেদে বাখারির উপর খান্‌কতক দরমা এবং কাপড় টাঙিয়ে দিয়ে তারি মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেচে। গুটি-তিনেক খুব ছোট্ট ছোট্ট ছাউনিমাত্র—তার মধ্যে মানুষের দাঁড়াবার যো নেই—ঘরের বাইরেই তাদের সমস্ত গৃহকর্ম্ম চলে—কেবল রাত্তিরে সকলে মিলে কোন প্রকারে জড়পুঁটুলি হয়ে সেই ঘরের মধ্যে ঘুমতে যায়। বেদে জাতটাই এই রকম। কোথাও বাড়ি ঘর নেই, কোন জমিদারকে খাজনা দেয় না, একদল শুয়োর, গোটা দুয়েক কুকুর এবং কতকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। পুলিস্ সর্ব্বদা এদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। আমাদের এখানে যারা আছে, আমি জানলার দাঁড়িয়ে প্রায় তাদের কাজকর্ম্ম দেখি। এদের দেখ্‌তে মন্দ নয়, হিন্দুস্থানী ধরণের। কালো বটে কিন্তু বেশ শ্রী আছে, বেশ জোরালো সুডোল শরীর। মেয়েদেরও বেশ দেখ্‌তে—ছিপ্‌ছিপে লম্বা আঁটসাঁট, অনেকটা ইংরেজ মেয়েদের মত শরীরের স্বাধীন ভঙ্গী, অর্থাৎ বেশ অসঙ্কোচ চালচলন, নড়াচড়ার মধ্যে সহজ সরল দ্রুতভাব আছে—আমার ত ঠিক মনে হয় কালো ইংরেজের মেয়ে। পুরুষটা রান্না চড়িয়ে দিয়ে বসে বসে বাঁশ চিরে চিরে ধামা চাঙারি কুলো প্রভৃতি তৈরি করচে—মেয়েটা কোলের উপর একটি ছোট্ট আয়না নিয়ে অত্যন্ত সাবধানে একটি গামছা ভিজিয়ে মুখটি বিশেষ যত্নের সঙ্গে দু তিনবার করে মুছলে, তার পরে আঁচল টাঁচল গুলো একটু ইতস্ততঃ টেনে টুনে সেরে সুরে নিয়ে বেশ ফিট্‌ফাট্ হয়ে পুরুষটার কাছে উবু হয়ে বস্‌ল, তার পরে একটু আধ্‌টু কাজে হাত দিতে লাগ্‌ল। এরা নিতান্তই মাটির সন্তান, নিতান্তই পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে আছে—যেখানে-সেখানে জন্মাচ্চে, পথে পথেই বেড়ে উঠ্‌চে, এবং যেখানে-সেখানে মরচে, এদের ঠিক

অবস্থাটা ঠিক মনের ভাবটা ভারি জান্‌তে ইচ্ছে করে। দিনরাত খোলা আকাশে, খোলা-বাতাসে, অনাবৃত মৃত্তিকার উপরে এ একরকম নূতন রকমের জীবন, অথচ এরি মধ্যে কাজকর্ম্ম ভালবাসা ছেলেপুলে ঘরকরনা সমস্তই আছে। কেউ যে একদণ্ড কুঁড়ে হয়ে বসে আছে তা দেখ্‌লুম না – একটা-না-একটা কাজে আছেই। যখন হাতের কাজ ফুরোলো তখন থপ্‌ করে একজন মেয়ে আর একজন মেয়ের পিঠের কাছে বসে তার ঝুঁটি খুলে দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে উকুন বাছ্‌তে আরম্ভ করে দিলে এবং বোধ করি সেই সঙ্গে, ঐ ছোট তিনটে দর্‌মা-ছাউনির ঘরকন্না সম্বন্ধে এক্‌ এক্‌ করে গল্প জুড়ে দিলে, সেটা আমি এতদূর থেকে ঠিক নিশ্চিত বল্‌তে পারিনে, তবে অনেকটা অনুমান করা যেতে পারে। আজ সকালবেলায় এই নিশ্চিন্ত বেদের পরিবারের মধ্যে একটা বিষম অশান্তি এসে জুটেছিল। তখন বেলা সাড়ে আটটা নটা হবে—রাত্রে শোবার কাঁথা এবং ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলো বের করে এনে দরমার চালের উপর রোদ্দুরে মেলে দিয়েছে। শুয়োরগুলো বাচ্ছাকাচ্ছা সমেত সকলে গায়ে গায়ে লাগাও হয়ে একটা গর্ত্তর মত করে তার মধ্যে মস্ত এক তাল কাদার মত পড়েছিল—সমস্ত রাত শীতের পর সকাল বেলাকার রোদ্দুরে বেশ একটু আরাম বোধ করছিল—হঠাৎ তাদেরই একপরিবারভুক্ত কুকুর দুটো এসে ঘাড়ের উপর পড়ে ঘেউ ঘেউ করে তাদের উঠিয়ে দিলে! বিরক্তির স্বর প্রকাশ করে তারা ছোটা-হাজরি অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে চলে গেল। আমি আমার ডায়ারি লিখ্‌চি এবং মাঝে মাঝে সম্মুখের পথের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে দেখ্‌চি—এমন সময় বিষম একটা হাঁকডাক শোনা গেল। আমি উঠে জান্‌লার কাছে গিয়ে দেখলুম—বেদে-আশ্রমের সম্মুখে লোক জড় হয়েছে—এবং ওরি মধ্যে একটু ভদ্রগোছের একজন লাঠি আস্ফালন করে বিষম গালমন্দ দিচ্চে—কর্ত্তা বেদে দাঁড়িয়ে নিতান্ত ভীত কম্পিত ভাবে কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করচে। বুঝতে পারলুম কি একটা সন্দেহের কারণ হয়েচে তাই পুলিশের দারোগা এসে উপদ্রব বাধিয়ে দিয়েচে। মেয়েটা বসে বসে আপন মনে বাখারি ছুলে যাচ্ছে, যেন সে একলা বসে আছে—এবং কোথাও কিছু গোলমাল নেই। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে পরম নির্ভীকচিত্তে দারোগার মুখের সামনে বারবার বাহুআন্দোলন করে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দারো-গার তেজ প্রায় বার আনা পরিমাণ কমে গেল—অত্যন্ত মৃদুভাবে দুটো একটা কথা বলবার চেষ্টা করলে কিন্তু একটুও অবসর পেলে না। যে ভাবে এসেছিল সে ভাব অনেকটা পরিবর্ত্তন করে ধীরে ধীরে চলে যেতে হল। অনেকটা দূরে গিয়ে চেঁচিয়ে

বল্লে "আমি এই বলে গেলাম, তোমাদের এখান হৎকে যাবার লাগ্‌বে।" আমি ভাবলুম আমার বেদে প্রতিবেশীরা এখনি বুঝি খুঁটি দরমা তুলে পুঁটুলি বেঁধে ছানা পোনা নিয়ে শুয়োর তাড়িয়ে এখান থেকে প্রস্থান করবে। কিন্তু তার কোন লক্ষণ নেই; এখনো তারা নিশ্চিন্তভাবে বসে বসে বাঁথারি চিরচে, রাঁধ্‌চে বাড়চে, উকুন বাছচে। আমার এই খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে নানা দৃশ্য দেখ্‌তে পাই। সবসুদ্ধ বেশ লাগে—কিন্তু একএকটা দেখে ভারি মন বিগ্‌ড়ে যায়। গোড়ির উপর অসম্ভব ভার চাপিয়ে অসাধ্য রাস্তায় যখন গরুকে কাঠির বাড়ি খোঁচা দিতে থাকে তখন আমার নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়। আজ সকালে দেখছিলুম একজন মেয়ে তার একটি ছোট উলঙ্গ শীর্ণ কালো ছেলেকে এই খালের জলে নাওয়াতে এনেছে—আজ ভয়ঙ্কর শীত পড়েছে—জলে দাঁড় করিয়ে যখন ছেলেটার গায়ে জল দিচ্চে তখন সে করুণস্বরে কাঁদচে আর কাঁপচে, ভয়ানক কাশীতে তার গলা ঘন্ ঘন্ করচে—মেয়েটা হঠাৎ তার গালে এমন একটা চড় মারলে যে আমি আমার ঘর থেকে তার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলুম। ছেলেটা বেঁকে পঁড়ে হাঁটুর উপর হাত দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্‌ল, কাশীতে তার কান্না বেধে যাচ্ছিল! তারপরে ভিজে গায়ে সেই উলঙ্গ কম্পান্বিত ছেলের নড়া ধরে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেল। এই ঘটনাটা নিদারুণ পৈশাচিক বলে বোধ হল। ছেলেটা নিতান্ত ছোট—আমার খোকার বয়সী। এরকম একটা দৃশ্য দেখ্‌লে হঠাৎ মানুষের যেন একটা Ideal এর উপর আঘাত লাগে—বিশ্বস্তচিত্তে চল্‌তে চল্‌তে খুব একটা হুচট্‌ লাগার মত। ছোট ছেলেরা কি ভয়ানক অসহায়—তাদের প্রতি অবিচার করলে তারা নিরুপায় কাতরতার সঙ্গে কেঁদে নিষ্ঠুর হৃদয়কে আরো বিরক্ত করে তোলে; ভালকরে আপনার নালিস জানাতেও পারে না। মেয়েটা শীতে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে এসেছে আর ছেলেটার গায়ে একটুকরো কাপড়ও নেই--তার উপরে কাশী—তার উপরে এই ডাকিনীর হাতের মার!

—*—

সাজাদপুর।

ফেব্রুয়ারি ১৮৯১।

এখানকার পোষ্টমাষ্টার এক একদিন সন্ধের সময় এসে আমার সঙ্গে এইরকম ডাকের চিঠি যাতায়াতসম্বন্ধে নানা গল্প জুড়ে দেন। আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোষ্টআফিস্-বেশ সুবিধে—চিঠি আসবামাত্রই পাওয়া যায়। পোষ্টমাষ্টারের গল্প শুন্‌তে আমার বেশ লাগে। বিস্তর অসম্ভব কথা বেশ গম্ভীরভাবে বলে যান। কাল বল্‌ছিলেন, এ দেশের লোকের গঙ্গার উপর এমনি ভক্তি, যে এদের কোন আত্মীয় মরে গেলে তার হাড় গুঁড়ো করে রেখে দেয়, কোনকালে গঙ্গার জল খেয়েছে এমন লোকের যদি সাক্ষাৎ পায় তাহলে তাকে পানের সঙ্গে সেই হাড় গুঁড়ো খাইয়ে দেয় আর মনে করে তার আত্মীয়ের একটা অংশের গঙ্গালাভ হল। আমি হাস্‌তেহাস্‌তে বল্লুম "এটা বোধ হয় গল্প।" তিনি খুব গম্ভীরভাবে চিন্তা করে স্বীকার করলেন "তা হতে পারে।"

১২

শিলাইদহ।

ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১।

কাছারির পরপারের নির্জ্জন চরে বোট লাগিয়ে বেশ আরাম বোধহচ্চে। দিনটা এবং চারিদিকটা এমনি সুন্দর ঠেক্‌চে সে আর কি বল্‌ব। অনেক দিন পরে আবার এই বড় পৃথিবীটার সঙ্গে যেন দেখাসাক্ষাৎ হল। সেও বল্লে "এই যে!" আমিও বল্লুম "এই যে!" তার পরে দুজনে পাশাপাশি বসে আছি আর কোন কথাবার্ত্তা নেই। জল্ ছল্‌ছল্ করচে এবং তার উপরে রোদ্দুর চিক্‌চিক্ করচে—বালির চর ধূ ধূ করচে, তার উপর ছোট ছোট বনঝাউ উঠেছে। জলের শব্দ, দুপুরবেলাকার নিস্তব্ধতার ঝাঁ ঝাঁ, এবং ঝাউঝোপ থেকে দুটোএকটা পাখীর চিক্‌চিক্ শব্দ সবসুদ্ধ মিলে খুব একটা স্বপ্নাবিষ্ট ভাব। খুব লিখে যেতে ইচ্ছে করচে—কিন্তু আর কিছু নিয়ে নয়, এই জলের শব্দ, এই রোদ্দুরের দিন, এই বালির চর। মনে হচ্ছে রোজই ঘুরেফিরে এই কথাই লিখ্‌তে হবে; কেননা, আমার এই একই নেশা, আমি বারবার এই এককথা নিয়েই বকি। বড় বড় নদী কাটিয়ে আমাদের বোটটা একটা ছোট নদীর মুখে প্রবেশ করচে। দুইধারে মেয়েরা স্নান করচে, কাপড় কাচচে, এবং ভিজে কাপড়ে একমাথা ঘোমটা টেনে জলের কলসী নিয়ে ডানহাত দুলিয়ে ঘরে চলেছে—ছেলেরা কাদা মেখে জল ছুঁড়ে মাতামাতি করচে—এবং একটা ছেলে বিনা সুরে গান গাচ্চে—"একবার দাদা বলে ডাক্‌রে লক্ষ্মণ।" উঁচু পাড়ের উপর দিয়ে অদূরবর্ত্তী গ্রামের খড়ের চাল এবং বাঁশবনের ডগা দেখা যাচ্চে। আজ মেঘ কেটে গিয়ে রোদ্দুর দেখা দিয়েচে। যে মেঘগুলো আকাশের প্রান্তভাগে অবশিষ্ট আছে সেগুলো শাদা তুলোর রাশের মত দেখাচ্চে। বাতাস ঈষৎ গরম হয়ে বচ্চে; ছোট নদীতে বড় বেশী নৌকো নেই; দুটো একটা ছোট ডিঙি শুক্‌নো গাছের ডাল এ[illegible] নিয়ে শ্রান্তভাবে ছপ্‌ছপ্‌ দাঁড় ফেলে চলেচে—ডাঙায় বাঁশের উপ[illegible] জাল শুকোচ্চে—পৃথিবীর সকালবেলাকার কাজকর্ম্ম খানিকক্ষণের জন্য বন্ধহয়ে আছে।

১৩

চুহালি।

জলপথে ; ১৬ই জুন, ১৮৯১।

এখন পাল তুলে যমুনার মধ্যে দিয়ে চলেছি। আমার বাঁ ধারে মাঠে গরু চরচে—দক্ষিণ ধারে একেবারে কূল দেখা যাচ্চে না। নদীর তীব্র স্রোতে তীর থেকে ক্রমাগতই ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করে মাটি খসে পড়চে। আশ্চর্য্য এই, এত বড় প্রকাণ্ড এই নদীটার মধ্যে আমাদের বোট ছাড়া আর দ্বিতীয় একটি নৌকা দেখা যাচ্চে না—চারিদিকে জলরাশি ক্রমাগতই ছল্‌ ছল্‌ খল্‌ খল্‌ শব্দ করছে—আর বাতাসের হু হু শব্দ শোনা যাচ্চে। কাল সন্ধের সময় একটা চরের উপর বোট লাগিয়েছিলুম—নদীটি ছোট্ট—যমুনার একটি শাখা—একপারে বহুদূর পর্য্যন্ত শাদা বালি ধূ ধূ করছে, জনমানবের সম্পর্ক নেই, আরএক পারে সবুজ শস্যক্ষেত্র এবং বহুদূরে একটি গ্রাম। আর কত বার বল্‌ব,—এই নদীর উপরে, মাঠের উপরে, গ্রামের উপরে সন্ধ্যাটা কি চমৎকার—কি প্রকাণ্ড, কি প্রশান্ত, কি অগাধ; সে কেবল স্তব্ধ হয়ে অনুভব করা যায় কিন্তু ব্যক্ত করতে গেলেই চঞ্চল হয়ে উঠ্‌তে হয়। ক্রমে যখন অন্ধকারে সমস্ত অস্পষ্ট হয়ে এল, কেবল জলের রেখা এবং তটের রেখায় একটা প্রভেদ দেখা যাচ্ছিল—এবং গাছপালা কুটীর সমস্ত একাকার হয়ে একটা ঝাপ্‌সা জগৎ চোখের সামনে বিস্তৃত পড়ে ছিল—তখন ঠিক মনে হচ্ছিল এ সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার অপরূপ জগৎ—যখন এই বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পূর্ণ গঠিত হয়ে ওঠেনি—অল্পদিন হল সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে—প্রদোষের অন্ধকারে এবং একটি ভীতি বিস্ময়পূর্ণ ছম্‌ ছম্‌ নিস্তব্ধতায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন—যখন সাত সমুদ্র তেরোনদীর পারে মায়াপুরে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত—যখন রাজপুত্র এবং পাত্তরের পুত্র তেপান্তরের মাঠে একটা অসম্ভব উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে—এ যেন তখনকার সেই অতি সুদূরবর্ত্তী অর্দ্ধ-অচেতনায় মোহাচ্ছন্ন মায়ামিশ্রিত বিস্মৃত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর এবং মনে করা যেতেও পারে আমি সেই রাজপুত্র—একটা অসম্ভবের প্রত্যাশায় সন্ধ্যারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি—এই ছোট নদীটি সেই তেরো-

নদীর মধ্যে একটা নদী এখনো সাত সমুদ্র বাকি আছে—এখনো অনেক দূর, অনেক ঘটনা, অনেক অন্বেষণ বাকি ; এখনো কত অজ্ঞাত নদীতীরে কত অপরিচিত সমুদ্রসীমায় কত ক্ষীণ চন্দ্রালোকিত অনাগত রাত্রি অপেক্ষা করে আছে—তার পরে হয়ত অনেক ভ্রমণ, অনেক রোদন, অনেক বেদনের পর হঠাৎ একদিন, আমার কথাটি ফুরোলো নটে শাকটি মুড়োলো—হঠাৎ মনে হবে এতক্ষণ একটা গল্প বল্‌ছিলুম—এখন গল্প ফুরিয়েচে এখন অনেক রাত্রি, এখন ছোট ছেলের ঘুমোবার সময়।

১৫

চুহালি।

১৯শে জুন, ১৮৯১।

কাল পনেরো মিনিট বাইরে বস্‌তে না বস্‌তে পশ্চিমে ভয়ানক মেঘ করে। এল খুব কালো, গাঢ় আলুথালুরকমের মেঘ, তারি মাঝে মাঝে চোরা আলো পড়ে রাঙা হয়ে উঠেছে। দুটোএকটা নৌকা তাড়াতাড়ি যমুনা থেকে এই ছোট নদীর মধ্যে প্রবেশ করে দড়িদড়া নোঙর দিয়ে মাটি আঁক্‌ড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বস্‌ল। যারা মাঠে শস্য কাট্‌তে এসেছিল তারা মাথায় একএক বোঝা শস্য নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে, গরুও ছুটেচে, তার পিছনে পিছনে বাছুর লেজ নেড়েনেড়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়বার চেষ্টা করচে। খানিক্‌বাদে একটা আক্রোশের গর্জ্জন শোনা গেল; কতকগুলো ছিন্নভিন্ন মেঘ ভগ্নদূতের মত সুদূর পশ্চিম থেকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এল—তারপরে বিদ্যুৎ বজ্র ঝড় বৃষ্টি সমস্ত একসঙ্গে এসে পড়ে খুব একটা তুর্কি নাচন নাচ্‌তে আরম্ভ করে দিলে—বাঁশ গাছগুলো হাউ হাউ শব্দে একবার পূর্ব্বে একবার পশ্চিমে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগ্‌ল—ঝড় যেন সোঁ সোঁ করে সাপুড়ের মত বাঁশি বাজাতে লাগ্‌ল আর জলের ঢেউগুলো তিন লক্ষ সাপের মত ফণা তুলে তালেতালে নৃত্য আরম্ভ করে দিলে। কালকের সে যে কি কাণ্ড সে আর কি বল্‌ব। বজ্রের যে শব্দ সে আর থামে না—আকাশের কোন্‌খানে যেন একটা আস্ত জগৎ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্চে। বোটের খোলা জানলার উপর মুখ রেখে প্রকৃতির সেই রুদ্রতালে আমিও বসেবসে মনটাকে দোলা দিচ্ছিলুম। সমস্ত মনের ভিতরটা যেন ছুটিপাওয়া স্কুলের ছেলের মত বাইরে ঝাঁপিয়ে উঠেছিল। শেষকালে বৃষ্টির ছাঁটে যখন বেশ একটু আর্দ্র হয়ে ওঠা গেল তখন জান্‌লা এবং কবিত্ব বন্ধ করে খাঁচার পাখীর মত অন্ধকারে চুপচাপ বসে রইলুম।

২৫

সাজাদপুর।

জলপথে ২০শে জুন, ১৮৯১।

কাল টেলিগ্রামের উত্তর পেয়ে আমাদের সমস্ত কাজ সেরে সন্ধ্যার সময় নৌকো ছেড়ে দিলুম। আকাশে মেঘ ছিল না—চাঁদ উঠেছিল—অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছিল—ঝুপ্‌ঝুপ্‌ দাঁড় ফেলে স্রোতের মুখে ছোট নদীটির মধ্যে ভেসে যাওয়া যাচ্ছিল। চারিদিক পরি-স্থান বলে মনে হচ্ছিল। সে সময়ে অন্যান্য সমস্ত নৌকো ডাঙায় কাছি বেঁধে পাল গুটিয়ে চন্দ্রালোকে স্তব্ধ হয়ে নিদ্রা দিচ্ছিল। অবশেষে ছোট নদীটা যেখানে যমুনার মধ্যে গিয়ে পড়েচে তারি কাছে একটা খুব নিরাপদ স্থানে গিয়ে নৌকো বাঁধ্‌লে। কিন্তু নিরাপদ স্থানের অনেক দোষ; হাওয়া পাওয়া যায় না - ঝুপ্‌সির ভিতরে অন্যান্য নৌকোর কাছে—জঙ্গলের গন্ধ ইত্যাদি—আমি মাঝিকে বল্লুম—এপারে হাওয়া পাওয়া যাবে না, ওপারে চল্‌। ওপারে উঁচু পাড় নাই; জলে স্থলে সমান—এমন কি ধানের ক্ষেতের উপর এক হাঁটু জল উঠেচে। মাঝি সেইখানেই নৌকো নিয়ে বাঁধ্‌লে। তখন আমাদের পিছনদিকের আকাশে একটু বিদ্যুৎ চিক্‌মিক্‌ করতে আরম্ভ করেচে। আমি বিছানায় ঢুকে জান্‌লার কাছে মুখ রেখে ক্ষেতের দিকে চেয়ে আছি এমন সময় রব উঠ্‌ল—ঝড় আস্‌চে। কাছি ফেল্‌, নোঙর ফেল্‌, এ কর, সে কর, করতে করতে এক প্রলয় ঝড় ছুটে এল। মাঝি থেকে থেকে বল্‌তে লাগ্‌ল—ভয় কোরোনা ভাই আল্লার নাম কর আল্লা মালেক। থেকে থেকে সকলে আল্লা আল্লা করতে লাগ্‌ল। আমাদের বোটের দুই পাশের পরদা বাতাসে আছাড় খেয়ে খেয়ে শব্দ করতে লাগ্‌ল, আমাদের বোটটা যেন একটা শিকলিবাঁধা পাখীর মত পাখা ঝাপ্‌টে ঝট্‌পট্‌ ঝট্‌পট করছিল—ঝড়টা থেকে থেকে চীহিঁ চীহিঁ শব্দ করে একটা বিপর্য্যয় চিলের মত হঠাৎ এসে পড়ে বোটের ঝুঁটি ধরে ছোঁ মেরে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়—বোটটা অমনি সশব্দে ধড়ফড় করে ওঠে। অনেকক্ষণ বাদে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে ঝড় থেমে গেল। আমি হাওয়া খেতে চেয়েছিলুম—হাওয়াটা কিছু বেশী খাইয়ে দিলে—একেবারে আশাতিরিক্ত।

যেন কে ঠাট্টা করে বলে যাচ্ছিল—এইবার পেট ভরে হাওয়া খেয়ে নাও, তারপরে সাধ মিট্‌লে কিঞ্চিৎ জল খাওয়াব—তাতে এমনি পেট ভরবে যে ভবিষ্যতে আর কিছু খেতে হবে না। আমরা কি না প্রকৃতির নাতি সম্পর্ক, তাই তিনি মধ্যেমধ্যে এই-রকম একটুআধটু তামাসা করে থাকেন। আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি জীবনটা একটা গম্ভীর বিদ্রূপ, এর মজাটা বোঝা একটু শক্ত—কারণ, যাকে নিয়ে মজা করা হয়, মজার রসটা সে তেমন গ্রহণ করতে পারে না। এই মনে কর, দুপুর রাত্রে খাটে শুয়ে আছি, হঠাৎ পৃথিবীটা ধরে এমনি নাড়া দিলে যে কে কোথায় পালাবে পথ পায় না—মৎলবটা খুব নতুন রকমের এবং মজাটা খুব আকস্মিক তার আর সন্দেহ নেই—বড় বড় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের অর্দ্ধেক রাত্রে উর্দ্ধশ্বাসে অসম্বৃত অবস্থায় বিছানার বাইরে দৌড় করানো কি কম কৌতুক! এবং দুটোএকটা সদ্যনিদ্রোত্থিত হতবুদ্ধি নিরীহ লোকের মাথার উপরে বাড়ির আস্ত ছাতটা ভেঙে আনা কি কম ঠাট্টা! হতভাগ্য লোকটা যেদিন ব্যাঙ্কে চেক্ লিখে রাজমিস্ত্রির বিল শোধ করছিল, রহস্যপ্রিয়া প্রকৃতি সেইদিন বসে বসে কত হেসেছিল।

২৮

সাজাদপুর,

২২শে জুন, ১৮৯১।

আজকাল আমার এখানে এমন চমৎকার জ্যোৎস্না রাত্রি হয় সে আর কি বল্‌ব। অবশ্য যে ঠিকানায় এ চিঠি গিয়ে পৌঁছবে সেখানেও যে জ্যোৎস্নারাত্রি হয় না তা বলা আমার অভিপ্রায় নয়। স্বীকার করতেই হবে সেখানে সেই ময়দানের উপর, সেই গির্জ্জের চূড়ার উপর, সম্মুখের নিস্তব্ধ গাছপালার উপর ধীরে ধীরে জ্যোৎস্না আপনার নীরব অধিকার বিস্তার করে কিন্তু সেখানে জ্যোৎস্না ছাড়াও অন্য পাঁচটা বস্তু আছে—কিন্তু আমার এই নিস্তব্ধ রাত্রি ছাড়া আর কিছুই নেই। একলা বসে বসে আমি যে এর ভিতরে কি অনন্ত শান্তি এবং সৌন্দর্য্য দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারিনে। একদল আছে তারা ছট্‌ফট্‌ করে, জগতের সকল কথা জান্‌তে পারচিনে কেন—আর একদল ছট্‌ফটিয়ে মরে মনের সকল ভাব প্রকাশ করতে পারচিনে কেন—মাঝের থেকে জগতের কথা জগতেই থেকে যায় এবং অন্তরের কথা অন্তরেই থাকে। মাথাটা জান্‌লার উপর রেখে দিই, বাতাস প্রকৃতির স্নেহহস্তের মত আস্তে আস্তে আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছল্‌ছল্‌ শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিক্‌ ঝিক্‌ করতে থাকে এবং অনেক সময় "জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়।" অনেক সময় মনের আন্তরিক অভিমান, একটু স্নেহের স্বর শুন্‌লেই অমনি অশ্রুজলে ফেটে পড়ে;—এই অপরিতৃপ্ত জীবনের জন্যে প্রকৃতির উপর আমাদের যে আজন্মকালের অভিমান আছে, যখনি প্রকৃতি স্নেহমধুর হয়ে ওঠে তখনি সেই অভিমান, অশ্রুজল হয়ে, নিঃশব্দে ঝরে পড়তে থাকে—তখন প্রকৃতি আরো বেশি করে আদর করে, এবং তার বুকের মধ্যে অধিকতর আবেগের সহিত মুখ লুকোই।

সাজাদপুর,
২৩শে জুন, ১৮৯১।

আজকাল দুপুর বেলাটা বেশ লাগে। রৌদ্রে চারিদিক বেশ নিঃঝুম হয়ে থাকে—মনটা ভারি উড়ুউড়ু করে, বই হাতে নিয়ে আর পড়তে ইচ্ছে করে না। তীরে যেখানে নৌকো বাঁধা আছে সেইখানথেকে একরকম ঘাসের গন্ধ এবং থেকেথেকে পৃথিবীর একটা গরম ভাপ্ গায়ের উপরে এসে লাগ্তে থাকে—মনে হয় এই জীবন্ত উত্তপ্ত ধরণী আমার খুব নিকটে থেকে নিশ্বাস ফেল্‌চে—বোধ করি আমারো নিশ্বাস তার গায়ে গিয়ে লাগ্‌চে। ছোট ছোট ধানের গাছগুলো বাতাসে ক্রমাগত কাঁপ্‌চে—পাতিহাঁস জলের মধ্যে নেবে ক্রমাগত মাথা ডুবচ্চে এবং চঞ্চু দিয়ে পিঠের পালক সাফ করচে। আর কোন শব্দ নেই, কেবল জলের বেগে বোটটা যখন ধীরে ধীরে বেঁকতে থাকে তখন কাছিটা এবং বোটের সিঁড়িটা এক রকম করুণ মৃদু শব্দ করতে থাকে। অনতিদূরে একটা খেয়াঘাট আছে। বটগাছের তলায় নানাবিধ লোক জড় হয়ে নৌকোর জন্যে অপেক্ষা করচে—নৌকো আসবামাত্রই তাড়াতাড়ি উঠে পড়চে—অনেকক্ষণ ধরে এই নৌকোপারাপার দেখ্‌তে বেশ লাগে। ওপারে হাট; তাই খেয়া নৌকায় এত ভীড়। কেউবা ঘাসের বোঝা, কেউবা একটা চুপ্‌ড়ি, কেউবা একটা বস্তা কাঁধে করে হাটে যাচ্চে এবং হাট থেকে ফিরে আস্‌চে—ছোট নদীটি এবং দুই পারের দুই ছোট গ্রামের মধ্যে নিস্তব্ধ দুপুরবেলায় এই একটুখানি কাজকর্ম্ম, মনুষ্যজীবনের এই একটুখানি স্রোত, অতি ধীরে ধীরে চল্‌চে। আমি বসে বসে ভাব্‌ছিলুম, আমাদের দেশের মাঠ ঘাট আকাশ রোদ্দুরের মধ্যে এমন একটা সুগভীর বিষাদের ভাব কেন লেগে আছে? তার কারণ এই মনে হল আমাদের দেশে প্রকৃতিটা সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ে—আকাশ মেঘমুক্ত, মাঠের সীমা নেই, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করচে, এর মধ্যে মানুষকে অতি সামান্য মনে হয়—মানুষ আস্‌চে এবং যাচ্চে—এই খেয়ানৌকার মত পারাপার হচ্চে—তাদের অল্প অল্প কলরব শোনা যায়, এই সংসারের হাটে ছোটখাট

সুখদুঃখের চেষ্টায় একটুখানি আনাগোনা দেখা যায়,—কিন্তু এই অনন্তপ্রসারিত প্রকাণ্ড উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে সেই মৃদুগুঞ্জন, সেই একটুআধটু গীতধ্বনি, সেই নিশিদিন কাজকর্ম্ম কি সামান্য, কি ক্ষণস্থায়ী, কি নিস্ফল কাতরতাপূর্ণ মনে হয়। এই নিশ্চেষ্ট, নিস্তব্ধ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্দেশ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৃহৎ সৌন্দর্য্যপূর্ণ নির্ব্বিকার উদার শান্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায় এবং তারি তুলনায় আপনার মধ্যে এমন একটা সততসচেষ্ট পীড়িত জর্জ্জরিত ক্ষুদ্র নিত্যনৈমিত্তিক অশান্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে ঐ অতিদূর নদীতীরের ছায়াময় নীল বনরেখার দিকে চেয়ে নিতান্ত উন্মনা হয়ে যেতে হয়। "ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান তরুমর্ম্মর পবনে" ইত্যাদি। যেখানে মেঘে কুয়াশায় বরফে অন্ধকারে প্রকৃতি আচ্ছন্ন সঙ্কুচিত, সেখানে মানুষের খুব কর্ত্তৃত্ব—মানুষ সেখানে আপনার সকল ইচ্ছা সকল চেষ্টাকে চিরস্থায়ী মনে করে—আপনার সকল কাজকে চিহ্নিত করে রেখে দেয়—পষ্টারিটির দিকে তাকায়, কীর্ত্তিস্তম্ভ তৈরি করে, জীবনচরিত লেখে, এবং মৃতদেহের উপরেও পাষাণের চিরস্মরণগৃহ নির্ম্মাণ করে—তারপরে অনেক চিহ্ন ভেঙে যায় এবং অনেক নাম বিস্মৃত হয় কিন্তু সময়াভাবে সেটা কারো খেয়ালে আসে না।

—•—

সাজাদপুর।

বিকেলবেলায় আমি এখানকার গ্রামের ঘাটের উপরে বোট লাগাই। অনেকগুলো ছেলে মিলে খেলা করে, বসে বসে দেখি। কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে নিশিদিন যে পদাতিক সৈন্য লেগে থাকে তাদের জ্বালায় আর আমার মনে সুখ নেই। ছেলেদের খেলা তারা বেআদবী মনে করে; মাঝিরা যদি আপনাদের মধ্যে মন খুলে হাসি গল্প করে সেটা তারা রাজার প্রতি অসম্মান জ্ঞান করে; চাষারা যদি ঘাটে গরুকে জল খাওয়াতে নিয়ে আসে তারা তৎক্ষণাৎ লাঠি হাতে করে রাজমর্য্যাদা রক্ষা করতে ধাবিত হয়। অর্থাৎ রাজার চতুর্দ্দিকটা হাসিহীন খেলাহীন শব্দহীন জনহীন ভীষণ মরুভূমি করতে পারলে তাদের মনের মত রাজসম্ভ্রম রক্ষা হয়। কালও তারা ছেলেদের তাড়া করতে উদ্যত হয়েছিল, আমি আমার রাজমর্য্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের নিবারণ করলুম। ঘটনাটা হচ্চে এই—

ডাঙার উপর একটা মস্ত নৌকার মাস্তুল পড়ে ছিল—গোটা কতক বিবস্ত্র ক্ষুদে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে, যে যদি যথোচিত কলরবসহকারে সেইটেকে ঠেলে ঠেলে গড়ান যেতে পারে তাহলে খুব একটা নতুন এবং আমোদজনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমন মনে আসা, অমনি কার্য্যারম্ভ, "সাবাস্ জোয়ান্—হেঁইয়ো! মারো ঠেলা হেঁইয়ো!" মাস্তুল যেমনি একপাক ঘুরচে অমনি সকলের আনন্দে উচ্চহাস্য। কিন্তু এই ছেলেদের মধ্যে যে দুটিএকটি মেয়ে আছে, তাদের ভাব আর-একরকম। সঙ্গীঅভাবে ছেলেদের সঙ্গে মিশ্‌তে বাধ্য হয়েচে কিন্তু এই সকল শ্রমসাধ্য উৎকট খেলায় তাদের মনের যোগ নেই। একটি ছোট মেয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে গম্ভীর-প্রশান্তভাবে সেই মাস্তুলটার উপর গিয়ে চেপে বস্‌ল। ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি। দুইএকজন ভাব্‌লে এমনস্থলে হারমানাই ভাল; তফাতে গিয়ে তারা ম্লানমুখে সেই মেয়েটির অটল গাম্ভীর্য্য নিরীক্ষণ করতে লাগ্‌ল। ওদের মধ্যে একজন এসে পরীক্ষাচ্ছলে মেয়েটাকে একটুএকটু ঠেল্‌তে চেষ্টা করলে। কিন্তু সে নীরবে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করতে লাগ্‌ল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছেলেটি এসে তাকে বিশ্রামের

জন্যে অন্য স্থান নির্দ্দেশ করে দিলে, সে তাতে সতেজে মাথা নেড়ে কোলের উপর দুটি হাত জড় করে নড়েচড়ে আবার বেশ গুছিয়ে বস্‌ল—তখন সেই ছেলেটা শারীরিক যুক্তি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলে এবং অবিলম্বে কৃতকার্য্য হল। আবার অভ্রভেদী আনন্দধ্বনি উঠ্‌ল, পুনর্ব্বার মাস্তুল গড়াতে লাগ্‌ল—এমনকি, খানিকক্ষণ বাদে মেয়েটাও তার নারীগৌরব এবং সুমহৎ নিশ্চেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করে কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে ছেলেদের এই অর্থহীন চপলতায় যোগ দিলে। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল সে মনে মনে বলছিল—ছেলেরা খেলাকরতে জানে না, কেবল যতরাজ্যের ছেলেমানুষী। হাতের কাছে যদি একটা খোঁপাওয়ালা হলুদে রঙের মাটির বেনে পুতুল থাক্‌ত তাহলে কি সে আর এই অপরিণতবুদ্ধি নিতান্ত শিশুদের সঙ্গে মাস্তুল ঠেলার মত এমনএকটা বাজে খেলায় যোগ দিত! এমনসময় আরএকরকমের খেলা তাদের মনে এল, সেটাও খুব মজার। দুজন ছেলেতে মিলে একটা ছেলের হাত পা ধরে ঝুলিয়ে তাকে দোলা দেবে। এর ভিতরে খুব একটা রহস্য আছে সন্দেহ নেই—কারণ, ছেলেরা বেজায় উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু মেয়েটার পক্ষে অসহ্য হল। সে অবজ্ঞাভরে ক্রীড়াক্ষেত্র ত্যাগ করে ঘরে চলে গেল। হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘট্‌ল। যাকে দোলাচ্ছিল সে গেল পড়ে। সেই অভিমানে সে সঙ্গীদের ত্যাগ করে বহুদূরে গিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে তৃণশয্যায় শুয়ে পড়ল—ভাবে এই রকম জানালে—এই পাষাণহৃদয় জগৎসংসারের সঙ্গে সে আর কোন সম্পর্ক রাখ্‌বেনা, কেবল একলা চীৎ হয়ে শুয়ে আকাশের তারা গণনা করবে, মেঘের খেলা দেখে হাতে মাথা রেখে জীবন কাটিয়ে দেবে এবং "যাবত জীবন রবে কারো সঙ্গে খেলিব না।" তার এইরকম অকালে পরম বৈরাগ্য দেখে বড় ছেলেটা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে কোলের উপর তার মাথাটা নিয়ে সাত্বনাস্বরে অনুতাপপ্রকাশ করে বল্‌তে লাগ্‌ল, আয় না ভাই, ওঠ্ না ভাই লেগেছে ভাই! অনতিকাল পরেই দুই কুকুরশাবকের মত দুজনের হাতকাড়াকাড়ি খেলা বেধে গেল—এবং দুমিনিট না যেতে দেখি সেই ছেলে ফের দুল্‌তে আরম্ভ করেছে! এম্‌নি মানুষের প্রতিজ্ঞা! এম্‌নি তার মনের বল! এম্‌নি তার বুদ্ধির স্থিরতা! খেলা ছেড়ে একবার দূরে গিয়ে চীৎ হয়ে শোয়, আবার ধরা দিয়ে হেসে হেসে দোহদোলায় দুল্‌তে থাকে। এ মানুষের মুক্তি কি করে হবে! এমন ক'জন ছেলে আছে যে খেলাঘর ছেড়ে মাথায় হাত দিয়ে কেবল চীৎ হয়ে পড়ে থাকে—সেই সব ভালছেলেদের জন্যে গোলোকধামে বাসা তৈরিহচ্ছে।

——:——

সাজাদপুর।

জুন, ১৮৯১।

কাল রাত্রে ভারি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলুম। সমস্ত কলকাতা সহরটা যেন মহা একটা ভীষণ অথচ আশ্চর্য্য ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে—বাড়িঘর সমস্তই একটা অন্ধকার কালো কুয়াশার ভিতরথেকে দেখাযাচ্চে—এবং তার ভিতর তুমুল কি একটা কাণ্ড চল্‌চে। আমি একটা ভাড়াটে গাড়ি করে পার্কষ্ট্রীটের ভিতর দিয়ে যাচ্চি। যেতেযেতে দেখ্‌লুম সেণ্ট্‌জেভিয়ার কলেজটা দেখ্‌তেদেখ্‌তে হুহু করে বেড়ে উঠ্‌চে—সেই অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে অসম্ভব উঁচু হয়ে উঠ্‌চে। তারপরে ক্রমে জান্‌তে পারলুম একদল অদ্ভুত লোক এসেচে তারা টাকা পেলে কি এক কৌশলে এইরকম অপূর্ব্ব ব্যাপার করতে পারে। যোড়াসাঁকোর বাড়ি এসে দেখি সেখেনেও তারা এসেচে; বদ্‌ দেখ্‌তে, কতকটা মোঙ্গোলিয়ান্‌ ধাঁচের চেহারা—সরু গোঁপ, গোটা দশ বারো দাড়ি মুখের এদিকেওদিকে খোঁচাখোঁচা রকম বেরিয়েচে। তারা মানুষকেও বড় করে দিতে পারে। তাই আমাদের দেউড়িতে আমাদের বাড়ির সব মেয়েরা লম্বা হবার জন্যে উমেদার হয়েচেন—তারা এঁদের মাথায় কি একটা গুঁড়ো দিচ্চে আর এঁরা হুস্‌ করে লম্বা হয়ে উঠ্‌চেন। আমি কেবলি বল্‌চি, কি আশ্চর্য্য, এ যেন ঠিক স্বপ্নের মত মনে হচ্চে। তার পরে, কে একজন প্রস্তাব করলে আমাদের বাড়িটা উঁচু করে দিতে। তারা রাজি হয়ে বাড়ি কতকটা ভাঙতে আরম্ভ করলে, খানিকটা ভেঙেচুরে বল্লে, এইবার এত টাকা চাই নইলে বাড়িতে হাত দেবনা, কুঞ্জসরকার বল্লে সে কি হয়; কাজ না হয়ে গেলে কি করে টাকা দেওয়া যায়। বল্‌তেই তারা চটে উঠ্‌ল—বাড়িটা সমস্তই একরকম বেঁকে চুরে বিশ্রী হয়ে গেল এবং মাঝেমাঝে দেখা গেল, আধখানা মানুষ দেয়ালের মধ্যে গাঁথা রয়েছে, আধখানা বেরিয়ে। সমস্ত দেখে-শুনে মনে হল এ সব সয়তানী কাণ্ড। বড়দাদাকে বল্লুম "বড়দা, দেখচেন ব্যাপারটা। আসুন একবার উপাসনা করা যাক্।" দালানে গিয়ে খুব একাগ্রমনে উপাসনা করা

গেল। বেরিয়ে এসে মনে করলুম ঈশ্বরের নাম করে তাদের ভর্ৎসনা করব—কিন্তু বুক ফেটে যেতে লাগ্‌ল তবু গলা দিয়ে কথা বেরোল না। তারপর কখন্ জেগে উঠ্‌লুম ঠিক মনে পড়চেনা। ভারি অদ্ভুত স্বপ্ন না? সমস্ত কল্‌কাতাসহরে সয়তানের প্রাদুর্ভাব; সবাই তার সাহায্যে বেড়ে ওঠ্‌বার চেষ্টা করচে, একটা অন্ধকার নারকী কুজ্‌ঝটিকার মধ্যে সমস্ত সহরের ভয়ঙ্কর শ্রীবৃদ্ধি হচ্চে। কিন্তু ওর মধ্যে একটু পরিহাসও ছিল—এত দেশ থাক্‌তে জেসুয়িট্‌দের ইস্কুলটার উপরেই সয়তানের এত অনুগ্রহ কেন?

* * তারপরে এখানকার স্কুলের মাষ্টারেরা দর্শনাভিলাষী হয়ে এসে উপস্থিত। তাঁরা কিছুতেই উঠ্‌তে চান না, অথচ আমার আবার তেমন কথা জোগায় না—পাঁচ মিনিট অন্তর দুইএক কথা জিজ্ঞাসা করি; তার একআধটা উত্তর পাই, তার পরে বোকার মত বসে থাকি, কলম নাড়ি, মাথা চুল্‌কোই—জিজ্ঞাসা করি এবার এখানে শস্য কি রকম হয়েছে—স্কুলমাষ্টাররা শস্যসম্বন্ধে কিছুই জানেন না—ছাত্রসম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় তা আরম্ভেই হয়েগেছে; ফের আবার গোড়ার কথা পাড়লুম, জিজ্ঞাসা করলুম আপনাদের স্কুলে কজন ছাত্র? একজন বল্লেন আশি জন, আর একজন বল্লেন না একশ পচাত্তর জন। মনে করলুম দুজনের মধ্যে খুব একটা তর্ক বেধে যাবে, কিন্তু দেখ্‌লুম, তৎক্ষণাৎ মতের ঐক্য হয়ে গেল। তারপরে দেড় ঘণ্টা পরে কেন যে তাঁদের মনে পড়্‌ল আজ তবে আসি তা ঠিক বোঝা শক্ত—আর এক ঘণ্টা পূর্ব্বেও মনে হতে পারত, আর বারো ঘণ্টা পরেও মনে হতে পারত। দেখা যাচ্চে এর ভিতরে কোন একটা নিয়ম নেই, অন্ধ দৈবঘটনা মাত্র।

সাজাদপুর,

৪ঠা জুলাই, ১৮৯১।

আমাদের ঘাটে একটি নৌকো লেগে আছে, এবং এখানকার অনেকগুলি "জনপদ-বধূ" তার সম্মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়েচে। বোধ হয় একজন কে কোথায় যাচ্চে এবং তাকে বিদায় দিতে সবাই এসেচে। অনেকগুলি কচিছেলে অনেকগুলি ঘোমটা এবং অনেকগুলি পাকা চুল একত্র হয়েচে। কিন্তু ওদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে তার প্রতিই আমার মনোযোগটা সর্ব্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হচ্চে। বোধ হয় বয়সে বারো-তেরো হবে, কিন্তু একটু হৃষ্ট পুষ্ট হওয়াতে চোদ্দ পনেরো দেখাচ্চে। মুখখানি বেড়ে। বেশ কালো অথচ বেশ দেখ্‌তে। ছেলেদের মত চুল ছাঁটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্চে। এমন বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ এবং পরিষ্কার সরলভাব। একটা ছেলে কোলে করে এমন নিঃসঙ্কোচ কৌতুহলের সঙ্গে আমাকে চেয়েচেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল! তার মুখখানিতে কিছু যেন নির্ব্বুদ্ধিতা কিম্বা অসরলতা কিম্বা অসম্পূর্ণতা নেই। বিশেষতঃ আধা ছেলে আধা মেয়ের মত হয়ে আরোএকটু বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ছেলেদের মত আত্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ভাব এবং তার সঙ্গে মাধুরী মিশে ভারি নতুনরকমের একটি মেয়ে তৈরি হয়েছে। বাংলা দেশে যে এরকম ছাঁদের "জনপদবধূ" দেখা যাবে এমন প্রত্যাশা করিনি। দেখচি এদের বংশটাই তেমন বেশী লাজুক নয়। একজন মেয়ে ডাঙায় দাঁড়িয়ে রৌদ্রে চুল এলিয়ে দশাঙ্গুলি দ্বারা জটা ছাড়াচ্চে এবং নৌকোর আর একটি রমণীর সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ঘরকরনার আলাপ হচ্চে। শোনা গেল তার একটি মাত্র "ম্যায়া" অন্য "ছাওয়াল নাই"—কিন্তু সে মেয়েটির বুদ্ধিসুদ্ধি নেই—"কারে কি কয় কারে কি হয়—আপন পর গ্যান নেই"—আরো অবগত হওয়া গেল গোপাল সার জামাইটি তেমন ভাল হয়নি, মেয়ে তার কাছে যেতে চায় না। অবশেষে যখন যাত্রার সময় হল তখন দেখলুম আমার সেই চুলছাঁটা, গোলগাল হাতে-বালা-পরা, উজ্জ্বল সরল মুখশ্রী মেয়েটিকে নৌকোয় তুল্লে। বুঝ্‌লুম, বেচারা বোধ হয় বাপের বাড়ি

থেকে স্বামীর ঘরে যাচ্চে। নৌকো যখন ছেড়ে দিলে মেয়েরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, দুই একজন আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে নাক্‌চোখ্ মুছ্‌তে লাগ্‌ল। একটি ছোট মেয়ে, খুব এঁটে চুল বাঁধা, একটি বর্ষীয়সীর কোলে চড়ে তার গলা জড়িয়ে তার কাঁধের উপর মাথাটি রেখে নিঃশব্দে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। যে গেল সে বোধ হয় এ বেচারির দিদিমণি, এর পুতুলখেলায় বোধ হয় মাঝেমাঝে যোগ দিত, বোধ হয় দুষ্টমি করলে মাঝেমাঝে সে একে টিপিয়ে দিত। সকালবেলাকার রৌদ্র এবং নদীতীর এবং সমস্ত এমন গভীর বিষাদে পূর্ণ বোধ হতে লাগ্‌ল! সকালবেলাকার একটা অত্যন্ত হতাশ্বাস করুণ রাগিণীর মত। মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা এমন সুন্দর অথচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ! এই অজ্ঞাত ছোট মেয়েটির ইতিহাস আমার যেন অনেকটা পরিচিত হয়েগেল। বিদায়-কালে এই নৌকো করে নদীর স্রোতে ভেসেযাওয়ার মধ্যে যেন আরো একটু বেশি করুণা আছে। অনেকটা যেন মৃত্যুর মত—তীরথেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া—যারা দাঁড়িয়ে থাকে তারা আবার চোখ মুছে ফিরেযায়, যে ভেসেগেল সে অদৃশ্য হয়েগেল। জানি, এই গভীর বেদনাটুকু, যারা রইল এবং যে গেল উভয়েই ভুলে যাবে, হয়ত এতক্ষণে অনেকটা লুপ্তহয়ে গিয়েছে। বেদনাটুকু ক্ষণিক এবং বিস্মৃতিই চিরস্থায়ী কিন্তু ভেবে দেখ্‌তে গেলে এই বেদনাটুকুই বাস্তবিক সত্য—বিস্মৃতি সত্যি নয়। এক-একটা বিচ্ছেদ এবং একএকটা মৃত্যুর সময় মানুষ সহসা জান্‌তে পারে এই ব্যথাটা কি ভয়ঙ্কর সত্য। জান্‌তে পারে, যে মানুষ কেবল ভ্রমক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকে। কেউ থাকে না—এবং সেইটে মনে করলে মানুষ আরো ব্যাকুল হয়েওঠে। কেবল যে থাক্‌বনা তা নয়, কারো মনেও থাক্‌ব না। একেবারে আমাদের দেশের করুণ রাগিণী ছাড়া সমস্ত মানুষের পক্ষে আর কোন গান সম্ভবে না।

কটকাভিমুখ জলপথে।

আগষ্ট; ১৮৯১।

পরিধেয় বস্ত্র প্রতিদিন মলিন এবং অসহ্য হয়ে আস্‌চে অথচ কাপড়ের ব্যাগ্‌টি নেই, একথা চিত্তের মধ্যে অহর্নিশি জাগরূক থাক্‌লে ভদ্রলোকের আত্মসম্ভ্রম দূরহয়ে যায়। সেই ব্যাগ্‌টা থাক্‌লে যেরকম উন্নতমস্তকে সতেজে জনসমাজে বিচরণকরতে পারতুম এখন আর তা পারচিনে। কোনমতে নিজেকে প্রচ্ছন্ন এবং সাধারণের দৃষ্টি-অন্তরালে রাখ্‌তে ইচ্ছা করচে। এই কাপড় পরেই রাত্রে শয়নকরচি, এবং প্রাতঃকালে প্রকাশিতহচ্চি। ষ্টীমারে আবার সর্ব্বত্রই কয়লার গুঁড়ো এবং মলিনতা মধ্যাহ্নের অসহ্যউত্তাপে সর্ব্বশরীর বাষ্পাকুল হয়েউঠ্‌চে। তা ছাড়া ষ্টীমারে যে সুখে আছি সে কথা লিখে আর কি কর্‌ব। কতরকমের যে সঙ্গী জুটেচে তার আর সংখ্যা নেই। অঘোরবাবু বলে একটি কে এসেচে সে পৃথিবীর সমস্ত জড় এবং চেতন-পদার্থকে মামাশ্বশুরের ভাগ্‌নে বলে উল্লেখকরচে। আরএকটি সঙ্গীতকুশল লোক অর্দ্ধেক রাত্রে ভৈঁরো আলাপ করতেলাগ্‌ল। বিবিধ কারণে সেটা নিতান্ত অসাময়িক বলে বোধ হতেলাগ্‌ল। একটা সুঁড়ি খালের মধ্যে জাহাজ আট্‌কে কাল বিকেল থেকে আজ নটা পর্য্যন্ত যাপন করাগেছে। সমস্ত যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে ডেকের এক ধারে নির্জীব এবং বিমর্ষভাবে শুয়ে ছিলুম। খানসামাজিকে বলেছিলুম রাত্রে লুচি তৈরি করতে—সে কতকগুলি আকারপ্রকারহীন ভাজা ময়দা তৈরিকরে এনেছিল, তার সঙ্গে ছোকা কিংবা ভাজাভুজির উপলক্ষমাত্র ছিল না। দেখে আমি কিঞ্চিৎ বিস্ময় এবং আক্ষেপ প্রকাশ করলুম—সে ব্যক্তি তটস্থ হয়ে বল্লে, হম্‌ আবি বনা দেতা—রাত্রের আধিক্য দেখে আমি তাতে অসম্মত হয়ে যথাসাধ্য শুষ্ক লুচি খেয়ে আলো এবং লোকজনের মধ্যে শুয়েপড়লুম—শূন্যে মশা এবং চতুষ্পার্শ্বে আরসোলা সঞ্চরণকরচে—ঠিক পায়ের কাছেই আরএক ব্যক্তি শয়নকরেচে, তার গায়ে মাঝেমাঝে আমার পা ঠেক্‌চে, চারটে পাঁচটা নাক অবিরাম ডাক্‌চে, মশকদষ্ট বীতনিদ্র হতভাগ্যগণ তামাক

টান্‌চে—এবং এরি মধ্যে ভৈঁরো রাগিণী। রাত যখন সাড়ে তিনটে তখন কতকগুলি ব্যস্তবাগীশ লোক পরস্পরকে জাগ্রত হতে উৎসাহিত করতে লাগ্‌ল। আমি নিতান্ত কাতরভাবে শয্যা ত্যাগকরে আমার চৌকিটাতে ঠেস দিয়ে প্রভাতের প্রতীক্ষায় বসে রইলুম। একটা বিচিত্র অভিশাপের মত রাতটা কেটেগেল। একটা খালাসীর কাছে সংবাদ পেলুম ষ্টীমার এমনি আট্‌কে গেছে আজ সমস্ত দিন নড়বে না। একজন কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসাকরলুম কলকাতামুখী কি কোন জাহাজ ইতিমধ্যে পাওয়া যাবে, সে হেসে বল্লে এই জাহাজই গম্যস্থানে পৌঁছে পুনশ্চ কলকাতায় ফিরবে অতএব ইচ্ছে করলে এই জাহাজে করেই ফিরতে পারি। সৌভাগ্যক্রমে অনেক টানাটানির পর প্রায় দশটার কাছাকাছি জাহাজ চল্‌তে আরম্ভকরলে।

—:—

৩২

চাঁদনি চক্, কটক।

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯১।

——বাবু খুব মোটাসোটা বর্দ্ধিষ্ণু চেহারার লোক—তাঁর ভাবখানা খুবএকজন লম্বাচৌড়া কৃষ্ণবিষ্ণুর মত। বয়স যথেষ্ট হয়েছে—একখানি কোঁচানো চাদর কাঁধে, ফিট্‌ফাট্ সাজ, গায়ে এসেন্সের গন্ধ, দু-থাক চিবুক, প্রমাণসই গোঁফ, কপাল গড়ানে, বড়বড় ড্যাবাচোখ আত্মম্ভরিতায় অর্দ্ধনিমীলিত, কথা কবার সময় চোখের তারা আকাশের দিকে ওঠে—জলদগম্ভীরস্বরে অতি মৃদুমন্দ সুস্থ সহাস্যভাবে কথা কন,—সময় যেন অনুগত ভৃত্যের মত তাঁর অবসর অপেক্ষায় এক পাশে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে—কোন বিষয়ে তিলমাত্র তাড়া নেই। চোখ দুটো উল্টে আমাকে একবার জিজ্ঞাসাকরলেন "জ্যোতি এখন কোথায় আছে?" প্রশ্নকর্ত্তার অবিচলিত গাম্ভীর্য্যে আমার অন্তঃকরণ সসম্ভ্রমে শশব্যস্ত হয়েউঠ্‌ল—আমি মৃদু বিনীতভাবে আমার দাদার রাজধানীতে অবস্থান জ্ঞাপনকরলুম। তিনি বল্লেন "বীরেন্দ্রের সঙ্গে আমি একসঙ্গে পড়েচি।" শুনে আমার চিত্ত আরো অভিভূত হয়েপড়্‌ল। এর উপরে যখন তিনি—কারো পরামর্শের অপেক্ষা না রেখে অকস্মাৎ অসময়ে এখানে আসাসম্বন্ধে আমার বালকোচিত অবিবেচনার উল্লেখকরলেন তখন আমি কি রকম ম্লান অপ্রতিভ হয়ে গেলুম সে অনুমানকরা শক্ত হবে না। আমি কেবলি নতমুখে বারবার বল্‌তেলাগ্‌লুম—আমি প্রকৃত অবস্থা কিছুই জান্‌তুম না—আর কখনো আসিনি, এই প্রথম আস্‌চি। তার থেকে তর্ক উঠ্‌ল "জ্যোতি কখন্ এসেছিল"—সময়নির্ণয়সম্বন্ধে বরদার সঙ্গে তাঁর ঘোর অনৈক্য হল। তিনি ৭৪।৭৫ বলেন, বরদা বলেন তার পূর্ব্বে। এর থেকেই বুঝতে পারা যাবে ইতিহাস লেখা কত শক্ত। তাই মনে করচি এইবার থেকে আমার চিঠিতে তারিখ দিতেহবে।

৬৩

তিরণ,

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯১।

বালিয়ার ঘাট্‌টি বেশ দেখ্‌তে। দুই ধারে বেশ বড়বড় গাছ—সবসুদ্ধ খালটা দেখে সেই পুণার ছোট নদীটি মনে পড়ে।

আমি ভালকরে ভেবেদেখ্‌লুম এই খালটাকে যদি নদী বলে জান্‌তুম তাহলে ঢের বেশী ভাললাগ্‌ত। দুই তীরে বড় নারকেল গাছ, আমগাছ এবং নানাজাতীয় ছায়াতরু, ঢালু পরিষ্কার তট সুন্দর সবুজ ঘাস এবং অসংখ্য পুষ্পিত লজ্জাবতী লতায় আচ্ছন্ন; কোথাও বা কেয়াবন; যেখানে গাছগুলি একটু বিরল সেইখানথেকে দেখাযায় খালের উঁচু পাড়ের নীচে একটা অপার মাঠ ধূ ধূ করচে, বর্ষাকালে শস্যক্ষেত্র এমনি গাঢ় সবুজ হয়েচে যে দুটি চোখ যেন একেবারে ডুবেযায়—মাঝেমাঝে খেজুর এবং নারকেল গাছের মণ্ডলীর মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম;—এই সমস্ত দৃশ্য বর্ষাকালের স্নিগ্ধ মেঘাচ্ছন্ন আনত আকাশের নীচে শ্যামচ্ছায়াময় হয়ে আছে। খালটি তার দুই পরিষ্কার সবুজ শষ্পতটের মাঝখানদিয়ে সুন্দরভঙ্গীতে বেঁকেবেঁকে চলেগেছে। মৃদুমৃদু স্রোত; যেখানে খুব সঙ্কীর্ণ হয়েএসেছে সেখানে জলের কিনারার কাছেকাছে কুমুদবন এবং বড়বড় ঘাস দেখাদিয়েচে। কিন্তু তবু মনের মধ্যে একটা আক্ষেপ থেকেযায় এটা একটা কাটা খাল বই নয়—এর জলকলধ্বনির মধ্যে অনাদি প্রাচীনত্ব নেই, এ কোনো দূর দুর্গম জনহীন পর্ব্বতগুহার রহস্য জানে না; কোনো একটি প্রাচীন স্ত্রী-নাম ধারণকরে অতি অজ্ঞাতকালথেকে দুইতীরের গ্রামগুলিকে স্তন্যদানকরে আসেনি—এ কখনো কুলুকুলু করে বল্‌তেপারে না—

মেন্ মে কাম্ অ্যাণ্ড মেন্ মে গো,
বাট্, আই গো অন্ ফর্ এভার।

প্রাচীনকালের বড়বড় দীঘীও এরচেয়ে ঢের বেশি গৌরবলাভকরেছে। এরথেকেই বেশ বোঝাযায় একটা প্রাচীন বড় বংশ অনেক বিষয়ে হীন হলেও কেন এত সমাদর

লাভকরে। তাদের উপরে যেন বহুকালের একটা সম্পদশ্রীর আভা থাকে। একজন সোনার ব্যাপারী হঠাৎ বড়মানুষ হয়েউঠ্লে অনেক সোনা পায় কিন্তু সেই সোনার লাবণ্যটুকু শীঘ্র পায় না। যাহোক্ আর একশো বৎসর পরে যখন এই তীরের গাছ-গুলো আরো অনেক বড় হয়েউঠ্বে, তক্‌তকে শাদা মাইলষ্টোন্‌গুলো অনেকটা ক্ষয়ে গিয়ে শৈবালাচ্ছন্ন ম্লান হয়েআসবে, লকের উপরে খোদিত 1871 তারিখ যখন অনেক দূরবর্ত্তী বলে মনে হবে তখন যদি আমি আমার প্রপৌত্র জন্মলাভকরে এই খালের মধ্যে বোট নিয়ে আমাদের পাণ্ডুয়া জমিদারী-তদন্ত করতে যেতেপারি তখন আমার মনের মধ্যে অনেকটা ভিন্নরকম ভাবোদয় হতেপারে সন্দেহ নেই। কিন্তু হায় আমার প্রপৌত্র! তার ভাগ্যে কি আছে কে জানে! হয়ত একটা অজ্ঞাত অখ্যাত কেরানি-গিরি। ঠাকুরবংশের একটা ছিন্ন টুক্‌রো, বহুদূরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে একটা মৃত উল্কাখণ্ডের মত হয়ত জ্যোতিহীন নির্ব্বাপিত। কিন্তু আমার উপস্থিত দুর্দ্দশা এত আছে যে আমার প্রপৌত্রের জন্যে বিলাপকরবার কোন দরকার নেই।

চারটের সময় তারপুরে পৌঁছনগেল। এইখানে আমাদের পাল্কীযাত্রা আরম্ভ হল। মনেকরলুম দুক্রোশ পথ, সন্ধ্যা আটটার মধ্যেই আমাদের কুঠিতে পৌঁছতে পারব। মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম, মাইলের পর মাইল কেটেযাচ্চে, ছ ক্রোশ পথ আর ফুরোয় না। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় বেহারাদের জিজ্ঞাসাকরলুম আর কতদূর, তারা বল্লে, আর বেশি নেই, তিন ক্রোশের কিছু উপর বাকি আছে। শুনে পাল্কীর মধ্যে একটু নড়েচড়ে বস্‌লুম। পাল্কীতে আমার আধখানা বই ধরে না — কোমর টন্ টন্ করচে, পা ঝিন্ ঝিন্ করচে, মাথা ঠক্ ঠক্ করচে—যদি নিজেকে তিন চার ভাঁজকরে মুড়েরাখবার কোন উপায় থাকত তা হলেই এই পাল্কীতে কিছু সুবিধে হতেপারত। রাস্তা অতি ভয়ানক। সর্ব্বত্রই এক হাঁটু কাদা—একএক জায়গায় পিছলের ভয়ে বেহারারা অতি সাবধানে একএক পা করে পা ফেল্‌চে—তিনচারবার তাদের পা হড়্‌কে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি সামলেনিলে। মাঝে মাঝে রাস্তা নেই—ধানের ক্ষেতে অনেকখানিকরে জল দাঁড়িয়েছে—তারি উপরদিয়ে ছপ্ ছপ্ শব্দকরে এগোচ্চি। মেঘে রাত খুব অন্ধকার হয়েএসেচে, টিপ্‌টিপ্‌করে বৃষ্টি পড়চে, তৈলা-ভাবে মশালটা মাঝেমাঝে নিবেযাচ্চে, আবার অনেক ফুঁ দিয়েদিয়ে জ্বালাতেহচ্চে, বেহারারা সেই আলোকের অভাব নিয়ে ভারি বকাবকি বাধিয়েদিয়েচে। এমনি করে খানিকদূরে এলে পর বরকন্দাজ যোড়হাতে নিবেদনকরলে, একটা নদী এসেছে

এইখানে পাল্কী নৌকোকরে পারকরতে হবে কিন্তু এখনো নৌকো এসে পৌঁছয়নি, অবিলম্বে এল বলে—অতএব খানিকক্ষণ এইখানে পাল্কী রাখতে হবে। পাল্কী রাখলে। তারপরে নৌকো আর কিছুতে এসেপৌঁছয়না। আস্তেআস্তে মশালটা নিবে গেল। সেই অন্ধকার নদীতীরে বরকন্দাজগুলো ভাঙাগলায় উর্দ্ধশ্বাসে নৌকোওয়ালাকে ডাক্‌তে-লাগ্‌ল—নদীর পরপারথেকে তার প্রনিধ্বনি ফিরে আস্‌তেলাগল কিন্তু কোনো নৌকোওয়ালা সাড়াদিলে না। "মুকুন্দো—ও-ও-ও" "বালকৃষ্ণ—অ-অ-অ" "নীলকণ্ঠ—অ-অ-অ"। এমন কাতরস্বরে আহ্বান করলে গোলোকধাম থেকে মুকুন্দ এবং কৈলাস-শিখর থেকে নীলকণ্ঠ নেমে আস্‌তেন—কিন্তু কর্ণধার কর্ণরোধকরে অবিচলিতভাবে নিজ নিকেতনে বিশ্রাম করতেলাগ্‌ল। নির্জ্জন নদীতীরে একটি কুঁড়েঘরমাত্রও নেই; কেবল পথপার্শ্বে চালকহীন বাহনহীন একটি শূন্য গরুর গাড়ি পড়েরয়েছে—আমাদের বেহারাগুলো তারি উপর চেপেবসে বিজাতীয় ভাষায় কলরব করতেলাগ্‌ল। মক্‌-মক্‌শব্দে ব্যাং ডাক্‌চে এবং ঝিঁঝির ডাকে সমস্ত রাত্রি পরিপূর্ণ হয়েউঠেচে। আমি মনেকরলুম এইখানেই পাল্কীর মধ্যে বেঁকেচুরে দুমড়ে আজ রাতটা কাটাতেহবে—মুকুন্দ এবং নীলকণ্ঠ বোধহয় কাল প্রভাতে এসে উপস্থিতহতেও পারে—মনেমনে গাইতেলাগ্‌লুম—ওগো।

ওগো, যদি নিশিশেষে আসে হেসে হেসে
মোর হাসি আর রবে কি!
এই, জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন
আমারে হেরিয়া কবে কি!

যাই হোক্‌না কেন, যদি কয় ত উড়ে ভাষায় কবে, আমি কিছুই বুঝ্‌তেপারবনা কিন্তু মুখে যে আমার হাসি থাক্‌বে না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অনেকক্ষণ এই ভাবে কেটেগেল। এমন সময় হুঁই হাঁই হুঁই হাঁই শব্দে বরদার পাল্কী এসে উপস্থিতহল। বরদা নৌকো আসবার সম্ভাবনা না দেখে হুকুম দিলেন পাল্কী মাথায় করে নদী পার করতেহবে। শুনে বেহারারা অনেক ইতস্তত করতেলাগ্‌ল এবং আমার মনেও দয়া এবং কিঞ্চিৎ দ্বিধা উপস্থিত হতেলাগ্‌ল। যাহোক্ অনেক বাকবিতণ্ডার পর তারা হরিনাম উচ্চারণ করতেকরতে পাল্কী মাথায় করে নদীর মধ্যে নাবলে। বহুকষ্টে নদী পারহল। তখন রাত সাড়ে দশটা। আমি কোনরকম গুটিসুটি মেরে শুয়ে

পড়লুম। বেশ খানিকটা নিদ্রাকর্ষণ হয়েচে এমন সময়ে হঠাৎ একটা বেহারার পা পিছলে গিয়ে পাল্কীটা খুব একটা নাড়া পেলে---অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে বুকের ভিতর ভারি ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগ্‌ল। তারপর থেকে অর্দ্ধঘুম অর্দ্ধজাগরণে রাত্তির দুপুরের সময় আমাদের পাণ্ডুয়ার কুঠিতে এসে উত্তীর্ণ হলুম।

---*---

তিরণ,

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯১।

অনেকদিন পরে কাল মেঘবৃষ্টি কেটে শরতের সোনার রোদ্দুর উঠেছিল। পৃথিবীতে যে রোদ্দুর আছে সে কথা যেন একেবারে ভুলেগিয়েছিলুম ; হঠাৎ যখন কাল দশটাএগারোটার পর রোদ্দুর ভেঙেপড়ল তখন যেন একটা নতুন জিনিষ দেখে মনে অপূর্ব্ব বিস্ময়ের উদয়হল। দিনটি বড় চমৎকার হয়েছিল। আমি দুপুরবেলায় স্নানাহারের পর বারান্দার সাম্‌নে একটি আরামকেদারার উপরে পা ছড়িয়েদিয়ে অর্দ্ধশয়ানঅবস্থায় জাগ্রৎস্বপ্নে নিযুক্ত ছিলুম। আমার চোখের সাম্‌নে আমাদের বাড়ির কম্পাউণ্ডের কতকগুলি নারকেল গাছ,—তার উদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলি শস্যক্ষেত্র, শস্যক্ষেত্রের একেবারে প্রান্তভাগে গাছপালার একটুখানি ঝাপ্‌সা নীল আভাসমাত্র। ঘুঘু ডাকচে এবং মাঝেমাঝে গোরুর গলার নূপুর শোনাযাচ্চে। কাঠবিড়ালী একবার ল্যাজের উপর ভর দিয়ে বসে' মাথা তুলে চকিতের মধ্যে অদৃশ্য হচ্চে। খুব একটা নিঃঝুম নিস্তব্ধ নিরালা ভাব। বাতাস অবাধে হু হু করে বয়ে আস্‌চে—নারকেল গাছের পাতা ঝর্‌ ঝর্‌ শব্দকরে কাঁপচে। দুচারজন চাষা মাঠের একজায়গায় জট্‌লাকরে ধানের ছোটছোট চারা উপ্‌ড়েনিয়ে আঁটি করেকরে বাঁধচে। কাজকর্ম্মের মধ্যে এইটুকু কেবল দেখাযাচ্চে।

১৫

শিলাইদহ,

১লা অক্টোবর, ১৮৯১।

বেলায় উঠে দেখ্‌লুম চমৎকার রোদ্দুর উঠেছে এবং শরতের পরিপূর্ণ নদীব জল তল্‌ তল্‌ থৈ থৈ করচে। নদীর জল এবং তীর প্রায় সমতল—ধানের ক্ষেত সুন্দর সবুজ এবং গ্রামের গাছপালাগুলি বর্ষাবসানে সতেজ এবং নিবিড় হয়েউঠেছে। এমন সুন্দর লাগ্‌ল সে আর কি বল্‌ব। দুপুরবেলা খুব এক পস্‌লা বৃষ্টি হয়েগেল। তার পরে বিকেলে পদ্মারধারে আমাদের নারকেল বনের মধ্যে সূর্য্যাস্ত হ'ল। আমি নদীর ধারে উঠে আস্তেআস্তে বেড়াচ্ছিলুম। আমার সাম্‌নের দিকে দুরে আমবাগানে সন্ধ্যার ছায়া পড়েআস্‌চে এবং আমার ফেরবার মুখে নাবকেল গাছগুলির পিছনে আকাশ সোনায় সোনালী হয়েউঠেছে। পৃথিবী যে কি আশ্চর্য্য সুন্দরী এবং কি প্রশস্তপ্রাণে এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণতা এইখানে না এলে মনেপড়ে না। যখন সন্ধ্যাবেলা বোটের উপর চুপকরে বসেথাকি, জল স্তব্ধ থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে, এবং আকাশের প্রান্তে সূর্য্যাস্তের দীপ্তি ক্রমেক্রমে ম্লান হয়েযায়, তখন আমার সর্ব্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কি একটা বৃহৎ উদার বাক্য-হীন স্পর্শ অনুভবকরি! কি শান্তি, কি স্নেহ, কি মহত্ত্ব, কি অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ! এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্রথেকে ঐ নির্জ্জন নক্ষত্রলোকপর্য্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায়কানায় পরিপূর্ণ হয়েওঠে; আমি তার মধ্যে অবগাহনকরে অসীম মানসলোকে একলা বসেথাকি, কেবল মৌলবীটা পাশে দাঁড়িয়ে অবিশ্রাম বক্‌ বক্‌ করে আমাকে ব্যথিত করেতোলে।

———•———

৬৮

শিলাইদহ,

অক্টোবর, ১৮৯১।

আজ দিনটি বেশ হয়েছে। ঘাটে দুটিএকটি করে নৌকো লাগ্‌চে—বিদেশথেকে প্রবাসীরা পুজোর ছুটিতে পোঁট্‌লাপুঁট্‌লি বাক্স ধামা বোঝাইকরে নানা উপহারসামগ্রী নিয়ে সম্বৎসরপরে বাড়ি ফিরেআস্‌চে। দেখ্‌লুম একটি বাবু ঘাটের কাছাকাছি নৌকো আস্‌তেই পুরোণো কাপড় বদ্‌লে একটি নূতন কোঁচানো ধুতি পরলে, জামার উপর শাদা রেসমের একখানি চাযনাকোট্‌ গায়ে দিলে, আরএকখানি পাকানো চাদর বহুযত্নে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে ছাতা ঘাড়েকরে গ্রামের অভিমুখে চল্ল। ধানের ক্ষেত থরথরকরে কাঁপ্‌চে—আকাশে শাদাশাদা মেঘের স্তূপ—তারি উপর আম এবং নারকেল গাছের মাথা উঠেচে—নারকেলের পাতা বাতাসে ঝুর্‌ঝুর্‌করচে—চরের উপর দুটোএকটাকরে কাশ ফুটেউঠ্‌বার উপক্রমকরেচে—সবসুদ্ধ বেশএকটা সুখের দৃশ্য। বিদেশথেকে যে লোকটি এইমাত্র গ্রামে ফিরেএল, তার মনের ভাব, তার ঘরের লোকদের মিলনের আগ্রহ, এবং শরৎকালের এই আকাশ, এই পৃথিবী, সকাল বেলাকার এই ঝিরুঝিরে বাতাস, এবং গাছপালা তৃণগুল্ম নদীর তরঙ্গসকলের ভিতর-কার একটি অবিশ্রাম সঘন কম্পন, সমস্ত মিশিয়ে বাতায়নবর্ত্তী এই একক যুবকটিকে সুখেদুঃখে একরকম অভিভূতকরে ফেল্‌ছিল। পৃথিবীতে জান্‌লার ধারে এক্‌লা বসে চোখ মেলে' দেখ্‌লেই মনে নতুন সাধ জন্মায়—নতুন সাধ ঠিক নয়, পুরোণো সাধ নানা নতুন মূর্ত্তি ধারণকরতে আরম্ভকরে। পর্শুদিন অমনি বোটের জান্‌লার কাছে চুপ করে বসেআছি—একটা জেলেডিঙিতে একজন মাঝি গান গাইতেগাইতে চলে গেল—খুব যে সুস্বর তা নয়। হঠাৎ মনে পড়েগেল বহুকাল হল ছেলেবেলায় বোটেকরে পদ্মায় আস্‌ছিলুম—একদিন রাত্তির প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙেযেতেই বোটের জান্‌লাটা তুলেধরে মুখবাড়িয়ে দেখ্‌লুম নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না হয়েছে, একটি ছোট্ট ডিঙিতে একজন ছোক্‌রা একলা দাঁড়বেয়ে চলেছে, এমনি মিষ্টি

গলায় গানধরেছে—গান তার পূর্ব্বে তেমন মিষ্টি কথনো শুনিনি। হঠাৎ মনে হল, আবার যদি জীবনটা ঠিক সেইদিনথেকে ফিরেপাই। আরএকবার পরীক্ষাকরে দেখাযায়—এবার তাকে আর শুষ্ক অপরিতৃপ্তকরে ফেলেরেখে দিইনে—কবির গান গলায় নিয়ে একটি ছিপ্‌ছিপে ডিঙিতে জোয়ারের বেলায় পৃথিবীতে ভেসেপড়ি, গান গাই এবং বশ করি এবং দেখেআসি পৃথিবীতে কোথায় কি আছে; আপনাকেও একবার জানান্ দিই, অন্যকেও একবার জানি; জীবনে যৌবনে উচ্ছ্বসিতহয়ে বাতাসের মত একবার হু হু করে বেড়িয়েআসি, তারপরে ঘরে ফিরেএসে পরিপূর্ণ প্রফুল্ল বার্দ্ধক্যটা কবির মত কাটাই। খুব যে একটা উঁচু আইডিয়াল তা নয়। জগতের হিত করা এর চেয়ে ঢের বেশি বড় আইডিয়াল হতেপারে—কিন্তু আমি সবসুদ্ধ যেরকম লোক আমার ওটা মনেও উদয় হয় না। উপবাস করে, আকাশের দিকে তাকিয়ে অনিদ্র থেকে সর্ব্বদা মনেমনে বিতর্ককরে, পৃথিবীকে এবং মনুষ্যহৃদয়কে কথায়কথায় বঞ্চিতকরে স্বেচ্ছারচিত দুর্ভিক্ষে এই দুর্লভ জীবন ত্যাগকরতে চাইনে। পৃথিবী যে সৃষ্টিকর্ত্তার একটা ফাঁকি এবং সয়তানের একটা ফাঁদ তা না মনেকরে এ'কে বিশ্বাসকরে, ভালবেসে ভালবাসাপেয়ে মানুষের মত বেঁচে এবং মানুষের মত মরেগেলেই যথেষ্ট;—দেবতার মত হাওয়া হয়েযাবার চেষ্টাকরা আমার কাজ নয়।

—*—

৩৭

শিলাইদহ,

অক্টোবর, ১৮৯১। ২৯ শে আশ্বিন।

কাল সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে একবার পশ্চিমদিকের সোনার সূর্য্যাস্ত এবং এক-বার পূবদিকের রুপোর চন্দ্রোদয়ের দিকে ফিরে গোঁফে তা দিতেদিতে পায়চারীকরে বেড়াচ্ছিলুম। রুগ্ন ছেলের দিকে মা যেমনকরে তাকায় প্রকৃতি সেইরকম সুগভীর স্তব্ধ এবং স্নিগ্ধ বিষাদের সঙ্গে আমার মুখের দিকে চেয়েছিল—নদীর জল আকাশের মত স্থির, এবং আমাদের দুটি বাঁধা নৌকো জলচরপাখীর মত মুখের উপর পাখা ঝেঁপে স্থিরভাবে ঘুমিয়েআছে এমন সময় মৌলবী এসে আমাকে ভীতকণ্ঠে চুপি চুপি খবর দিলে "কলকাতার ভজিয়া আয়ছে।" এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কতরকম অসম্ভব আশঙ্কা যে মনে উদয় হল তা আর বলতেপারিনে। যাহোক মনের চাঞ্চল্য দমনকরে গম্ভীর স্থিরভাবে আমার রাজচৌকিতে এসে বসে ভজিয়াকে ডেকেপাঠালুম। ভজিয়া যখন ঘরে প্রবেশকরেই কাঁদুনির সুর ধরে আমার পা জড়িয়েধরলে তখনি বুঝলুম দুর্ঘটনা যদি কারো হয়েথাকে ত সে ভজিয়ার। তার পরে তার সেই বাঁকা বাঙলার সঙ্গে নাকের সুর এবং চোখের জল মিশিয়ে বিস্তর অসংলগ্ন ঘটনা বলেযেতে লাগ্‌ল। বহু কষ্টে তার যা সার সংগ্রহকরা গেল সেটি হচ্চে এই—ভজিয়া এবং ভজিয়ার মায়ে প্রায়ই ঝগড়া বেধেথাকে—কিছুই আশ্চর্য্য নয়—কারণ দুজনেই আমাদের পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তের বীরাঙ্গনা, কেউ হৃদয়ের কোমলতার জন্যে প্রসিদ্ধ নয়। এর মধ্যে একদিন সন্ধ্যাবেলায় মায়ে ঝিয়ে মুখোমুখি থেকে হাতাহাতি বেধেগিয়েছিল—স্নেহালাপ থেকে যে আলিঙ্গন তা নয়, গালাগালি থেকে মারামারি। সেই বাহুযুদ্ধে তার মায়েরই পতন হয়—এবং সে কিছু গুরুতর আহতও হয়েছিল। ভজিয়া বলে, তার মা তাকে একটা কাঁসার বাটি নিয়ে মস্তক লক্ষ্যকরে তাড়াকরে, সে আত্মরক্ষার চেষ্টাকরাতে দৈবাৎ তার বালাটা তার মায়ের মাথায় না কোথায় লেগে রক্তপাত হয়। যাহোক্ এইসব

ব্যাপারে সেই মুহূর্ত্তেই তাকে তেতালা থেকে নিম্নলোকে নির্ব্বাসিতকরে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটা তিনচার দিন হয়েচে কিন্তু আমি কোন খবরই পাইনি—মাথার উপরে একেবারে হঠাৎ বিনা নোটিসে ভজিয়াঘাত।

—*—

শিলাইদহ,

অক্টোবর, ১৮৯১। ২রা কার্ত্তিক।

আমার বোধহয় কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে এলেই মানুষের নিজের স্থায়িত্ব এবং মহত্ত্বের উপর বিশ্বাস অনেকটা হ্রাস হয়েআসে। এখানে মানুষ কম এবং পৃথিবীটাই বেশি—চারিদিকে এমন সব জিনিষ দেখাযায় যা আজ তৈরিকরে কাল মেরামতকরে পর্শুদিন বিক্রিকরে ফেলবার নয়, যা মানুষের জন্মমৃত্যু ক্রিয়াকলাপের মধ্যে চিরদিন অটলভাবে দাঁড়িয়েআছে, প্রতিদিন সমানভাবে যাতায়াতকরচে এবং চিরকাল অবিশ্রান্তভাবে প্রবাহিতহচ্চে। পাড়াগাঁয়ে এলে আমি মানুষকে স্বতন্ত্র মানুষভাবে দেখিনে। যেমন নানা দেশদিয়ে নদী চলেচে, মানুষের স্রোতও তেম্‌নি কলরবসহকারে গাছপালা গ্রাম নগরের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চিরকালধরে চলেচে—এ আর ফুরোয় না। মেন্ মে কাম্ এণ্ড্ মেন্ মে গো, বাট্, আই গো অন্ ফর্ এভার্—কথাটা ঠিক সঙ্গত নয়। মানুষও নানা শাখাপ্রশাখা নিয়ে নদীর মতই চলেচে—তার একপ্রান্ত জন্মশিখরে আরএক প্রান্ত মরণসাগরে, দুই দিকে দুই অন্ধকার রহস্য, মাঝখানে বিচিত্র লীলা এবং কর্ম্ম এবং কলধ্বনি—কোনকালে এর আর শেষ নেই। ওই শোন মাঠে চাষা গান গাচ্চে, জেলেডিঙি ভেসেচলেচে, বেলা যাচ্চে, রৌদ্র ক্রমেই বেড়েউঠ্‌চে—ঘাটে কেউ স্নানকরচে কেউ জল নিয়ে যাচ্চে—এমনিকরে এই শান্তিময়ী নদীর দুই তীরে গ্রামের মধ্যে গাছের ছায়ায় শতশত বৎসর গুন্‌গুন্ শব্দ করতেকরতে ছুটে চলেচে—এবং সকলের মধ্যে থেকে একটা করুণধ্বনি জেগেউঠ্‌চে, আই গো অন্ ফর্ এভার্। দুপুরবেলার নিস্তব্ধতার মধ্যে যখন কোন রাখাল দূরথেকে উর্দ্ধকণ্ঠে তার সঙ্গীকে ডাকদেয়, এবং একটা নৌকো ছপ্‌ছপ্ শব্দকরে ঘরের দিকে ফিরেযায়, এবং মেয়েরা ঘড়াদিয়ে জল ঠেলেদেয় তার ছল্ ছল্ শব্দ ওঠে, তার সঙ্গে মধ্যাহ্নপ্রকৃতির নানারকম অনির্দ্দিষ্ট ধ্বনি—দুই একটা পাখীর ডাক, মৌমাছির গুন্ গুন্, বাতাসে বোটটা আস্তেআস্তে বেঁকে যেতে থাকে তারই একরকম কাতর সুর—সবসুদ্ধ এমন

একটা করুণ ঘুমপাড়ানী গান—যেন মা সমস্ত বেলা বসেবসে তার ব্যথিত ছেলেকে ঘুমপাড়িয়ে ভুলিয়েরাখ্‌বার চেষ্টাকরচে—বল্‌চে, আর ভাবিস্‌নে, আর কাঁদিস্‌নে, আর কাড়াকাড়ি মারামারি করিস্‌নে, আর তর্কবিতর্ক রাখ্‌—একটুখানি ভুলেথাক্‌ একটুখানি ঘুমো ; বলে তপ্ত কপালে আস্তে আস্তে করাঘাতকরচে।

———•———

শিলাইদহ,

সোমবার, ৩রা কার্ত্তিক।

কোজাগর পূর্ণিমার দিন, নদীর ধারেধারে আস্তেআস্তে বেড়াচ্ছিলুম—আর, মনের মধ্যে স্বগত কথোপকথন চল্‌ছিল—ঠিক "কথোপকথন" বলাযায় না—বোধ হয় আমি একলাই বকেযাচ্ছিলুম আর আমার সেই কাল্পনিক সঙ্গীটি অগত্যা চুপচাপকরে শুনেযাচ্ছিল, নিজের হয়ে একটা জবাবদেওয়াও সে বেচারার যো ছিল না—আমি তার মুখে যদি একটা নিতান্ত অসঙ্গত কথাও বসিয়েদিতুম তাহলেও তার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু কি চমৎকার হয়েছিল কি আর বলব! কতবার বলেছি, কিন্তু সম্পূর্ণ কিছুতেই বলা যায় না। নদীতে একটি রেখামাত্র ছিল না—ও-ই সেই চরের পরপারে যেখানে পদ্মার জলের শেষপ্রান্ত দেখাযাচ্চে সেখানথেকে আর এপর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত জ্যোৎস্নারেখা ঝিক্‌ঝিক্‌করচে—একটি লোক নেই একটি নৌকো নেই, ওপারের নতুন চরে একটি গাছ নেই একটি তৃণ নেই—মনেহয় যেন একটি উজাড় পৃথিবীর উপরে একটি উদাসীন চাঁদের উদয়হচ্চে—জনশূন্য জগতের মাঝখানদিয়ে একটি লক্ষ্যহীন নদী বহেচলেছে, মস্তএকটা পুরাতন গল্প এই পরিত্যক্তপৃথিবীর উপরে শেষহয়ে গেছে, আজ সেই সব রাজা রাজকন্যা পাত্র মিত্র স্বর্ণপুরী কিছুই নেই, কেবল সেই গল্পের "তেপান্তরের মাঠ" এবং "সাত সমুদ্র তেরো নদী" ম্লান জ্যোৎস্নায় ধূ ধূ করচে।

আমি যেন সেই মুমূর্ষু পৃথিবীর একটিমাত্র নাড়ীর মত আস্তেআস্তে চল্‌ছিলুম। আরসকলে ছিল আরএক পারে, জীবনের পারে—সেখানে এই বৃটিশ গবর্মেণ্ট্‌ এবং উনবিংশ শতাব্দী এবং চা এবং চুরোট। কতদিনথেকে কত লোক আমার মত এই-রকম একলা দাঁড়িয়ে অনুভবকরেচে এবং কত কবি প্রকাশকরতে চেষ্টাকরেচে, কিন্তু হে অনির্ব্বচনীয়, এ কি, এ কিসের জন্যে, এ কিসের উদ্বেগ, এই নিরুদ্দেশ নিরাকুলতার নাম কি, অর্থ কি—হৃদয়ের ঠিক মাঝখানটা বিদীর্ণকরে কবে সেই সুর বেরোবে যার দ্বারা এর সঙ্গীত ঠিক ব্যক্ত হবে!

৪০

শিলাইদহ,

রবিবার, ৪ঠা জানুয়ারী,

১৮৯২।

কিছু আগেই পাবনাথেকে এ— তার মেম্ এবং কচিকাচা নিয়েএসে উপস্থিত। মেম্ চা খায়, আমার চা নেই—মেম্ ছেলেবেলাথেকে ডাল চক্ষে দেখ্‌তেপারে না, আমি অন্য খাদ্যের অভাবে ডাল তৈরিকরতে দিয়েছি, মেম্ ইয়ার্স্ এণ্ড্ টু ইয়ার্স্ এণ্ড মাছ ছোঁয় না, আমি মাগুর মাছের ঝোল রাঁধিয়ে নিশ্চিন্তহয়ে আছি। কি ভাগ্যি কান্ট্রি সুইট্স্ ভালবাসে তাই একটা বহুকালের শক্ত শুক্‌নো সন্দেশ বহুকষ্টে কাঁটা দিয়ে ভেঙে খেলে। এক বাক্স বিস্কুট গতবারের রসদের অবশেষস্বরূপে ছিল সেটা কাজেলাগ্‌বে। আমি আবার একটা মস্ত গলদকরেছি—আমি সাহেবকে বলেছি, তোমার মেম্ চা খায় কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার চা নেই, কোকো আছে। সে বল্লে আমার মেম্ চায়ের চেয়ে কোকো বেশি ভালবাসে। আমি আলমারি ঘেঁটেদেখি কোকো নেই—সবগুলোই কলকাতায় ফিরেগেছে। আবার তাকে বল্‌তেহবে চা-ও নেই কোকোও নেই পদ্মার জল আর চায়ের কাৎলি আছে—দেখি কি রকম মুখের ভাব হয়। সাহেবের ছেলে দুটো এমন দুরন্ত, এবং দুষ্টু দেখ্‌তে, সে আর কি বল্‌ব। মাঝে মাঝে সাহেব মেমেতে খুব গুরুতর ঝগড়া হয়েযাচ্চে আমি এ বোটথেকে শুন্‌তে পাচ্চি। ছেলেদের কান্না, চাকরবাকরদের চেঁচামেচি, এবং দম্পতির তর্কবিতর্কের জ্বালায় অস্থিরহয়ে আছি। আজ আর কোন কাজকর্ম্ম লেখাপড়ার সুবিধে দেখ্‌চিনে। মেমটা তার ছেলেকে ধমকাচ্চে "What a little শুয়ার 'you are!" দেখত, আমার ঘাড়ে এসব উপদ্রব কেন?

৪১.

শিলাইদহ,

সোমবার, ৬ই জানুয়ারী,

১৮৯২।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গরমের সময় যখন বোটে ছিলুম, এই সময়টা বোটের জান্‌লার কাছে বসে আলো নিবিয়েদিয়ে চুপচাপ পড়েথাক্‌তুম, নদীর শব্দে, সন্ধ্যার বাতাসে, নক্ষত্রভরা আকাশের নিস্তব্ধতায় মনের সমস্ত কল্পনা মধুর আকার ধরে আমাকে ঘিরে বস্‌ত, অনেক রাতপর্য্যন্ত একপ্রকার নিবিড় নির্জ্জন আনন্দে কেটেযেত। শীতকালের সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত প্রকৃতিকে বাইরে ফেলে জান্‌লাদরজা বন্ধ করে বোটের এই ক্ষুদ্র কাষ্ঠময় গহ্বরের মধ্যে একটি বাতি জ্বেলে মনটাকে তেমন দৌড় দিতেপারিনে— যেন নিজের সঙ্গে নিজেকে বড় বেশি ঘেঁসাঘেঁসি ঠাসাঠাসিকরে থাকতেহয়। এরকম অবস্থায় আপনার মনটিকে নিয়েথাকা বড় শক্ত।

সাহিত্যের মধ্যে দুটিমাত্র গল্পের বই এনেছিলুম, কিন্তু এম্‌নি আমার পোড়া কপাল, আজ বিদায়নেবার সময় সাহেবের মেম সেই দুটি বই ধারনিয়ে গেছেন, কবে শোধ কববেন তার কোন ঠিকানা নেই। সেই দুটো হাতে তুলেনিয়ে সলজ্জ কাকুতির ভাবে আরম্ভকরলেন "মিষ্টার টাগোর, বুড ইয়ু"— কথাটা শেষ করতে না করতে আমি খুব সজোরে ঘাড়নেড়ে বল্লুম "সার্টেন্‌লি!" এতে কতটা দূর কি বোঝায় ঠিক বল্‌তে পারিনে। আসলে, তাঁরা তখন বিদায়নিচ্ছিলেন সেই উৎসাহে আমি আমার অর্দ্ধেক রাজত্ব দিয়েফেল্‌তে পারতুম (যে পেত তার যে খুব বেশি লাভহত তা নয়।) যাহোক্‌ তারা আজ গেছে—আমার এই দুটোদিন একেবারে ঘুলিয়েদিয়ে গেছে—আবার থিতিয়েনিতে দুদিন যাবে—মেজাজটা এম্‌নি খারাপ হয়েআছে যে ভয়েভয়ে আছি পাছে কাউকে অন্যায় অকারণে তাড়নাকরে উঠি—এত বেশি সাবধানে আছি যে সহজ অবস্থায় যখন একজনকে ধমক দিতুম এখন তাকে খুব নরমনরমকরে বল্‌চি—মেজাজ বিগড়েগেলে অনেকসময় আমার এইরকম উল্টোরকম ব্যাপার হয়—সে সময়ে ছেলেরা কাছে থাক্‌লে ভয়হয় পাছে তাদের লঘুদোষে গুরুদণ্ড দিই, এইজন্যে তাদের দণ্ডই দিইনে—খুব দৃঢ় করে সহিষ্ণুতা অবলম্বনকরে থাকি।

শিলাইদহ,

বৃহস্পতিবার, ৯ই জানুয়ারী,

১৮৯২।

দুইএকদিনথেকে এখানকার প্রকৃতি শীত এবং বসন্তের মধ্যে ইতস্ততঃকরচে—সকালে হয়ত উত্তরেবাতাসে জলেস্থলে হী হী ধরিয়েদিয়ে গেল—সন্ধ্যাবেলায় শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় দক্ষিণেবাতাসে চারিদিক হু হু করেউঠল। বসন্ত অনেকটা এসে পৌঁচেছে বেশ বোঝাযাচ্চে। অনেকদিনপরে আজকাল ওপারের বাগানথেকে একটা পাপিয়া ডাক্‌তে আরম্ভকরেচে। মানুষের মনটাও কতকটা বিচলিতহয়ে উঠচে—আজকাল সন্ধ্যা হলে ওপারের গ্রামথেকে গানবাজনার শব্দ শুনতেপাওয়া যায়—এর থেকে বোঝা যাচ্চে, লোকে দরজা জান্‌লা বন্ধকরে মুড়িসুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বার জন্যে তেমন উৎসুক নয়। আজ পূর্ণিমারাত—ঠিক আমার বাঁ-দিকের খোলা জান্‌লার উপরেই একটা মস্ত চাঁদ উঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে—বোধহয় দেখ্‌চে আমি চিঠিতে তারসম্বন্ধে কোন নিন্দে করচি কিনা—সে হয়ত মনে করে, তার জ্যোৎস্নার চেয়ে তার কলঙ্কের কথা নিয়েই পৃথিবীর লোকে বেশি কানাকানি করে। নিস্তব্ধ চরে একটা টিটি পাখী ডাক্‌চে—নদী স্থির—নৌকো নেই, জলের উপর স্থির ছায়া ফেলে' ওপারের ঘনীভূত বন স্তম্ভিত হয়ে রয়েচে—ঘুমন্ত চোখ খোলা থাক্‌লে যেমন দেখ্‌তে হয়, এই প্রকাণ্ড পূর্ণিমার আকাশ সেইরকম ঈষৎ ঝাপ্‌সা দেখাচ্চে। কাল সন্ধ্যা থেকে আবার ক্রমেক্রমে অন্ধকারের সূত্রপাত হবে, কাল কাছারী সেরে এই ছোট নদীটি পার হবার সময় দেখ্‌তে পাব আমার সঙ্গে আমার এই প্রবাসের প্রণয়িনীর একটুখানি বিচ্ছেদ হয়েচে, কাল যে আমার কাছে আপনার রহস্যময় অপার হৃদয় উদ্ঘাটন করে দিয়েছিল আজ তার মনে যেন একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়েচে, যেন তার মনেহচ্চে একেবারে এতখানি আত্মপ্রকাশ কি ভাল হয়েছিল, তাই হৃদয় আবার একটু একটু করে বন্ধ করচে। বাস্তবিক বিদেশে বিজনঅবস্থায় প্রকৃতি বড় কাছাকাছির জিনিষ—আমি সত্যসত্য দু'তিনদিন ধরে মাঝে মাঝে

ভেবেচি, পূর্ণিমার পরদিন থেকে আমি আর এ জ্যোৎস্না পাব না—আমি যেন বিদেশ থেকে আরো একটু বিদেশে চলে যাব, কাজকর্ম্মের পরে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় যে একটি শান্তিময় পরিচিত সৌন্দর্য্য আমার জন্যে নদীতীরে অপেক্ষা করে থাকৃত সে আর থাক্‌বে না—অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বোটে ফিরে আস্‌তে হবে।

কিন্তু আজ পূর্ণিমা, এ বৎসরকার বসন্তের এই প্রথম পূর্ণিমা, এর কথাটা লিখে রেখে দিলুম—হয়ত অনেকদিন পরে এই নিস্তব্ধ রাত্রিটি মনে পড়বে—ঐ টি ট পাখীর ডাকসুদ্ধ এবং ওপারের ঐ বাঁধা নৌকোয় যে আলোটি জ্বলুচে সেটিসুদ্ধ ; এই একটুখানি উজ্জ্বল নদীর রেখা, ঐ একটুখানি অন্ধকার বনের একটা পোঁচ্, এবং ঐ নির্লিপ্ত উদাসীন পাণ্ডুবর্ণ আকাশ।

৪৩

শিলাইদহ,

৭ই এপ্রেল, ১৮৯২।

সকাল থেকে সুন্দর বাতাস দিচ্চে—কোন কাজ করতে ইচ্ছে করচে না। বোধ হয় এগারোটা কিম্বা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত লেখা পড়া কিম্বা কোন কাজে হাত দিইনি। সকাল থেকে একটি চৌকিতে স্থির হয়ে বসে আছি। মাথার মধ্যে কত টুকরো টুক্‌রো লাইন এবং কত অসমাপ্ত ভাব যাতায়াত করচে, কিন্তু সেগুলোকে একত্র করে বাঁধি কিম্বা পরিস্ফুট করে তুলি এমন শক্তি অনুভব করচিনে। সেই গানটা মনে পড়চে "পায়েরিয়া বাজে, ঝনক ঝনক ঝন ঝন নন নন নন" সুন্দর সকালবেলায় মধুর বাতাসে নদীর মাঝখানে মাথার মধ্যে সেইরকম ঝন নন নূপুর বাজ্‌চে—কিন্তু সে কেবল এদিক ওদিক থেকে অন্তরালে—কেউ ধরা দিচ্চে না, দেখা দিচ্চে না। তাই চুপচাপ করে বসে আছি। নদীর জল অনেকটা শুকিয়ে এসেচে, কোথাও এক কোমরের বেশি জল আর প্রায় নেই—তাই বোটটাকে নদীর প্রায় মাঝখানে বেঁধে রাখা কিছুই শক্ত হয়নি। আমার ডানদিকের পারে চরের উপরে চাষারা চাষ করচে এবং মাঝে মাঝে গোরুকে জল খাইয়ে নিয়ে যাচ্চে—আমার বামপারে শিলাইদহের নারকেল এবং আমবাগান, ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচ্‌চে, জল তুলচে, স্নান করচে এবং উচ্চৈস্বরে বাঙাল ভাষায় হাস্যালাপ করচে—যারা অল্পবয়সী মেয়ে, তাদের জলক্রীড়া আর শেষ হয় না। একবার স্নান সেরে উপরে উঠ্‌চে আবার ঝুপ্‌ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়চে—তাদের নিশ্চিন্ত উচ্চহাস্য শুন্‌তে বেশ লাগে। পুরুষরা গম্ভীরভাবে এসে গোটাকতক ডুব মেরে তাদের নিত্যকর্ম্ম সমাপ্ত করে চলে যায়—কিন্তু মেয়েদের যেন জলের সঙ্গে বেশি ভাব। পরস্পরের যেন একটা সাদৃশ্য এবং সখিত্ব আছে—জল এবং মেয়ে উভয়েই বেশ সহজে ছল্ ছল্ জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে, একটা বেশ সহজ গতি ছন্দ তরঙ্গ, দুঃখতাপে অল্পে অল্পে শুকিয়ে যেতে পারে কিন্তু আঘাতে একেবারে জন্মের মত দু'খানা হয়ে ভেঙে যায় না। সমস্ত কঠিন পৃথিবীকে

সে বাহুবন্ধনে আলিঙ্গন করে আছে, পৃথিবী তার অন্তরের গভীর রহস্য বুঝতে পারে না; সে নিজে শস্য উৎপাদন করে না কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে না থাকলে পৃথিবীতে একটি ঘাসও গজাতে পারত না। মেয়েকে পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে টেনিসন্ বলেচেন, Water unto wine—আমার আজকার মনে হচ্চে জল unto স্থল। তাইজন্যে মেয়েতে ও জলেতে বেশ মিশথায়—অন্য অনেকরকম ভারবহন মেয়েকে শোভা পায় না, কিন্তু উৎসথেকে কুয়োথেকে ঘাটথেকে জল তুলে নিয়েযাওয়া কোনকালেই মেয়েদের পক্ষে অসঙ্গত মনে হয় না। গা ধোয়া স্নানকরা, পুকুরের ঘাটে এককোমর জলে বসে পরস্পর গল্পকরা, এসমস্ত মেয়েদের পক্ষে কেমন শোভন। আমি দেখেছি মেয়েরা জল ভালবাসে কেননা উভয়ে স্বজাত। অবিশ্রাম সহজপ্রবাহ এবং কলধ্বনি জল এবং মেয়ে ছাড়া আর কারো নেই। ইচ্ছে করলে আরো অনেক সাদৃশ্য দেখান যেতে পারত, কিন্তু বেলাও বোধকরি অনেক হয়েচে, এবং একটা কথা ফেনিয়ে বেশি নেংড়ানো কিছু নয়।

৪৪

শিলাইদহ,

৮ই এপ্রিল, ১৮৯২।

এখানে এসে আমি এত এলিমেণ্টস্ অফ্ পলিটিক্স্ এবং প্রব্লেম্স্ অফ্ দি ফ্যুচার পড়্‌চি শুনে বোধহয় খুব আশ্চর্য্য ঠেক্‌তে পারে। আসলকথা, ঠিক এখানকার উপযুক্ত কোন কাব্য নভেল খুঁজে পাইনে। যেটা খুলেদেখি সেই ইংরাজি নাম, ইংরাজি সমাজ, লণ্ডনের রাস্তা এবং ড্রয়িংরুম, এবং যতরকম হিজিবিজি হাঙ্গাম। বেশ শাদাসিদে সহজ সুন্দর উন্মুক্ত এবং অশ্রুবিন্দুর মত উজ্জ্বল কোমল সুগোল করুণ কিছুই খুঁজে পাইনে। কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস—কেবল মানবচরিত্রকে মুচ্‌ড়ে নিংড়ে কুঁচ্‌কে মুচ্‌কে, তাকে সজোরে পাক দিয়েদিয়ে তারথেকে নতুন নতুন থিওরি এবং নীতিজ্ঞান বেরকরবার চেষ্টা। সেগুলো পড়্‌তেগেলে আমার এখানকার এই গ্রীষ্মশীর্ণ ছোট নদীর শান্তস্রোত, উদাস বাতাসের প্রবাহ, আকাশের অখণ্ড প্রসার, দুইকূলের অবিরল শান্তি এবং চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে একেবারে ঘুলিয়ে দেবে। এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাইনে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোটছোট পদ ছাড়া। বাংলার যদি কতকগুলি ভালভাল মেয়েলি রূপকথা জান্‌তুম এবং সরলছন্দে সুন্দরকরে ছেলেবেলাকার ঘোরো-স্মৃতি দিয়ে সরসকরে লিখ্‌তে পারতুম তাহলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হত। বেশ ছোট নদীর কলরবের মত, ঘাটের মেয়েদের উচ্চহাসি মিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং ছোটখাট কথাবার্ত্তার মত, বেশ নারকেলপাতার ঝুরঝুর কাঁপুনি, আমবাগানের ঘনছায়া, এবং প্রস্ফুটিত সর্ষেক্ষেতের গন্ধের মত—বেশ শাদাসিধে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময়—অনেকখানি আকাশ আলো নিস্তব্ধতা এবং করুণতায় পরিপূর্ণ। মারামারি হানাহানি যোঝাযুঝি কান্নাকাটি সে সমস্ত এই ছায়াময় নদীস্নেহবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন বাংলাদেশের নয়। যাইহোক্, এলিমেণ্ট্‌স্ অফ্ পলিটিক্স্ জলেরউপরে তেলের মত এখানকার নিস্তব্ধ শান্তির উপরদিয়ে অবাধে ভেসে চলেযায়, এ'কে কোনরকমে নাড়াদিয়ে ভেঙেদেয় না।

নদীর মাঝখানে বসে আছি, দিনরাত্রি হু হু করে বাতাস দিচ্চে, দুইদিকের দুইপার পৃথিবীর দুটি আরম্ভ-রেখারমত বোধহচ্চে—ওখানে জীবনের কেবল আভাসমাত্র দেখাদিয়েছে, জীবন সুতীব্রভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি—যারা জলতুল্‌চে, স্নানকরচে, নৌকো বাচ্চে, গোরুচরাচ্চে, মেঠো পথদিয়ে আস্‌চেযাচ্চে, তারা যেন যথেষ্ট জীবন্ত সত্য নয়। অন্য জায়গায় মানুষরা ভিড়করে, তারা সাম্‌নে উপস্থিত হলে চিন্তার ব্যাঘাত করে, তাদের অস্তিত্বই যেন কুনুইদিয়ে ঠেলাদেয়, তারা প্রত্যেকে একএকটি পজিটিভ্‌ মানুষ ;—এখানকার এরা সম্মুখে আনাগোনা চলাবলা কাজকর্ম্ম করচে—কিন্তু মনকে ঠেলাদিয়ে যাচ্চে না। কৌতুহলে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দেখ্‌চে কিন্তু সেই সরল কৌতুহল ভিড়করে গায়ের উপর এসে পড়চেনা। যাহোক্‌, বেশ লাগ্‌চে।

৪৫

বোলপুর।

শনিবার, ২রা মে, ১৮৯২।

জগৎসংসারে অনেকগুলো প্যারাডক্স্ আছে তারমধ্যে এও একটি যে, যেখানে বৃহৎদৃশ্য, অসীম আকাশ, নিবিড় মেঘ, গভীর ভাব, অর্থাৎ যেখানে অনন্তের আবির্ভাব সেখানে তার উপযুক্ত সঙ্গী একজন মানুষ—অনেকগুলো মানুষ ভারি ক্ষুদ্র এবং খিজি-বিজি। অসীমতা এবং একটি মানুষ উভয়ে পরস্পরের সমকক্ষ—আপন আপন সিংহাসনে পরস্পর মুখোমুখী বসে থাকবার যোগ্য। আর কতকগুলো মানুষে একত্রে থাক্‌লে তারা পরস্পরকে ছেঁটেছুঁটে অত্যন্ত খাটো করে রেখে দেয়—একজন মানুষ যদি আপনার সমস্ত অন্তরাত্মাকে বিস্তৃত করতে চায় তাহলে এত বেশি জায়গার আবশ্যক করে যে কাছাকাছি পাঁচ ছ জনের স্থান থাকে না। অধিক লোক জোটাতে গেলেই পরস্পরের অনুরোধে আপনাকে সংক্ষেপকরতে হয়—যেখানে যতটুকু ফাঁক সেইখানে ততটুকু মাথা গলাতে হয়। মাঝের থেকে, দুই বাহু প্রসারিত করে দুই অঞ্জলি পূর্ণ করে প্রকৃতির এই অগাধ অনন্ত বিস্তীর্ণতাকে গ্রহণ করতে পারচিনে।

বোলপুর,
৮ই জ্যৈষ্ঠ ;
১৮৯২।

রসিকতা জিনিষটা বড় বিপদের জিনিষ—ও যদি প্রসন্ন সহাস্যমুখে আপনি ধরা দিলে ত অতি উত্তম, আর ওকে নিয়ে যদি টানাটানি করা যায় তবে বড়ই "ব্যাভ্রম" হবার সম্ভাবনা। হাস্যরস প্রাচীনকালের ব্রহ্মাস্ত্রের মত, যে ওর প্রয়োগ জানে সে ওকে নিয়ে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিতে পারে—আর যে হতভাগ্য ছুঁড়তে জানে না অথচ নাড়তে যায়, তার বেলায় "বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই বধে," হাস্যরস তাকেই হাস্যজনক করে তোলে।

মেয়েরা রসিকতা করতে গিয়ে যদি মুখরা হয়ে পড়ে তবে সেটা ভারি অশোভন দেখ্‌তে হয়। আমার ত মনে হয় "কমিক্‌" হতে চেষ্টা করে সফল হলেও মেয়েদের সাজে না—নিষ্ফল হলেও মেয়েদের সাজে না। কারণ "কমিক্‌" জিনিষটা ভারি গাব্‌দা এবং প্রকাণ্ড। ("সাব্লিমিটি"র সঙ্গে "কমিক্যালিটি"র একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে—সেইজন্যে হাতি কমিক্‌, উট্‌ কমিক্‌, জিরাফ্‌ কমিক্‌, স্থূলতা কমিক্‌।) সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বরঞ্চ প্রখরতা শোভা পায় যেমন ফুলের সঙ্গে কাঁটা—তেমনি শাণিত কথা মেয়েদের মুখে বড্ড বাজে বটে তেমনি সাজেও বটে। কিন্তু যে সকল বিদ্রূপে কোনরকম স্থূলত্বের আভাসমাত্র দেয় তার দিক দিয়েও মেয়েদের যাওয়া উচিত হয় না;—সে হচ্চে আমাদের সাব্লাইম স্বজাতীয়ের জন্যে। পুরুষ ফল্‌ষ্টাফ্‌ আমাদের হাসিয়ে নাড়ি ছিঁড়ে দিতে পারে কিন্তু মেয়ে ফল্‌ষ্টাফ্‌ আমাদের গা জ্বালিয়ে দিত।

৪৭

বোলপুর,
৯ই জ্যৈষ্ঠ,
১৮৯২।

কাল যে ঝড় সে আর কি বল্‌ব! আমার সাধনার নিত্যনৈমিত্তিক লেখা সেরে চা খাবার জন্যে উপরে যাচ্ছি, এমন সময়ে প্রচণ্ড ঝড় এসে উপস্থিত। ধূলোয় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং বাগানের যত শুক্‌নো পাতা একত্র হয়ে লাটিমের মত বাগানময় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল,—যেন অরণ্যের যত প্রেতাত্মাগুলো হঠাৎ জেগে উঠে ভুতুড়ে নাচন নাচ্‌তে আরম্ভ করে দিলে। বাগানের সমস্ত গাছপালা পায়ে-শিক্‌লি-বাঁধা প্রকাণ্ড জটায়ুপাখীর মত ডানা আছড়ে ঝট্‌পট্ ঝট্‌পট্ করতে লাগ্‌ল। সে কি গর্জ্জন, কি মাতামাতি, কি একটা লুটোপুটি ব্যাপার! ঝড়টা দেখে আমার মনে পড়্‌ছিল, আমেরিকার Ranch সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে রকম বর্ণনা পড়া যায়—হঠাৎ কোন একটা বেড়া ভেঙে ফেলে ছ সাতশো বুনো ঘোড়া ধূলো উড়িয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্চে, আর তার পিছনে পিছনে তাদের তাড়িয়ে ফিরিয়ে আনবার জন্যে বড় বড় ফাঁস হাতে অনেকগুলো অশ্বারোহী ছুটেছে—মাঝে মাঝে যেখানে যাকে পাচ্চে সাঁই সাঁই শব্দে দিচ্চে চাব্‌কে—বোলপুরের অবারিত আকাশ এবং মাঠের মধ্যে যেন সেই রকমের একটা উচ্ছৃঙ্খল পলায়ন এবং পশ্চাদ্ধাবন চল্‌চে—দৌড় দৌড় ধবধর পালা' পালা' হুড়মুড় দুড়দাড় ব্যাপার।

—*—

৪৮

বোলপুর,

১২ই জ্যৈষ্ঠ,

১৮৯২।

পূর্ব্বেই লিখেছি অপরাহ্ণে আমি আপন মনে একাকী ছাতের উপর বেড়াই; কাল সন্ধ্যাবেলায় আমার দুই বন্ধুকে দুই পার্শ্বে নিয়ে অঘোরকে আমার পথপ্রদর্শক করে তাঁদের এখানকার প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনকরানো আমার কর্ত্তব্য মনে করে বেরিয়ে পড়া গেল। তখন সূর্য্য অস্ত গেছে কিন্তু অন্ধকার হয়নি। একেবারে দিগন্তের প্রান্তে যেখানে গাছের সার নীলবর্ণ হয়ে দেখা যাচ্চে, তারি উপরেই ঠিক একটি রেখামাত্র খুব গাঢ় নীল মেঘ উঠে খুব চমৎকার দেখ্‌তে হয়েচে—আমি তারি মধ্যে একটুখানি কবিত্ব করে বল্লুম, ঠিক যেন নীল চোখের পাতার উপরে নীল সুর্ম্মা লাগিয়েছে। সঙ্গীরা কেউ কেউ শুন্‌তে পেলেনা, কেউ কেউ বুঝ্‌তে পারলেনা—কেউ কেউ সংক্ষেপে বল্লে—হাঁ, দিব্যি দেখ্‌তে হয়েচে। তার পর থেকে দ্বিতীয়বার কবিত্ব করতে আমার উৎসাহ হল না। প্রায় মাইলখানেক গিয়ে একটা বাঁধের ধারে একসার তালবন এবং তালবনের কাছে একটি মেঠো ঝরনার মত আছে—সেইটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌চি এমন সময়ে দেখি উত্তরে সেই নীল মেঘ অত্যন্ত প্রগাঢ় এবং স্ফীত হয়ে চলে আস্‌চে এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্দন্ত বিকাশ করচে। আমাদের সকলেরই মত হল এরকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ঘরের মধ্যে বসে দেখাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ, বাড়িমুখে যেমন ফিরেচি অম্‌নি প্রকাণ্ড মাঠের উপর দীর্ঘ পদক্ষেপ করতে করতে সরোষগর্জ্জনে একটা ঝড় আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। আমরা যখন প্রকৃতিসুন্দরীর চোখের সুর্ম্মার বাহার নিয়ে তারিফ করছিলুম তখন তিলমাত্র আশঙ্কা করিনি যে, তিনি ঝোঁষাবিষ্টা গৃহিণীর মত এত বড় একটা প্রকাণ্ড চপেটাঘাত নিয়ে আমাদের উপর ছুটে আস্‌বেন। ধুলোয় এম্‌নি অন্ধকার হয়ে এল যে পাঁচ হাত দূরে কিছু দেখা যায় না। বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগল—কাঁকরগুলো বায়ুতাড়িত হয়ে ছিটে গুলির মত আমাদের

বিঁধতে লাগ্‌ল—মনে হল বাতাস পিছন থেকে ঘাড় ধরে আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্চে—ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পিট্‌ পিট্‌ করে মুখের উপর সবেগে আঘাত করতে লাগ্‌ল। দৌড়্‌ দৌড়্‌। মাঠ সমান নয়। এক এক জায়গায় আবার খোয়াইয়ের ভিতর নাব্‌তে হয়, সেখানে সহজ অবস্থাতেই চলা শক্ত, এই ঝড়ের বেগে চলা আরো মুস্কিল। পথের মধ্যে আবার পায়ে কাঁটাসুদ্ধ একটা শুক্‌নো ডাল বিঁধে গেল—সেটা ছাড়াতে গিয়ে বাতাস আবার পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে মুখ থুব্‌ড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। বাড়ির যখন প্রায় কাছাকাছি এসেচি, তখন দেখি, তিন চারটে চাকর মহা সোর্‌গোল্‌ করে দ্বিতীয় আর একটা ঝড়ের মত আমাদের উপরে এসে পড়ল। কেউ হাত ধরে, কেউ আহা উহু বলে, কেউ পথদেখাতে চায়, কেউ আবার মনে করে বাবু বাতাসে উড়ে যাবেন বলে' পিঠের দিক থেকে জড়িয়ে ধরে; এই সমস্ত অনুচরদের দৌরাত্ম্য কাটিয়ে কুটিয়ে এলোমেলো চুলে, ধুলিমলিন দেহে, সিক্ত বস্ত্রে, হাঁপিয়ে বাড়িতে এসেত পড়লুম। যাহোক্‌, একটা খুব শিক্ষালাভ করেছি—হয়ত কোন্‌দিন্‌ কোন্‌ কাব্যে কিম্বা উপন্যাসে বর্ণনা করতে বস্‌তুম একজন নায়ক মাঠের মধ্যে দিয়ে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি ভেঙে নায়িকার মধুর মুখচ্ছবি স্মরণ ক'রে অকাতরে চলে যাচ্চে—কিন্তু এখন আর এরকম মিথ্যে কথা লিখ্‌তে পারব না; ঝড়ের সময় কারো মধুর মুখ মনে রাখা অসম্ভব—কি করলে চোখে কাঁকর ঢুক্‌বেনা সেই চিন্তাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। আমার আবার চোখে eye-glass ছিল, সেটা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে, কিছুতেই রাখ্‌তে পারিনে। এক হাতে চষমা ধরে আর এক হাতে ধুতির কোঁচা সাম্‌লে পথের কাঁটাগাছ এবং গর্ত্ত বাঁচিয়ে চল্‌চি। যদি এখানকার কোপাই নদীর ধারে আমার কোন প্রণয়িনীর বাড়ি থাক্‌ত, আমার চষমা এবং কোঁচা সাম্‌লাতুম, না, তার স্মৃতি সাম্‌লাতুম! বাড়িতে ফিরে এসে কাল অনেকক্ষণ ভাব্‌লুম—বৈষ্ণব কবিরা গভীর রাত্রে ঝড়ের সময় রাধিকার অকাতর অভিসারসম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল মিষ্টি কবিতা লিখেচেন—কিন্তু একটা কথা ভাবেননি এরকম ঝড়ে কৃষ্ণের কাছে তিনি কি মূর্ত্তি নিয়ে উপস্থিত হতেন? চুলগুলোর অবস্থা যে কিরকম হত সেত বেশ বোঝা যাচ্চে। বেশবিন্যাসেরই বা কিরকম দশা! ধুলোতে লিপ্ত হয়ে, তার উপর বৃষ্টির জলে কাদা জমিয়ে কুঞ্জবনে কিরকম অপরূপ মূর্ত্তি করে গিয়েই দাঁড়াতেন! এসব কথা কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের লেখা পড়বার সময় মনে হয় না—কেবল মানসচক্ষে ছবির মত দেখ্‌তে পাওয়া যায় একজন সুন্দরী শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রে বিকশিত কদম্ববনের ছায়া দিয়ে যমুনার তীরপথে প্রেমের আকর্ষণে

ঝড়বৃষ্টির মাঝে আত্মবিহ্বল হয়ে স্বপ্নগতার মত চলেচেন; পাছে শোনা যায় বলে পায়ের নূপুর বেঁধে রেখেচেন, পাছে দেখা যায় বলে নীলাম্বরী কাপড় পরেচেন, কিন্তু পাছে ভিজে যান বলে ছাতা নেন্‌নি, পাছে পড়ে যান্‌ বলে বাতি আনা আবশ্যক বোধ করেন নি। হায়, আবশ্যক জিনিষগুলো আবশ্যকের সময় এত বেশি দরকার, অথচ কবিত্বের বেলায় এত উপেক্ষিত! আবশ্যকের শতলক্ষ দাসত্ববন্ধন থেকে আমাদের মুক্তি দেবার জন্যে কবিতা মিথ্যে ভাণ করচে। ছাতা জুতো জামাযোড়া চিরকাল থাক্‌বে। বরঞ্চ শোনা যায় সভ্যতার উন্নতি সহকারে কাব্য ক্রমে লোপ পাবে কিন্তু ছাতা জুতোর নতুন নতুন পেটেন্ট্‌ বেরোতে থাক্‌বে।

বোলপুর,
১৬ই জ্যৈষ্ঠ,
১৮৯২।

এখানে রাত্রে কোন গির্জ্জের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজে না—এবং কাছাকাছি কোন লোকালয় না থাকাতে পাখীরা গান বন্ধ করবামাত্রই সন্ধ্যার পর থেকে একেবারে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা আরম্ভ হয়। প্রথম রাত্রি এবং অর্দ্ধরাত্রে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। কলকাতায় অনিদ্রার রাত্রি মস্ত একটা অন্ধকার নদীর মত, খুব ধীরে ধীরে চল্‌তে থাকে, বিছানায় চক্ষু মেলে চিৎ হয়ে পড়ে তার গতিশব্দ মনে মনে গণনা করা যেতে পারে; এখানকার রাত্রিটা যেন একটা প্রকাণ্ড নিস্তরঙ্গ হ্রদের মত—আগাগোড়া সমান থম্ থম্ করচে কোথাও কিছু গতি নেই। যতই এপাশ ফিরি এবং যতই ওপাশ ফিরি একটা মস্ত যেন অনিদ্রার গুমট্ করে ছিল, তার মধ্যে প্রবাহের লেশমাত্র পাওয়া যায় না। আজ সকালে কিছু বিলম্বে শয্যাত্যাগ করে আমার নীচেকার ঘরের তাকিয়া ঠেসান্ দিয়ে বুকের উপর শ্লেট্ রেখে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে সকালের বাতাস এবং পাখীর ডাকের মধ্যে একটি কবিতা লিখ্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম। বেশ জমে এসেছিল—মুখ সহাস্য, চক্ষু ঈষৎ মুদ্রিত, মাথা ঘন ঘন আন্দোলিত এবং গুন্ গুন্ আবৃত্তি উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ছিল—এমন সময় একখানি চিঠি, একখানি সাধনা, একখানি সাধনার প্রুফ এবং একখানি Monist কাগজ পাওয়া গেল। চিঠিখানি পড়্‌লুম এবং সাধনার পাতাগুলোর মধ্যে চোখ দুটোকে একবার সবেগে ঘোড়দৌড় করিয়ে নিয়েএলুম। তার পরে পুনশ্চ শিরশ্চালন করে অস্ফুট গুঞ্জনস্বরে কবিত্বে প্রবৃত্তহলুম। শেষ করে ফেলে তবে অন্য কথা। একটি কবিতা লিখেফেল্লে যেমন আনন্দ হয় হাজার গদ্য লিখ্‌লেও তেমন হয় না কেন তাই ভাব্‌চি। কবিতায় মনের ভাব বেশ একটি সম্পূর্ণতা লাভ করে, বেশ যেন হাতে করে তুলে নেবার মত। আর, গদ্য যেন এক বস্তা আল্‌গা জিনিষ—একটি জায়গা ধরলে সমস্তটি অম্‌নি স্বচ্ছন্দে উঠে আসে না—

একেবারে একটা বোঝাবিশেষ। রোজ রোজ যদি একটি করে কবিতা লিখে শেষ করতে পারি তাহলে জীবনটা বেশ একরকম আনন্দে কেটে যায়—কিন্তু এতদিন ধরে সাধনা করে আস্‌চি ওজিনিষটা এখনো তেমন পোষ মানেনি—প্রতিদিন লাগাম পরাতে দেবে তেমন পক্ষীরাজ ঘোড়াটি নয়! আর্টের একটা প্রধান আনন্দ হচ্চে স্বাধীনতার আনন্দ—বেশ আপনাকে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া যায় তার পরে আবার এই ভবকারাগারের মধ্যে ফিরে এসেও অনেকক্ষণ কানের মধ্যে একটা ঝঙ্কার, মনের মধ্যে একটা স্ফূর্ত্তি লেগে থাকে। এই ছোট ছোট কবিতাগুলো আপ্‌নাআপ্‌নি এসে পড়চে বলে আর নাটকে হাত দিতে পারচিনে। নইলে দুটো তিনটে ভাবী নাটকের উমেদার মাঝেমাঝে দরজা-ঠেলাঠেলি করচে। শীতকাল ছাড়া বোধহয় সেগুলোতে হাত দেওয়া হয়ে উঠ্‌বে না। চিত্রাঙ্গদা ছাড়া আমার আর সব নাটকই শীতকালে লেখা। সে সময়ে গীতিকাব্যের আবেগ অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে—অনেকটা ধীরে-সুস্থে নাটক লেখা যায়।

৫০

বোলপুর,

৩১ শে মে, ১৮৯২।

এখনো পাঁচটা বাজেনি—কিন্তু আলো হয়েচে, বেশ বাতাস দিচ্চে এবং বাগানের সমস্ত পাখীগুলো জেগে উঠে গান জুড়ে দিয়েচে। কোকিলটা ত সারা হয়ে গেল—সে কেন যে এত অবিশ্রাম ডাকে এ পর্য্যন্ত বোঝা গেল না—অবশ্য আমাদের শ্রুতিবিনোদনের জন্যে নয়, বিরহিনীকে পীড়ন করবার অভিপ্রায়েও নয়—তার নিজের একটা পার্সোনাল উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে—কিন্তু হতভাগার সে উদ্দেশ্য কি কিছুতেই সিদ্ধ হচ্চে না? ছাড়েও না ত—কুউ কুউ চল্‌চেই—আবার একএকবার যেন দ্বিগুণ অস্থির হয়ে দ্রুতবেগে কুহুধ্বনি করচে। এর মানে কি? আবার আরখানিকটা দূরে আর-একটা কি পাখী নিতান্ত মৃদুস্বরে কুক্ কুক্ করচে—তাতে কিছুমাত্র উৎসাহ আগ্রহের ঝাঁজ্ নেই—লোকটা যেন নেহাৎ মন-মরা হয়ে গেছে—সমস্ত আশা ভরসা ছেড়ে দিয়েচে—কিন্তু তবু ছায়ায় বসে সমস্ত দিন ওই একটুখানি কুক্ কুক্ কুক্ কুক্ ওটুকু ছাড়তে পারচে না। বাস্তবিক ঐ ডানাওয়ালা ছোট ছোট নিরীহ জীবগুলি, অতি কোমল গ্রীবাটুকু বুকটুকু এবং পাঁচমিশালি রং নিয়ে গাছের ছায়ায় বসে আপন-আপন ঘরকন্না করচে—ওদের আসল বৃত্তান্ত কিছুই জানিনে। বাস্তবিক, বুঝতে পারিনে ওদের এত ডাক্‌বার কি আবশ্যক।

৫৭

শিলাইদহ,

৩১ শে জ্যৈষ্ঠ,

১৮৯২।

এ সব শিষ্টাচার আর ভাল লাগে না—আজকাল প্রায় বসে বসে আওড়াই—"ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন!" বেশ একটা সুস্থ সবল উন্মুক্ত অসভ্যতা। ইচ্ছা করে দিনরাত্রি বিচার আচার বিবেক বুদ্ধি নিয়ে কতকগুলো বহুকেলে জীর্ণতার মধ্যে শরীরমনকে অকালে জরাগ্রস্ত না করে একটা দ্বিধাহীন চিন্তাহীন প্রাণ নিয়ে খুব একটা প্রবল জীবনের আনন্দ লাভ করি। মনের সমস্ত বাসনা ভাবনা ভালই হোক্ মন্দই হোক্, বেশ অসংশয় অসঙ্কোচ এবং প্রশস্ত যেন হয়—প্রথার সঙ্গে বুদ্ধির, বুদ্ধির সঙ্গে ইচ্ছার, ইচ্ছার সঙ্গে কাজের কোনরকম অহর্নিশি খিটিমিটি না ঘটে। একবার যদি এই রুদ্ধ জীবনকে খুব উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলভাবে ছাড়া দিতে পারতুম, একেবারে দিগ্বিদিকে ঢেউ খেলিয়ে ঝড় বাঁহিয়ে দিতুম, একটা বলিষ্ঠ বুনো ঘোড়ার মত কেবল আপনার লঘুত্বের আনন্দ-আবেগে ছুটে যেতুম! কিন্তু আমি বেদুয়িন নই বাঙালী। আমি কোণে বসে বসে খুঁৎ খুঁৎ করব বিচার করব তর্ক করব, মনটাকে নিয়ে একবার ওল্টাব একবার পাল্টাব—যেমন করে মাছ ভাজে, ফুটন্ত তেলে একবার এ পিট চিড়বিড় করে উঠবে একবার ওপিঠ চিড়বিড় করবে,—যাক্‌গে, যখন রীতিমত অসভ্য হওয়া অসাধ্য তখন রীতিমত সভ্য হবার চেষ্টা করাই সঙ্গত—সভ্যতা এবং বর্ব্বরতার মধ্যে লড়াই বাধাবার দরকার নেই।

৫২

শিলাইদহ,
১৬ই জুন,
১৮৯২।

যতই একলা আপনমনে নদীর উপরে কিম্বা পাড়াগাঁয়ে কোন খোলা জায়গায় থাকা যায়, ততই প্রতিদিন পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, সহজভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর কিছু হতে পারে না। মাঠের তৃণ থেকে আকাশের তারা পর্য্যন্ত তাই করচে; কেউ গায়ের জোরে আপনার সীমাকে অত্যন্ত বেশি অতিক্রম করবার জন্যে চেষ্টা করচেনা বলেই প্রকৃতির মধ্যে এমন গভীর শান্তি এবং অপার সৌন্দর্য্য—অথচ প্রত্যেকে যেটুকু করচে সেটুকু বড় সামান্য নয়—ঘাস আপনার চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ করে' তবে ঘাসরূপে টি'কে থাক্‌তে পারে, তার শিকড়ের শেষ প্রান্তটুকু পর্য্যন্ত দিয়ে তাকে রসাকর্ষণ করতে হয়, সে যে নিজের শক্তি লঙ্ঘন করে বটগাছ হবার নিষ্ফল চেষ্টা করচেনা এইজন্যই পৃথিবী এমন সুন্দর শ্যামল হয়ে রয়েচে। বাস্তবিক, বড় বড় উদ্যোগ এবং লম্বা-চৌড়া কথার দ্বারা নয় কিন্তু প্রাত্যহিক ছোট ছোট কর্ত্তব্য-সমাধাদ্বারাই মানুষের সমাজে যথাসম্ভব শোভা এবং শান্তি আছে। কবিত্বই বল আর বীরত্বই বল কোনটাই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু একটি অতি ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যের মধ্যেও তৃপ্তি এবং সম্পূর্ণতা আছে। বসে বসে হাঁস্‌ফাঁস্‌ করা, কল্পনা করা, কোন অবস্থাকেই আপনার যোগ্য মনে না করা, এবং ইতিমধ্যে সম্মুখ দিয়ে সময়কে চলে যেতে দেওয়া, এর চেয়ে হেয় আর কিছু হতে পারে না। যখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা যায় নিজের সাধ্যায়ত্ত সমস্ত কর্ত্তব্য সত্যের সঙ্গে, বলের সঙ্গে, হৃদয়ের সঙ্গে সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে পালন করে যাব, এবং যখন বিশ্বাস হয় তা করতে পারব, তখন সমস্ত জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, ছোটখাট দুঃখবেদনা একেবারে দূর হয়ে যায়। অবশ্য, আমার জীবনের প্রতিদিন এবং প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমার সম্মুখে এখন প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নেই, তাই

হয়ত দূর থেকে হঠাৎ একটা কাল্পনিক আশার উচ্ছ্বাসে স্ফীত হয়ে উঠ্ছি, সমস্ত খুঁটিনাটি খিটিমিটি সঙ্কট এবং সংঘর্ষ বাদ দিয়ে ভাবী জীবনের একটা মোটামুটি চিত্র অঙ্কিত করে এতটা ভরসা পাচ্চি, কিন্তু তা ঠিক নয়।

৫৩

শিলাইদহ,

২রা আষাঢ়,

১২৯২।

কাল আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বর্ষার নব রাজ্যাভিষেক বেশ রীতিমত আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েগেছে। দিনেরবেলাটা খুব গরম হয়ে বিকেলের দিকে ভারি ঘনঘটা মেঘ করে এল।

কাল ভাবলুম, বর্ষার প্রথম দিনটা, আজ বরঞ্চ ভেজাও ভাল তবু অন্ধকূপের মধ্যে দিনযাপন করবনা। জীবনে ৯৩ সাল আর দ্বিতীয়বার আস্‌বেনা—ভেবে দেখ্‌তে গেলে পরমায়ুর মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম দিন আর ক'বারই বা আস্‌বে—সবগুলো কুড়িয়ে যদি ত্রিশটা দিন হয় তাহ'লেও খুব দীর্ঘজীবন বলতে হবে। মেঘদূত লেখার পর থেকে আষাঢ়ের প্রথম দিনটা একটা বিশেষ চিহ্নিত দিন হয়ে গেছে—নিদেন আমার পক্ষে। আমি প্রায়ই একএক সময়ে ভাবি, এই যে আমার জীবনে প্রত্যহ একটি একটি করে দিন আসচে, কোনটি সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তে রাঙা, কোনটি ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধশীতল, কোনটি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় শাদা ফুলের মত প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য! এবং এরা কি কম মূল্যবান! হাজার বৎসর পূর্ব্বে কালিদাস সেই যে আষাঢ়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন—আমার জীবনেও প্রতি বৎসরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-যোড়া ঐশ্বর্য্য নিয়ে উদয় হয়—সেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির—সেই বহু-বহুকালের শত শত সুখদুঃখবিরহমিলনময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথম দিবসঃ! সেই অতি পুরাতন আষাঢ়ের প্রথম মহাদিন আমার জীবনে প্রতিবৎসর একটি একটি করে কমে যাচ্চে, অবশেষে এক সময় আস্‌বে, যখন এই কালিদাসের দিন, এই মেঘদূতের দিন, এই ভারতবর্ষের বর্ষার চিরকালীন প্রথম দিন, আমার অদৃষ্টে আর একটিও অবশিষ্ট থাক্‌বে না। একথা ভাল করে ভাব্‌লে পৃথিবীর দিকে আবার ভাল করে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে; ইচ্ছে করে জীবনের প্রত্যেক সূর্য্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্য্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মত বিদায় দিই। আমি যদি

সাধুপ্রকৃতির লোক হতুম তাহলে হয়ত মনে করতুম জীবন নশ্বর অতএব প্রতিদিন বৃথা ব্যয় না করে সৎকার্য্যে এবং হরিনামে যাপন করি। কিন্তু আমার সে প্রকৃতি নয়—তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্চে—এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারচিনে। এই সমস্ত রং, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোকভূলোকের মাঝখানের সমস্ত শূন্য-পরিপূর্ণ করা শান্তি এবং সৌন্দর্য্য, এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চল্‌চে! কত বড় উৎসবের ক্ষেত্রটা! আর আমাদের ভিতরে ভাল করে তার সাড়া পাওয়াই যায় না! জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি! লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না, সে যেন আরো লক্ষযোজন দূরে! রঙীন্ সকাল এবং রঙীন্ সন্ধ্যাগুলি দিগ্বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এক একটি মাণিকের মত সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্চে আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না। সেই বিলেত যাবার পথে লোহিত সমুদ্রের স্থির জলের উপরে যে একটি অলৌকিক সূর্য্যাস্ত দেখেছিলুম, সে কোথায় গেছে! কিন্তু ভাগ্যিস্ আমি দেখেছিলুম, আমার জীবনে ভাগ্যিস্ সেই একটি সন্ধ্যা উপেক্ষিত হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায়নি—অনন্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি অত্যাশ্চর্য্য সূর্য্যাস্ত আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কোন কবি দেখেনি। আমার জীবনে তার রং রয়ে গেছে। এমন এক একটি দিন এক একটি সম্পত্তির মত। আমার সেই পেনেটির বাগানের গুটিকতক দিন, তেতালার ছাতের গুটিকতক রাত্রি, পশ্চিম ও দক্ষিণের বারান্দার গুটিকতক বর্ষা, চন্দননগরের গঙ্গার গুটিকতক সন্ধ্যা, দার্জ্জিলিঙে সিঞ্চল শিখরের একটি সূর্য্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় এইরকম কতক-গুলি উজ্জ্বল সুন্দর ক্ষণ-খণ্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েচে। ছেলেবেলায় বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে যখন ছাতে পড়ে থাকতুম তখন জ্যোৎস্না যেন মদের শুভ্র ফেনার মত একেবারে উপ্‌চে পড়ে নেশায় আমাকে ডুবিয়ে দিত। যে পৃথিবীতে এসে পড়েচি এখানকার মানুষগুলো সব অদ্ভুত জীব—এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথচে, পাছে দুটো চোখে কিছু দেখতে পায় এই জন্যে বহু যত্নে পর্দ্দা টাঙিয়ে দিচ্চে। বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারি অদ্ভুত! এরা যে ফুলের গাছে এক একটি ঘ্যাটা-টোপ পরিয়ে রাখেনি, চাঁদের নীচে চাঁদোয়া খাটায়নি সেই আশ্চর্য্য! এই স্বেচ্ছা-অন্ধগুলো বন্ধ পাল্কীর মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কি দেখে চলে যাচ্চে! যদি

বাসনা এবং সাধনা-অনুরূপ পরকাল থাকে তাহলে এবার আমি এই ওয়াড়-পরানো পৃথিবী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেন এক উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্য্যের আনন্দলোকে গিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি। (যারা সৌন্দর্য্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্য্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে—কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেয়েচে তারা জানে সৌন্দর্য্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত—কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক্, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না।

আমি ভদ্রলোক সেজে সহরের বড় রাস্তায় আনাগোনা করচি, পরিপাটী ভদ্রলোকদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথাবার্ত্তা কয়ে জীবন মিথ্যে কাটিয়ে দিচ্চি! আমি অন্তরে অসভ্য অভদ্র—আমার জন্যে কোথাও কি একটা ভারি সুন্দর অরাজকতা নেই, কতকগুলো ক্ষ্যাপা লোকের আনন্দমেলা নেই! কিন্তু আমি কি এ সমস্ত বকচি—কাব্যের নায়কেরা এইরকম সব কথা বলে—কনভেন্‌শ্যানালিটির উপরে তিন-চার পাতযোড়া স্বগত উক্তি প্রয়োগ করে—আপনাকে সমস্ত মানবসমাজের চেয়ে বড় মনে করে। বাস্তবিক এ সব কথা বল্‌তে লজ্জা করে। এর মধ্যে যে সত্যটা আছে সে বহুকালথেকে ক্রমাগত কথাচাপা পড়ে আস্‌চে। পৃথিবীতে সবাই ভারি কথা কয়—তার মধ্যে আমি একজন অগ্রগণ্য—হঠাৎ এতক্ষণে সে বিষয়ে চেতনা হল।

পুঃ—আসল যে কথাটা বল্‌তে গিয়েছিলুম—সেটা বলে নিই—ভয় নেই, আবার চার পাতা জুড়বেনা—কথাটা হচ্চে—পয়লা আষাঢ়ের দিন বিকেলে খুব মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাস্।

৫৪

শিলাইদহ,

৪ঠা আষাঢ়,

১৮৯২

আজকাল আমি বিকেলে সন্ধ্যার দিকে ডাঙায় উঠে অনেকক্ষণ বেড়াতে থাকি—পূর্ব্বদিকে যখন ফিরি একরকম দৃশ্য দেখ্‌তে পাই পশ্চিমে যখন ফিরি আরএকরকম দেখ্‌তে পাই—আকাশ থেকে আমার মাথার উপরে যেন সান্ত্বনা বৃষ্টি হতে থাকে—আমার দুই মুগ্ধ চোখের ভিতর দিয়ে যেন একটি স্বর্ণময় মঙ্গলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। এই বাতাসে আকাশে এবং আলোকে প্রতিক্ষণে আমার মন ছেয়ে যেন নতুন পাতা গজিয়ে উঠ্‌চে—আমি নতুন প্রাণ এবং বলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌চি। সংসারের সমস্ত কাজ করা এবং লোকের সঙ্গে ব্যবহার করা আমার পক্ষে ভারি সহজ হয়ে পড়েচে। আসলে সবই সোজা—একটিমাত্র সিধে রাস্তা আছে। চোখ চেয়ে সেই রাস্তা ধরে গেলেই হল, নানারকম বুদ্ধিপূর্ব্বক short cut খোঁজবার দরকার দেখিনে—সুখ দুঃখ সকল রাস্তাতেই আছে কোন রাস্তা দিয়েই তাদের এড়িয়ে যাবার যো নেই, কিন্তু শান্তি কেবল এই বড় রাস্তাতেই আছে।

৬৫

শিলাইদহ,
৩রা ভাদ্র,
১৮৯২

এমন সুন্দর শরতের সকালবেলা! চোখের উপর যে কি সুধাবর্ষণ করচে সে আর কি বল্‌ব! তেমনি সুন্দর বাতাস দিচ্চে এবং পাখী ডাক্‌চে। এই ভরা নদীর ধারে বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবীর উপর শরতের সোনালি আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই নবযৌবনা ধরণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন্ এক জ্যোতির্ম্ময় দেবতার ভালবাসা চল্‌চে—তাই এই আলো এবং এই বাতাস, এই অর্দ্ধ উদাস অর্দ্ধ সুখের ভাব, গাছের পাতা এবং ধানের ক্ষেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম স্পন্দন,—জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্ম্মল নীলিমা। প্রেমের যেমন একটা গুণ আছে তার কাছে জগতের মহা মহা ঘটনাও তুচ্ছ মনে হয় এখানকার আকাশের মধ্যে তেমনি যে একটি ভাব ব্যাপ্ত হয়ে আছে তার কাছে কলকাতার দৌড়ধাপ হাঁসফাঁস ধড়ফড়ানি ঘড়ঘড়ানি ভারি ছোট এবং অত্যন্ত সুদূর মনে হয়। চারদিক থেকে আকাশ আলো বাতাস এবং গান একরকম মিলিতভাবে এসে আমাকে অত্যন্ত লঘু করে আপনাদের সঙ্গে যেন মিশিয়ে ফেল্‌চে—আমার সমস্ত মনটাকে কে যেন তুলিতে করে তুলে নিয়ে এই রঙীন শরৎপ্রকৃতির উপর আর এক পোঁচ রঙের মত মাখিয়ে দিচ্চে,—তাতে করে এই সমস্ত নীল সবুজ এবং সোনার উপর আর একটা যেন নেশার রং লেগে গেছে। বেশ লাগ্‌চে। "কি জানি পরাণ কি যে চায়" বল্‌তে লজ্জা বোধ হয় এবং সহরে থাক্‌লে বল্‌তুম না—কিন্তু ওটা ষোলো আনা কবিত্ব হলেও এখানে বল্‌তে দোষ নেই। অনেক পুরোণো শুক্‌নো কবিতা—কলকাতায় যাকে উপহাসানলে জ্বালিয়ে ফেলবার যোগ্য মনে হয় তারা এখানে আসবামাত্র দেখ্‌তে দেখ্‌তে মুকুলিত পল্লবিত হয়ে উঠে।

গোয়ালন্দের পথে,
২১ শে জুন,
১৮৯২,

আজ সমস্তদিন নদীর উপর ভেসে চলেছি। আশ্চর্য্য এই বোধ হচ্চে যে, কতবার এই রাস্তা দিয়ে গেছি এই বোটে চড়ে জলে জলে বেড়িয়েছি এবং নদীর দুইতীরের মাঝখান দিয়ে ভেসে যাবার যে একটা বিশেষ আনন্দ আছে সে উপভোগ করেছি—কিন্তু দিনদুই ডাঙায় বসে থাক্‌লে সেটা ঠিকটা আর মনে থাকে না। এইযে একলাটি চুপকরে বসে চেয়ে থাকা—দুইধারে গ্রাম ঘাট শস্যক্ষেত্র চর, বিচিত্র ছবি দেখা দিচ্চে এবং চলে যাচ্চে, আকাশে মেঘ ভাস্‌চে এবং সন্ধ্যের সময় নানারকম রং ফুট্‌ছে ;—নৌকো চলেছে, জেলেরা মাছধরচে, অহর্নিশি জলের একপ্রকার আদরপরিপূর্ণ তরল শব্দ শোনা যাচ্চে—সন্ধেবেলায় বিস্তৃত জলরাশি শ্রান্ত নিদ্রিত শিশুর মত একেবারে স্থির হয়ে যাচ্চে এবং উন্মুক্ত আকাশের সমস্ত তারা মাথার উপরে জেগে চেয়ে আছে—গভীররাত্রে যেদিন ঘুম নেই সেদিন উঠে বসে দেখি অন্ধকারাচ্ছন্ন দুই কূল নিদ্রিত, মাঝে মাঝে কেবল গ্রামের বনে শৃগাল ডাক্‌চে, এবং পদ্মার নীরব খরস্রোতে ঝুপ্‌ঝাপ করে পাড় খসে খসে পড়ছে—এই সমস্ত পরিবর্ত্তনশীল ছবি যেমন যেমন চখে পড়তে থাকে অমনি মনের ভিতরে একটা কল্পনার স্রোত বইতে থাকে এবং তার দুইপারে তটদৃশ্যের মত নব নব আকাঙ্ক্ষার চিত্র দেখা দিতে থাকে। হয়ত সম্মুখের দৃশ্যটা খুব একটা চমৎকার কিছু নয়—একটা হল্‌দে রকমের তৃণতরুশূন্য বালির চর ধূ ধূ করচে—তারি গায়ে একটা জনশূন্য নৌকো বাঁধা রয়েছে এবং আকাশের ছায়ায় ফিকে নীলবর্ণ নদী বয়ে চলে যাচ্চে—দেখে মনের ভিতরে কি রকম করে বল্‌তে পারিনে। বোধ হয় সেই ছেলেবেলায় যখন আরব্য উপন্যাস পড়তুম, সিন্ধবাদ নানা নূতন দেশে বাণিজ্য করতে বাহির হত, ভৃত্যশাসিত আমি তোষাখানার মধ্যে রুদ্ধ হয়ে বসে বসে দুপুর বেলায় সিন্ধবাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতুম তখন যে আকাঙ্ক্ষাটা মনের মধ্যে জন্মেছিল

সেটা যেন এখনো বেঁচে আছে, ঐ বালিচরে নৌকো বাঁধা দেখ্‌লে সেই যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ছেলেবেলায় যদি আরব্য উপন্যাস রবিন্‌সন্‌ ক্রুসো না পড়তুম, রূপকথা না শুন্‌তুম, তাহলে নিশ্চয় বল্‌তে পারি ঐ নদীতীর এবং মাঠের প্রান্তের দূর দৃশ্য দেখে ঠিক এমনভাব মনে উদয় হত না—সমস্ত পৃথিবীর চেহারা আমার পক্ষে আর এক রকম হয়ে যেত। এইটুকু মানুষের মনের ভিতরে বাস্তবিক কাল্পনিকে জড়িয়ে মড়িয়ে কি যে একটা জাল পাকিয়ে আছে! কিসের সঙ্গে যে কি গেঁথে গেছে—কত গল্পের সঙ্গে ছবির সঙ্গে ঘটনার সঙ্গে সামান্যের সঙ্গে বড়র সঙ্গে জড়িয়ে গিঁঠপড়ে আছে—প্রতিদিন অজ্ঞাতে জড়িয়ে যাচ্চে! একটা মানুষের একটা বৃহৎ জীবনের জাল খুল্‌তে পারলে কত ছোট এবং কত বড়র মিশল আলাদা করা যায়!

শিলাইদা,
২২শে জুন,
১৮৯২।

আজ খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছিলুম ঘাটে মেয়েরা উলু দিচ্চে। শুনে মনটা কেমন ঈষৎ বিকল হয়ে গেল—অথচ তার কারণ পাওয়া শক্ত। বোধ হয় এই রকমের একটা আনন্দধ্বনিতে হঠাৎ অনুভব করা যায় পৃথিবীতে একটা বৃহৎ কর্ম্মপ্রবাহ চল্‌চে যার অধিকাংশের সঙ্গেই আমার যোগ নেই—পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আমার কেউ নয় অথচ তাদের কত কাজকর্ম্ম সুখদুঃখ উৎসব আনন্দ চল্‌চে। কি বৃহৎ পৃথিবী! কি বিপুল মানবসংসার! কত সুদূর থেকে জীবনের ধ্বনি প্রবাহিত হয়ে আসে—সম্পূর্ণ অপরিচিত ঘরের একটুখানি বার্ত্তা পাওয়া যায়। মানুষ যখন বুঝতে পারে আমার কাছে আমি যত বড়ই হই আমাকে দিয়ে সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ করতে পারিনে—অধিকাংশ জগৎই আমার অজ্ঞাত অজ্ঞেয় অনাত্মীয় আমাহীন—তখন এই প্রকাণ্ড ঢিলে জগতের মধ্যে আপনাকে অত্যন্ত খাটো এবং একরকম পরিত্যক্ত এবং প্রান্তবর্ত্তী বলে মনে হয়—তখনি মনের মধ্যে এই রকমের একটা ব্যাপ্ত বিষাদের উদয় হয়। তা ছাড়া এই উলুধ্বনিতে নিজের অতীত ভবিষ্যৎ সমস্ত জীবনটা একটি অতি সুদীর্ঘ পথের মত চখের সমুখে উদয় হল এবং তারি এক একটি সুদূর ছায়াময় প্রান্ত থেকে এই উলুধ্বনি কানে এসে পৌঁছতে লাগল। এই রকম ভাবেত আজ দিনটা আরম্ভ করেছি। এখনি সদরনায়েব আমলাবর্গ এবং প্রজারা উপস্থিত হলে এই উলুধ্বনির প্রতিধ্বনিটুকু পাড়া ছেড়ে পালাবে—অতি ক্ষীণ ভূতভবিষ্যৎকে দুই কনুইদিয়ে ঠেলে ফেলে জোয়ান বর্ত্তমান নিজমূর্ত্তিধরে সেলামঠুকে এসে দাঁড়াবে।

———০———

৮০

সাজাদপুর

২৮শে জুন,

১৮৯২।

আজকের চিঠির মধ্যে একজায়গায় অ—র গানের একটুখানি উল্লেখ আছে। পড়ে মনটা কেমন হঠাৎ হুহু করে উঠ্‌ল। জীবনের অনেকগুলি ছোট ছোট উপেক্ষিত সুখ, যারা সহরের গোলমালের মধ্যে কোন আমল পায় না, বিদেশে এলে তারা সময় বুঝে হৃদয়ের কাছে আপন আপন দরখাস্ত পাঠিয়ে দেয়। আমি গানবাজনা এত ভালবাসি এবং সহরেও এত কণ্ঠ এবং বাদ্য আছে কিন্তু দিনের পর দিন চলে যায় এক দিনও কর্ণপাত করিনে। যদিও সব সময়ে বুঝতে পারিনে কিন্তু মনের ভিতরটা কি তৃষিত হয়ে থাকে না? আজকের চিঠি পড়বামাত্রই অ—র মিষ্টিগান শোনবার জন্যে আমার এমনি ইচ্ছা করে উঠ্‌ল যে তখনি বুঝতে পারলুম প্রকৃতির অনেকগুলি ক্রন্দনের মধ্যে এও একটা ক্রন্দন ভিতরে ভিতরে চাপা ছিল। বড় বড় দুরাশার মোহে জীবনের ছোট ছোট আনন্দগুলিকে উপেক্ষা করে আমাদের জীবনকে কি উপবাসী করেই রাখি! যখন বিলেতে যাচ্ছিলুম আমার একটা কল্পনার সুখের ছবি এই ছিল যে কেউ একজন পিয়ানো বাজাচ্চে, খোলা দরজা জানলার ভিতর দিয়ে আলো এবং বাতাস আস্‌চে, খানিকটা সুদূর আকাশ ও গাছপালা দেখা যাচ্চে,—আমি একটা খোলা জানলার কাছে কৌচের উপর পড়ে বাইরে চোখ রেখে শুনচি। এটা যে একটা দুর্লভ দুরাশা তা বল্‌তে পারিনে কিন্তু তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে ক'দিন অদৃষ্টে এ সুখ পাওয়া যায়! এই সমস্ত সুলভ আনন্দের অপরিতৃপ্তি জীবনের হিসাবে প্রতিদিন বেড়ে উঠ্‌চে —এর পরে এমন একটা দিন আসতেও পারে যখন মনে হবে যদি আবার জীবনটা সমস্তটা ফিরে পাই তাহলে আর কিছু অসাধ্য সাধন করতে চাইনে কেবল জীবনের এই প্রতিদিনের অযাচিত ছোট ছোট আনন্দগুলি প্রতিদিন উপভোগ করে নিই।

সাজাদপুর
২৭শে জুন,
১৮৯২।

কাল বিকেলের দিকে এমনি করে এল আমার ভয় হল। এমনতর রাগী চেহারার মেঘ আমি কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। গাঢ় নীল মেঘ দিগন্তের কাছে একেবারে থাকে থাকে ফুলে উঠেছে, একটা প্রকাণ্ড হিংস্র দৈত্যের রোষস্ফীত গোঁফজোড়াটার মত। এই ঘন নীলের ঠিক পাশেই দিগন্তের সব শেষে ছিন্ন মেঘের ভিতর থেকে একটা টক্‌টকে রক্তবর্ণ আভা বেরচ্চে—একটা আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড অলৌকিক "বাইসন" মোষ যেন ক্ষেপে উঠে রাঙা চোখ দুটো পাকিয়ে ঘাড়ের নীল কেশরগুলো ফুলিয়ে বক্রভাবে মাথাটা নীচু করে দাঁড়িয়েছে—এখনি পৃথিবীকে শৃঙ্গাঘাত করতে আরম্ভ করে দেবে এবং এই আসন্ন সঙ্কটের সময় পৃথিবীর সমস্ত শস্যক্ষেত এবং গাছের পাতা হী হী করচে, জলের উপরিভাগ শিউরে শিউরে উঠ্‌চে, কাকগুলো অশান্তভাবে উড়ে উড়ে কা কা করে ডাক্‌চে।

—*—

৬০

সাজাদপুর
২৯শে জুন,
১৮৯২।

কালকের চিঠিতে লিখেছিলুম আজ অপরাহ্ণ সাতটার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজ্‌মেন্ট্‌ করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে বইখানি হাতে যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্ত্তে এখানকার পোষ্টমাষ্টার এসে উপস্থিত। মৃত কবির চেয়ে একজন জীবিত পোষ্টমাষ্টারের দাবী ঢের বেশি। আমি তাঁকে বল্‌তে পারলুম না—আপনি এখন যান, কালিদাসের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে—বল্লেও সে লোকটি ভাল বুঝতে পারতেন না। অতএব পোষ্টমাষ্টারকে চৌকিটি ছেড়ে দিয়ে কালিদাসকে আস্তে আস্তে বিদায় নিতে হল। এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোষ্ট অপিস্‌ ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখ্‌তে পেতুম তখনি আমি একদিন দুপুরবেলায় এই দোতালায় বসে সেই পোষ্টমাষ্টারের গল্পটি লিখেছিলুম এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরল তখন আমাদের পোষ্টমাষ্টার বাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাই হোক্‌ এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানারকম গল্প করে যান আমি চুপ করে বসে শুনি। ওরি মধ্যে ওঁর আবার বেশ একটু হাস্যরসও আছে।

পোষ্টমাষ্টার চলে গেলে সেই রাত্রে আবার রঘুবংশ নিয়ে পড়লুম। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর পড়ছিলুম। সভায় সিংহাসনের উপর সারিসারি সুসজ্জিত সুন্দর চেহারা রাজারা বসে গেছেন—এমন সময় শঙ্খ এবং তুরীধ্বনির মধ্যে বিবাহবেশ পরে সুনন্দার হাত ধরে ইন্দুমতী তাঁদের মাঝখানের সভাপথে এসে দাঁড়ালেন। ছবিটি মনে করতে এমনি সুন্দর লাগে! তার পরে সুনন্দা এক এক জনের পরিচয় করিয়ে দিচ্চে আর ইন্দুমতী অনুরাগহীন এক একটি প্রণাম করে চলে যাচ্চেন। এই প্রণাম করাটি

কেমন সুন্দর! যাকে ত্যাগ করচেন তাকে যে নম্রভাবে সম্মান করে যাচ্চেন এতে কতটা মানিয়ে যাচ্চে! সকলেই রাজা, সকলেই তার চেয়ে বয়সে বড়, ইন্দুমতী একটি বালিকা, সে যে তাঁদের একে একে অতিক্রম করে যাচ্চে এই অবশ্যরূঢ়তাটুকু যদি একটি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত তাহলে এই দৃশ্যের সৌন্দর্য্য থাকৃত না।

৮১

সাজাদপুর,
৩রা জুলাই।
১৮৯২।

কালরাত্রে আমি বেশ একটা নতুন রকমের স্বপ্ন দেখেছি। যেন কোথায় এক জায়গায় লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর এসেছেন এবং তাঁর অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে উৎসব হচ্চে। অন্যান্য নানারকম আমোদের মধ্যে একটা তাম্বুতে একজন বিখ্যাত বুড়ো গাইয়ে গান গাচ্চে। গাইয়ে একটা বড়রকম ইমনকল্যাণ গাচ্ছিল। গাইতে গাইতে হঠাৎ এক জায়গায় সে ভুলে গেল। দুবার সেটা ফিরে ফিরে মনে করবার চেষ্টা করলে—তারপর তৃতীয় বারের বার নিরাশ হয়ে গানের কথাগুলো ছেড়ে দিয়ে অমনি কেবল সুরটা ভেঁজে যেতে যেতে হঠাৎ সেই সুরটা কেমন করে কান্নায় পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল—সবাই মনে করছিল সে গান গাচ্চে, হঠাৎ দেখে সে কান্না। তার কান্না শুনে বড়দাদা "আহা আহা" করে উঠ্‌লেন। একজন প্রকৃত গুণীর মনে এরকম ঘটনায় কতখানি আঘাত লাগ্‌তে পারে তিনি যেন সেটা পরিষ্কার বুঝ্‌তে পারলেন। তারপরে নানারকম অসংলগ্ন হিজিবিজি কি হল এবং বাংলা মুল্লুকের লেপ্‌টনাণ্ট গবর্ণর যে কোথায় উড়ে গেলেন তার কিছুই মনে নেই।

৮২

শিলাইদা

২০শে জুলাই, ১৮৯২।

আজ এইমাত্র প্রাণটা যাবার যো হয়েছিল। পান্‌টি থেকে শিলাইদা যাচ্ছিলুম, বেশ পাল পেয়েছিলুম, খুব হুহুঃ শব্দে চলে আসছিলুম। বর্ষার নদী চারদিকে থই থই করচে এবং হৈ হৈ শব্দে ঢেউ উঠ্‌চে আমি মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখ্‌চি এবং মাঝে মাঝে লেখা পড়া করচি। বেলা সাড়ে দশটার সময় গড়ই নদীর ব্রিজ দেখা গেল। বোটের মাস্তুল ব্রিজে বাধবে কিনা তাই নিয়ে মাঝিদের মধ্যে তর্ক পড়ে গেল—ইতিমধ্যে বোট ব্রিজের অভিমুখে চলেছে। মাঝিদের আশা ছিল যে, আমরা স্রোতের বিপরীতমুখে যখন চলেছি তখন ভাবনা নেই—কারণ ব্রিজের কাছাকাছি এসেও যদি দেখা যায় যে মাস্তুল বাধবে তখনই পাল নাবিয়ে দিলে বোট স্রোতে পিছিয়ে যাবে। কিন্তু ব্রিজের কাছে এসে আবিষ্কার করা গেল মাস্তুল ঠেক্‌বে এবং সেখানে একটা আওড় (আবর্ত্ত) আছে। সেই আওড় থাকাতে সেখানে স্রোতের গতি বিপরীত মুখে হয়েছে। তখন বোঝা গেল সামনে একটি বিপদ উপস্থিত কিন্তু বেশিক্ষণ চিন্তা করবার সময় ছিল না—দেখ্‌তে দেখ্‌তে বোট ব্রিজের উপর গিয়ে পড়ল। মাস্তুল মড়মড় করে ক্রমেই কাত হতে লাগল—আমি হতবুদ্ধি মাল্লাদের ক্রমাগত বলচি তোরা ওখান থেকে সর, মাথায় মাস্তুল ভেঙে মরবি না কি। এমন সময় আর একটা নৌকো তাড়াতাড়ি দাঁড় বেয়ে এসে আমাকে তুলে নিলে এবং রসি নিয়ে আমার বোটটাকে টান্‌তে লাগল—তপ্‌সি এবং আর একজন মাল্লা রসি দাঁতে কামড়ে সাঁৎরে ডাঙায় উঠে টান্‌তে লাগল—সেখানে আরো অনেক লোক জমা হয়ে বোট টেনে তুল্‌লে। সকলে ডাঙায় ভিড়করে এসে বল্লে আল্লা বাঁচিয়ে দিয়েছেন নইলে বাঁচবার কোনো কথা ছিল না। সমস্তই জড় পদার্থের কাণ্ড কিনা—আমরা হাজার কাতর হই, চেঁচাই, লোহাতে যখন কাঠ ঠেক্‌ল এবং নীচের থেকে যখন জল ঠেল্‌তে লাগ্‌ল, তখন যা হবার তা হবেই,—জলও এক মুহূর্ত্ত থামল না, মাস্তুলও একচুল মাথা নীচু করল না, লোহার ব্রিজও যেমন তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

শিলাইদা,
২১শে জুলাই,
১৮৯২।

কাল বিকেলে শিলাইদহে পৌঁছেছিলুম আজ সকালে আবার পাবনায় চলেছি। নদীর যে রোখ্! যেন লেজ-দোলানো কেশর-ফোলানো তাজা বুনো ঘোড়ার মত। গতিগর্ব্বে ঢেউতুলে ফুলে ফুলে চলেছে—এই খ্যাপা নদীর উপর চড়ে আমরা দুলতে দুলতে চলেচি। এর মধ্যে ভারি একটা উল্লাস আছে। এই ভরা নদীর যে কলরব সে আর কি বল্‌ব! ছল্‌ছল্ খল্‌খল্ করে কিছুতে যেন আর ক্ষান্ত হতে পারচেনা, ভারি একটা যৌবনের মত্ততার ভাব। এ তবু গড়ই নদী—এখান থেকে আবার পদ্মায় গিয়ে পড়তে হবে—তার বোধ হয় আর কূলকিনারা দেখবার যো নেই—সে মেয়ে বোধ হয় একেবারে উন্মাদ হয়ে ক্ষেপে নেচে বেরিয়ে চলেছে, সে আর কিছুর মধ্যেই থাক্‌তে চায় না। তাকে মনে করলে আমার কালীর মূর্ত্তি মনে হয়—নৃত্য করচে, ভাঙচে, এবং চুল এলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। মাঝিরা বলছিল নূতন বর্ষায় পদ্মার খুব "ধার" হয়েছে। ধার কথাটা ঠিক। তীব্রস্রোত যেন চক্‌চকে খড়্গের মত—পাৎলা ইস্পাতের মত একেবারে কেটে চলে যায়—প্রাচীন বিটনদের যুদ্ধরথের চাকায় যেমন কুঠার বাঁধা—দুইধারের তীর একেবারে অবহেলে ছারখার করে দিয়ে চলেচে।

কাল যে কাণ্ডটি হয়েছিল সে কিছু গুরুতর বটে। কাল যমরাজের সঙ্গে একরকম হাউ-ড্যু-ডু করে আসা গেছে। মৃত্যু যে ঠিক আমাদের নেক্সট্-ডোর-নেবার, তা এরকম ঘটনা না হলে সহজে মনে হয় না। হয়েও বড় মনে পড়ে না। কাল চকিতের মত যাঁর আভাস পাওয়া গিয়েছিল আজ তাঁর মূর্ত্তিখানা কিছুই স্মরণ হচ্চে না। অপ্রিয় অনাবশ্যক বন্ধুর মত একেবারে অনাহূত ঘাড়ে এসে না পড়লে তাঁর বিষয়ে আমরা বড় একটা ভাবিনে। যদিও তিনি আড়াল থেকে আমাদের সর্ব্বদাই খোঁজ খবর নিয়ে

থাকেন। যা হোক্ তাঁকে আমি বহুত বহুত সেলাম দিয়ে জানিয়ে রাখ্‌চি তাঁকে আমি এক কানা কড়ির কেয়ার করিনে—তা তিনি জলেই ঢেউ তুলুন আর আকাশ থেকে ফুঁ-ই দিন—আমি আমার পাল তুলে চল্লুম—তিনি যতদূর করতে পারেন তা পৃথিবীসুদ্ধ সকলেরই জানা আছে, তার বেশি আর কি করবেন! যেম্‌নি হোক্, হাঁউমাউ করব না!

শিলাইদা,

২০শে অগষ্ট, ১৮৯২।

রোজ সকালে চোখ চেয়েই আমার বাঁ দিকে জল এবং ডানদিকে নদীতীর সূর্য্যকিরণে প্লাবিত দেখতে পাই। অনেক সময়ে ছবি দেখলে যে মনে হয় আহা এইখানে যদি থাকতুম, ঠিক সেই ইচ্ছাটা এখানে পরিতৃপ্ত হয়—মনে হয়, একটি জাজ্বল্যমান ছবির মধ্যে আমি বাস করচি—বাস্তব জগতের কোনো কঠিনতাই এখানে যেন নেই। ছেলেবেলায় রবিন্‌সন্‌ক্রুসো, পৌলবর্জ্জিনি প্রভৃতি বই থেকে গাছপালা সমুদ্রের ছবি দেখে মন ভারি উদাসীন হয়ে যেত—এখানকার রৌদ্রে আমার সেই ছবিদেখার বাল্যস্মৃতি ভারি জেগে ওঠে—এর যে কি মানে ঠিক ধরতে পারিনে—এর সঙ্গে যে কি একটা আকাঙ্ক্ষা জড়িত আছে ঠিক বুঝতে পারিনে। এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্য্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত—আমি কত দূর দূরান্তর কত দেশদেশান্তরের জলস্থলপর্ব্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎসূর্য্যালোকে আমার বৃহৎ সর্ব্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্দ্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্য্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্চে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌চে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপচে। এই পৃথিবীর উপর আমার যে একটি আন্তরিক আত্মীয়বৎসলতার ভাব আছে, ইচ্ছা করে সেটা ভালকরে প্রকাশ করতে—কিন্তু ওটা বোধ হয় অনেকেই ঠিকটি বুঝতে পারবে না, কি একটা কিম্ভূত রকমের মনে করবে।

৮৫

বোয়ালিয়া

১৮ই নবেম্বর,

১৮৯২।

ভাবছিলুম এতক্ষণে রেলগাড়ি না জানি কোথায় গিয়ে পৌঁছল। এই সময়টা সকালবেলায় নওয়াড়ির কাছে উঁচুনীচু প্রস্তরকঠিন তরুবিরল পৃথিবীর উপর সূর্য্যোদয় হয়। বোধ হয় নবীন রৌদ্রে এতক্ষণে চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে আকাশপটে নীল পর্ব্বতের আভাস দেখা যাচ্ছে; শস্যক্ষেত্র বড় একটা নেই; দৈবাৎ দুই এক জায়গায় সেখানকার বুনো চাষারা মহিষ নিয়ে চাষ আরম্ভ করেছে; দুইধারে বিদীর্ণ পৃথিবী, কালো কালো পাথর, শুক্‌নো জলস্রোতের নুড়িছড়ানো পদচিহ্ন, ছোট ছোট অপরিণত শালগাছ, এবং টেলিগ্রাফের তারের উপর কালো লেজ ঝোলানো চঞ্চল ফিঙে পাখী। একটা যেন বৃহৎ বন্য প্রকৃতি পোষ মেনে একটি জ্যোতির্ম্ময় নবীন দেবশিশুর উজ্জ্বল কোমল করস্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করে শান্ত স্থির ভাবে শুয়ে পড়ে আছে। কি রকম ছবিটা আমার মনে আসে বল্‌ব? কালিদাসের শকুন্তলায় আছে দুষ্মন্তের ছেলে শিশু ভরত একটা সিংহশাবক নিয়ে খেলা করত। সে যেন একদিন পশুবৎসলভাবে সিংহশাবকের বড় বড় রোঁয়ার মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে আপনার শুভ্রকোমল অঙ্গুলিগুলি চালনা করচে, আর বৃহৎ জন্তুটা স্থির হয়ে পড়ে আছে, এবং মাঝে মাঝে সস্নেহে একান্ত নির্ভরের ভাবে আপনার মানববন্ধুর প্রতি আড়চক্ষে চেয়ে দেখচে। আর ঐ যে শুক্‌নো স্রোতের নুড়িছড়ানো পথের কথা বল্লুম ওতে আমার কি মনে পড়ে বল্‌ব? বিলাতি রূপকথায় পড়া যায় বিমাতা যখন তার সতীনের ছেলেমেয়েকে ঘর থেকে তাড়িয়ে ছল করে একটা অচেনা অরণ্যের মধ্যে পাঠিয়ে দিলে তখন দুই ভাইবোনে বনের ভিতর চল্‌তে চল্‌তে বুদ্ধিপূর্ব্বক একটা একটা নুড়ি ফেলে আপনাদের পথ চিহ্নিত করে গিয়েছিল। ছোট ছোট স্রোতগুলি যেন সেইরকম ছোট ছোট ছেলেমেয়ে; তারা খুব তরুণ শৈশবে এই অচেনা বৃহৎ পৃথিবীর মধ্যে বেরিয়ে

পড়ে; তাই চল্‌তে চল্‌তে আপনাদের ছোট ছোট পথের উপর নুড়ি ছড়িয়ে রেখে যায়—আবার যদি ফিরে আসে আপনার এই গৃহপথটি ফিরে পাবে। কিন্তু ফিরে আসা আর ঘটবে না।

—*—

নাটোর,

২রা ডিসেম্বর।

কাল ম—র ওখানে গিয়েছিলুম। বিকেলে সকলে মিলে বেড়াতে গেলুম। দুইধারে মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা আমার বেশ লেগেছিল। বাংলাদেশের ধু ধু জনহীন মাঠ এবং তার প্রান্তবর্ত্তী গাছপালার মধ্যে সূর্য্যাস্ত—কি একটি বিশাল শান্তি এবং কোমল করুণা! আমাদের এই আপনাদের পৃথিবীর সঙ্গে আর ঐ বহুদূরবর্ত্তী আকাশের সঙ্গে কি একটি স্নেহভারবিনত মৌন ম্লান মিলন! অনন্তের মধ্যে যে একটি প্রকাণ্ড চিরবিরহ-বিষাদ আছে সে এই সন্ধ্যেবেলাকার পরিত্যক্তা পৃথিবীর উপরে কি একটি উদাস আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ করে দেয়, - সমস্ত জলে স্থলে আকাশে কি একটি ভাষাপরিপূর্ণ নীরবতা! অনেকক্ষণ চুপ করে অনিমেষ নেত্রে চেয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনে হয়, যদি এই চরাচর ব্যাপ্ত নীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে, সহসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায় তাহলে কি একটা গভীর গম্ভীর শান্তসুন্দর সকরুণ সঙ্গীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত বেজে ওঠে! আসলে তাই হচ্চে। আমরা একটু নিবিষ্টচিত্তে স্থির হয়ে চেষ্টা করলে জগতের সমস্ত সম্মিলিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্ম্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সঙ্গীতে তর্জ্জমা করে নিতে পারি। এই জগৎব্যাপী দৃশ্যপ্রবাহের অবিশ্রাম কম্পনধ্বনিকে কেবল একবার চোখবুজে মনের কান দিয়ে শুনতে হয়। কিন্তু আমি এই সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্তের কথা কতবার লিখ্‌ব! নিত্য নূতন করে অনুভব করা যায় কিন্তু নিত্য নূতন করে প্রকাশ করি কি করে!

শিলাইদহ,

৯ই ডিসেম্বর।

এখন একলাটি আমার সেই বোটের জান্‌লার কাছে অধিষ্ঠিত হয়ে বহুদিন পরে একটু মনের শান্তি পেয়েছি। স্রোতের অনুকূলে বোট চল্‌চে, তার উপর পাল পেয়েচে—দুপুরবেলাকার রোদ্দুরে শীতের দিনটা ঈষৎ তেতে উঠেছে, পদ্মায় নৌকো নেই—শূন্য বালির চর, হল্‌দে রং, একদিকে নদীর নীল আর একদিকে আকাশের নীলের মাঝে একটি রেখার মত আঁকা রয়েচে—জল কেবল উত্তরে বাতাসে খুব অল্প অল্প চিক্ চিক্ করে কাঁপচে, ঢেউ নেই। আমি এই খোলা জান্‌লার ধারে হেলান দিয়ে বসে আছি; আমার মাথায় অল্প অল্প বাতাস লাগ্‌চে বেশ আরাম করচে। অনেকদিন তীব্র রোগভোগের পর শরীরটা শিথিল দুর্ব্বল অবস্থায় আছে, এইরকম সময় প্রকৃতির এই ধীর স্নিগ্ধ শুশ্রূষা ভারি মধুর লাগ্‌চে—এই শীতশীর্ণ নদীর মত আমার সমস্ত অস্তিত্ব যেন মৃদু রৌদ্রে পড়ে অলসভাবে ঝিক্ ঝিক্ করচে, এবং যেন অর্দ্ধেক আনমনে চিঠি লিখে যাচ্চি। প্রতিবার এই পদ্মার উপর আস্‌বার আগে ভয় হয় আমার পদ্মা বোধ হয় পুরোণো হয়ে গেছে—কিন্তু যখনি বোট ভাসিয়ে দিই, চারিদিকে জল কুল কুল করে উঠে—চারিদিকে একটা স্পন্দন কম্পন আলোক আকাশ মৃদু কলধ্বনি, একটা সুকোমল নীল বিস্তার, একটি সুনবীন শ্যামল রেখা, বর্ণ এবং নৃত্য এবং সঙ্গীত এবং সৌন্দর্য্যের একটি নিত্য উৎসব উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায় তখন আবার নতুন করে আমার হৃদয় যেন অভিভূত হয়ে যায়। এই পৃথিবীটি আমার অনেকদিন-কার এবং অনেক জন্মকার ভালবাসার লোকের মত আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্ব্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা করচেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম।

তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলচে, এবং অবোধ মাতার মত আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলচে—তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্য্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মত একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নব পল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মত স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন "একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল" পরে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন; আমি তাঁর পায়ের কাছে কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়চি—অনেক ছেলের বহুসন্তানবতী মা যেমন অর্দ্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না—তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুরবেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাবচেন আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করচেন না, আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকে যাচ্চি। এইভাবে একরকম কেটে যাচ্চে। প্রায় বিকেল হয়ে এল। এখন শীতের বেলা কি না, দেখতে দেখতে রোদ্দুর পড়ে যায়।

—•—

কটক

ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩।

আমি ত বলি যতদিন না আমরা একটা কিছু করে তুল্‌তে পারব ততদিন আমাদের অজ্ঞাতবাস ভাল। কেননা আমরা যখন সত্যই অবমাননার যোগ্য তখন কিসের দোহাই দিয়ে পরের কাছে আত্মসম্মান রক্ষা করব? পৃথিবীর মধ্যে যখন আমাদের একটা কোনো প্রতিষ্ঠাভূমি হবে, পৃথিবীর কাজে যখন আমাদের একটা কোনো হাত থাক্‌বে, তখন আমরা ওদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কইতে পারব। ততদিন লুকিয়ে থেকে চুপ মেরে আপনার কাজ করে যাওয়াই ভাল। দেশের লোকের ঠিক এর উল্টো ধারণা। যা কিছু ভিতরকার কাজ, যা গোপনে থেকে করতে হবে সে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে, যেটা নিতান্ত অস্থায়ী আস্ফালন এবং আড়ম্বরমাত্র সেইটেতেই তাদের যত ঝোঁক। আমাদের এ বড় হতভাগা দেশ। এখানে মনের মধ্যে কাজ করবার বল রাখা বড় শক্ত। যথার্থ সাহায্য করবার লোক কেউ নেই। যার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে প্রাণ সঞ্চয় করা যায় এমন মানুষ দশবিশ ক্রোশের মধ্যে একটি পাওয়া যায় না। কেউ চিন্তা করে না, অনুভব করে না, কাজ করে না; বৃহৎ কার্য্যের, যথার্থ জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা কারো নেই, বেশ একটি পরিণত মনুষ্যত্ব কোথাও পাওয়া যায় না। সমস্ত মানুষগুলো যেন উপছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্চে। খাচ্চেদাচ্চে, আপিস যাচ্চে, ঘুমচ্চে, তামাক টানচে, আর নিতান্ত নির্ব্বোধের মত বকর বকর বকচে। যখন ভাবের কথা বলে তখন সেণ্টিমেণ্টাল্ হয়ে পড়ে, আর যখন যুক্তির কথা পাড়ে তখন ছেলেমানুষী করে। যথার্থ মানুষের সংস্রব পাবার জন্যে মানুষের মনে ভারি একটা তৃষ্ণা থাকে। কিন্তু সত্যকার রক্তমাংসের শক্তসমর্থ মানুষ ত নেই—সমস্ত উপছায়া, পৃথিবীর সঙ্গে অসংলগ্নভাবে বাষ্পের মত ভাস্‌চে।

—*—

বালিয়া; মঙ্গলবার ;
ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩।

আমার কিন্তু আর ভ্রমণ করতে ইচ্ছে করচে না। ভারি ইচ্ছে করচে একটি কোণের মধ্যে আড্ডা করে একটু নিরিবিলি হয়ে বসি। ভারতবর্ষের দুটি অংশ আছে, এক অংশ গৃহস্থ, আর এক অংশ সন্ন্যাসী, কেউ বা ঘরের কোণে থেকে নড়ে না, কেউ বা একেবারে গৃহহীন। আমার মধ্যে ভারতবর্ষের সেই দুই ভাগই আছে। ঘরের কোণও আমাকে টানে, ঘরের বাহিরও আমাকে আহ্বান করে। খুব ভ্রমণ করে দেখে বেড়াব ইচ্ছে করে, আবার উদ্‌ভ্রান্ত শ্রান্ত মন একটি নীড়ের জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে। পাখীর মত ভাব আর কি! থাকবার জন্যে যেমন ছোট্ট নীড়টি, ওড়বার জন্যে তেমনি মস্ত আকাশ। আমি যে কোণটি ভালবাসি সে কেবল মনকে শান্ত করবার জন্যে। আমার মনটা ভিতরে ভিতরে এমনি অশ্রান্তভাবে কাজ করতে চায়, লোকজনের ভিড়ের মধ্যে তার কর্ম্মোদ্যম এমনি পদে পদে প্রতিহত হতে থাকে যে সে অস্থির হয়ে ওঠে, খাঁচার ভিতর থেকে আমাকে কেবলি যেন আঘাত করে। একটু নিরালা পেলে সে বেশ সাধ মিটিয়ে ভাবতে পারে, চারিদিকে চেয়ে দেখতে পারে, ভাবগুলিকে মনের মত করে প্রকাশ করতে পারে। দিবারাত্রি সে অখণ্ড অবসর চায়—সৃষ্টিকর্ত্তা আপনার সৃষ্টির মধ্যে যেমন একাকী সে আপনার ভাবরাজ্যের মধ্যখানে তেমনি একলা বিরাজ করতে চায়।

কটক

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩।

এখানকার একটা উৎকট ইংরেজ—প্রকাণ্ড নাক, ধূর্ত্ত চোখ, দেড়হাত চিবুক, গোঁফদাড়ি কামানো, মোটা গলা, একটা পূর্ণপরিণত জনবুষ। গবর্মেণ্ট আমাদের দেশের জুরিপ্রথার উপর হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিল বলে চারদিকে একটা আপত্তি উঠেছে। লোকটা জোর করে সেই বিষয়ে কথা তুলে—বাবুর সঙ্গে তর্ক করতে লাগ্‌ল। বল্লে এদেশের moral standard low এখানকার লোকের life-এর sacredness সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস নেই, এরা জুরি হবার যোগ্য নয়। একজন বাঙালীর নিমন্ত্রণে এসে বাঙালীর মধ্যে বসে যারা এরকম করে বল্‌তে কুণ্ঠিত হয় না, তারা আমাদের কি চক্ষে দেখে! খাবার টেবিল থেকে যখন ড্রয়িংরুমের এক কোণে এসে বস্‌লুম আমার চোখে সমস্ত ছায়ার মত ঠেকছিল। আমি যেন আমার চোখের সাম্‌নে সমস্ত বৃহৎ ভারতবর্ষ বিস্তৃত দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম—আমাদের এই গৌরবহীন বিষণ্ণ জন্মভূমির ঠিক শিয়রের কাছে আমি যেন বসেছিলুম,—এমন একটা বিপুল বিষাদ আমার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল সে আর কি বল্‌ব! অথচ চোখের সাম্‌নে ঈভনিং ড্রেসপরা মেমসাহেব, এবং কানের কাছে ইংরেজি হাস্যালাপের গুঞ্জনধ্বনি—সবসুদ্ধ এম্‌নি অসঙ্গত। আমাদের চিরকালের ভারতবর্ষ আমার কাছে কতখানি সত্য—আর এই ডিনার টেবিলের বিলিতি মিষ্টহাসি, ইংরিজি শিষ্টালাপ আমাদের পক্ষে কত ফাঁকা, কত ফাঁকি!

৭৯

পুরী,

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩।

তাঁর কবিতা যে খারাপ তা নয়, কেবল চলনসই মাত্র। কেউ কেউ যেমন প্রথম শ্রেণীতে পাস করে কেউ কেউ তেমনি প্রথম শ্রেণীতে ফেল্ করে। কিন্তু যারা পাস করে তাদেরই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হয় যারা ফেল্ করে তারা সবাই একদলের মধ্যে পড়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যেমন অনেক ভাল ছেলে অঙ্কে ফেল্, তেমনি কাব্যে যারা ফেল্ তারা অনেকেই সঙ্গীতে ফেল্। তাদের ভাব আছে, কথা আছে, রকমসকম আছে, আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই কেবল সেই সঙ্গীতটি নেই যাতে মুহূর্ত্তে সমস্তটি কবিতা হয়ে ওঠে। সেইটেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া ভারি শক্ত। কাঠও আছে, ফুঁও আছে, কেবল সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গটুকুমাত্র নেই যাতে সবটা ধরে উঠে আগুন হয়ে ওঠে। এর মধ্যে কাঠের বোঝাটা নানা স্থান থেকে পরিশ্রমপূর্ব্বক সংগ্রহ করে আনা যায় কিন্তু সেই অগ্নিকণাটুকু নিজের অন্তরের মধ্যে আছে—সেটুকু না থাক্‌লে পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপ ব্যর্থ হয়ে যায়।

পুরী,

১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩।

কারো কারো মন ফোটোগ্রাফের wet plate-এর মত; যে ছবিটা ওঠে সেটাকে তখনি ফুটিয়ে কাগজে না ছাপিয়ে নিলে নষ্ট হয়ে যায়। আমার মন সেই জাতের। যখন যে কোনো ছবি দেখি অমনি মনে করি এটা চিঠিতে ভাল করে লিখ্‌তে হবে। কটক থেকে পুরী পর্য্যন্ত এলুম, এই ভ্রমণের কত কি বর্ণনা করবার আছে তার ঠিক নেই। যেদিন যা দেখ্‌চি সেইদিনই সেইগুলো লেখবার যদি সময় পেতুম তাহলে ছবি বেশ ফুটে উঠ্‌তে পারত—কিন্তু মাঝে দুই একদিন গোলেমালে কেটে গেল—ইতিমধ্যে ছবির খুঁটিনাটি রেখাগুলি অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তার একটা প্রধান কারণ, পুরীতে এসে পৌঁছে সাম্‌নে অহর্নিশি সমুদ্র দেখছি, সেই আমার সমস্ত মন হরণ করেছে, আমাদের দীর্ঘ ভ্রমণপথের দিকে পশ্চাৎ ফিরে চাইবার আর অবসর পাওয়া যাচ্চে না।

শনিবার মধ্যাহ্নে আহারাদি করে বলু আমি বি—বাবু, একটি ভাড়াটে ফিট্‌ন্‌ গাড়িতে আমাদের কম্বল বিছানা পেতে তিনটি পিঠের কাছে তিন বালিশ রেখে কোচ-বাক্সে একটি চাপরাশি চড়িয়ে যাত্রা আরম্ভ করে দিলুম।

কাঠযুড়ি পেরিয়ে আমাদের পথ। সেখানে গাড়ি থেকে নেবে আমাদের পাল্কিতে উঠ্‌তে হল। ধূসর বালুকা ধূ ধূ করচে। ইংরেজিতে এ'কে যে নদীর বিছানা বলে—বিছানাই বটে। সকালবেলাকার পরিত্যক্ত বিছানার মত—নদীর স্রোত যেখানে যেমন পাশ ফিরেছিল, যেখানে যেমন তার ভার দিয়েছিল, তার বালুশয্যায় সেখানে তেমনি উঁচু নীচু হয়ে আছে—সেই বিশৃঙ্খল শয়ন কেউ আর যত্ন করে হাত দিয়ে সমান করে বিছিয়ে রাখেনি। এই বিস্তীর্ণ বালির ওপারে একটি প্রান্তে একটুখানি শীর্ণ স্ফটিকস্বচ্ছ জল ক্ষীণ স্রোতে বয়ে চলে যাচ্চে। কালিদাসের মেঘদূতে বিরহিণীর বর্ণনায় আছে যে, যক্ষপত্নী বিরহশয়নের একটি প্রান্তে লীন হযে আছে—যেন পূর্ব্বদিকের শেষ সীমায়

কৃষ্ণপক্ষের কৃশতম চাঁদটুকুর মত। বর্ষাশেষের এই নদীটুকু দেখে বিরহিণীর যেন আর একটি উপমা পাওয়া গেল।

কটক থেকে পুরী পর্য্যন্ত পথটি খুব ভাল। পথ উচ্চে, তার দুইধারে নিম্নক্ষেত্র। বড় বড় গাছে ছায়াময়। অধিকাংশ আমগাছ। এই সময়ে সমস্ত আমগাছে মুকুল ধরেছে, গন্ধে পথ আকুল হয়ে আছে। আম অশ্বত্থ বট নারিকেল এবং খেজুর গাছে ঘেরা এক একটি গ্রাম দেখা যাচ্চে। কোথাও বা স্বল্পজলা নদীর তীরে ছাপরওয়ালা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে; গোলপাতার ছাউনির নীচে মেঠাইয়ের দোকান বসেছে; পথের ধারে গাছের তলায় এবং শ্রেণীবদ্ধ কুঁড়ে ঘরের মধ্যে যাত্রীরা খাওয়াদাওয়া করচে; ভিক্ষুকের দল নতুন যাত্রী ও গাড়ি পাল্কি দেখবামাত্র বিচিত্র কণ্ঠে ও ভাষায় আর্ত্তনাদ করতে আরম্ভ করেছে।

যত পুরীর নিকটবর্ত্তী হচ্চি তত পথের মধ্যে যাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখ্‌তে পাচ্চি। ঢাকা গরুর গাড়ি সারি সারি চলেছে। রাস্তার ধারে, গাছের তলায়, পুকুরের পাড়ে লোক শুয়ে আছে, রাঁধচে, জটলা করে রয়েছে। মাঝে মাঝে মন্দির, পান্থশালা, বড় বড় পুষ্করিণী। পথের ডানদিকে একটা খুব মস্ত বিলের মত—তার ওপারে পশ্চিমে গাছের মাথার উপর জগন্নাথের মন্দিরচূড়া দেখা যাচ্চে। হঠাৎ এক জায়গায় গাছ-পালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েই সুবিস্তীর্ণ বালির তীর এবং ঘন নীল সমুদ্রের রেখা দেখ্‌তে পাওয়া গেল।

৭০

বালিয়া,

১১ই মার্চ্চ, ১৮৯৩।

ছোট্ট বোটখানি। আমার মত লম্বা লোকের দৈর্ঘ্যগর্ব্ব খর্ব্ব করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য দেখ্‌তে পাচ্চি। ভ্রমক্রমে মাথা একটুখানি তুল্‌তে গেলেই অমনি কাষ্ঠফলকের প্রচণ্ড চপেটাঘাত মাথার উপর এসে পড়ে—হঠাৎ একেবারে দমে যেতে হয়; সেইজন্যে কাল থেকে নতশিরে যাপন করচি। কপালে যত দুঃখ যত ব্যথা ছিল তার উপরে আবার প্রত্যেকবার দাঁড়াতে গিয়ে নতুন ব্যথা বাড়চে। সে জন্যে তত আপত্তি করিনে কিন্তু কাল মশার জ্বালায় ঘুম হয়নি সেটা আমার অন্যায় মনে হচ্চে।

এদিকে আবার শীত কেটে গিয়ে গরম পড়ে এসেছে; রৌদ্র উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং পাশের জানলা দিয়ে মন্দ মন্দ সজল শীতল বাতাস পিঠের উপর এসে লাগচে। আজ আর শীত কিম্বা সভ্যতার কোনো খাতির নেই—বনাতের চাপকান চোগা হুকের উপর উদ্বন্ধনে ঝুল্‌চে। ঘণ্টাও বাজচে না, সসজ্জ খানসামা এসেও সেলাম করচে না—অসভ্যতার অপরিচ্ছন্ন শৈথিল্য ও আরাম উপভোগ করচি। পাখীগুলো ডাকচে এবং তীরে দুটো বড় বড় বটগাছের পাতা বাতাসে ঝরঝর করে শব্দ করচে—কম্পিত জলের উপরকার রৌদ্রালোক বোটের ভিতরে এসে ঝিকমিক করে উঠচে—বেলাটা এরকম ঢিলেভাবেই চলেছে। কটকে থাক্‌তে ছেলেদের ইস্কুল ও বি—বাবুর আদালতে যাবার তাড়া দেখে সময়ের দুর্ম্মূল্যতা এবং সভ্য মানবসমাজের ব্যস্ততা খুব অনুভব করা যেত। এখানে সময়ের ছোট ছোট নির্দ্দিষ্ট সীমা নেই—কেবল দিন এবং রাত্রি এই দুটি বড় বড় বিভাগ।

৭৪

তীরন,

মার্চ্চ, ১৮৯৩।

এই মেঘবৃষ্টি পাকা কোঠার মধ্যে অতি ভাল কিন্তু ছোট্ট বোট্‌টির মধ্যে দুটি রুদ্ধ প্রাণীর পক্ষে মনোরম নয়। একেত উঠ্‌তে বস্‌তে মাথা ঠেকে, তার উপরে আবার যদি মাথায় জল পড়তে থাকে, তাহলে বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম হতেও পারে কিন্তু আমার "দুর্দ্দশার পেয়ালা" একেবারে পূর্ণ হয়ে ওঠে। মনেকরেছিলুম বৃষ্টি বাদলা একরকম ফুরোলো, এখন স্নাত পৃথিবীসুন্দরী কিছুদিন রৌদ্রে পিঠ দিয়ে আপনার ভিজে এলোচুল শুকোবে, আপনার সিক্ত সবুজ সাড়িখানি রৌদ্রে গাছের ডালে টাঙিয়ে দেবে, মাঠের মধ্যে মেলে দেবে,—বসন্তী আঁচলখানি শুকিয়ে ফুরফুরে হয়ে বাতাসে উড়তে থাক্‌বে। কিন্তু রকমটা এখনও সে ভাবের নয়—বাদ্‌লার পর বাদ্‌লা, এর আর বিরাম নেই। আমি দেখেশুনে এই ফাল্গুন মাসের শেষভাগে কটকের এক ব্যক্তির একখানি মেঘদূত ধার করে নিয়ে এসেছি। আমাদের পাণ্ডুয়ার কুঠির সম্মুখবর্ত্তী অবারিত শস্যক্ষেত্রের উপরে আকাশ যেদিন আর্দ্রস্নিগ্ধ সুনীলবর্ণ হয়ে উঠ্‌বে সেদিন বারান্দায় বসে আবৃত্তি করা যাবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার কিছুই মুখস্থ হয় না—কবিতা ঠিক উপযুক্ত সময়ে মুখস্থ আবৃত্তি করে যাওয়া একটা পরম সুখ, সেটা আমার অদৃষ্টে নেই। যখন আবশ্যক হয় তখন বই হাৎড়ে সন্ধান করে পড়তে গিয়ে আবশ্যক ফুরিয়ে যায়। মনে কর, মনে ব্যথা লেগে ভারি কাঁদ্‌তে ইচ্ছে হয়েচে তখন যদি দরোয়ান পাঠিয়ে বাথ্‌গেটের বাড়ি থেকে শিশি করে চোখের জল আন্‌তে হত, তাহলে কি মুস্কিলই হত। এই জন্যে মফস্বলে যখন যাই তখন অনেকগুলো বই সঙ্গে নিতে হয়, তার সবগুলোই যে প্রতিবার পড়ি তা নয়, কিন্তু কখন্ কোন্‌টা দরকার বোধ হবে আগে থাক্‌তে জানবার যো নেই তাই সমস্ত সরঞ্জাম হাতে রাখ্‌তে হয়। মানুষের মনের যদি নির্দ্দিষ্ট ঋতুভেদ থাক্‌ত তাহলে অনেক সুবিধে হত। যেমন শীতের সময় কেবল শীতের কাপড় নিয়ে যাই এবং গরমের সময় বালাপোষ

নেবার কোন দরকার থাকে না, তেমনি যদি জানতুম মনে কখন্ শীত কখন্ বসন্ত আসবে তাহলে আগে থাক্‌তে সেইরকম গদ্য কিম্বা পদ্যের যোগাড় করা যেতে পারত। কিন্তু মনের ঋতু আবার ছ-টা নয় একেবারে বাহান্নটা,—এক প্যাকেট্ তাসের মত—কখন্ কোন্‌টা হাতে আসে তার কিছু ঠিক নেই—অন্তরে বসে বসে কোন্ খামখেয়ালী খেলোয়াড় যে এই তাস ডীল্ করে' এই খামখেয়ালী খেলা খেলে তার পরিচয় জানিনে। সেইজন্য মানুষের আয়োজনের শেষ নেই—তাকে যে কত রকমের কত কি হাতে রাখতে হয় তার ঠিক্ নেই। সেই জন্যে আমার সঙ্গে "নেপালীজ্ বুদ্ধিষ্টিক্ লিটারেচর" থেকে আরম্ভ করে শেক্ষপীরর পর্য্যন্ত কত রকমেরই যে বই আছে তার আর ঠিকানা নেই। এর মধ্যে অধিকাংশ বইই ছোঁবনা কিন্তু কখন্ কি আবশ্যক হবে বলা যায় না। অন্যবার বরাবর আমার বৈষ্ণব কবি এবং সংস্কৃত বই আনি, এবার আনিনি সেই জন্যে ঐ দুটোরই প্রয়োজন বেশী অনুভব হচ্চে। যখন পুরী খণ্ডগিরি প্রভৃতি ভ্রমণ করছিলুম তখন যদি মেঘদূতটা হাতে থাকত ভারি সুখী হতুম। কিন্তু মেঘদূত ছিলনা তার বদলে Caird's Philosophical Essays ছিল।

———•———

৭৫

কটক,

মার্চ্চ, ১৮৯৩।

তারপরে সাহেবের গান শুনলুম, সাহেবকে গান শোনালুম, তালি দিলুম এবং তালি পেলুম। এই যে বাহবাটুকু পাওয়া যায় একি যথার্থ হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে? একি কতকটা কৌতূহলপরিতৃপ্তি নয়? সত্যি কি আমার যা ভাল লাগে ওদের তাই ভাল লাগে? এবং ওদের যা ভাল লাগে না তাই বাস্তবিক ভাল নয়? তাই যদি না হয় তবে ঐ করতলের তালিতে আমার এতই কি সুখ হবে? (ইংরেজের তালিকে যদি আমরা অতিরিক্ত মূল্য দিতে আরম্ভ করি তাহলে আমাদের দেশের অনেক ভালকে ত্যাগ করতে হয় এবং ওদের দেশের অনেক মন্দকে গ্রহণ করতে হয়। তাহলে পায়ের মোজাটি খুলে বেরতে আমাদের হয়ত লজ্জা হবে কিন্তু ওদের নাচের কাপড় পরতে লজ্জা হবে না। আমাদের দেশের শিষ্টাচার সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করতে কিছুই সঙ্কোচ হবেনা এবং ওদের দেশের কোন প্রচলিত অশিষ্টাচারও অম্লানমুখে গ্রহণ করতে পারব।) আমাদের দেশের আচ্‌কানকে সম্পূর্ণ মনের মত ভাল দেখ্‌তে নয় বলে ত্যাগ করব কিন্তু ওদের দেশের টুপিকে বদ্‌দেখ্‌তে হলেও শিরোধার্য্য করব। আমরা জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে ঐ করতালির নির্দ্দেশমত আপনার জীবনকে গঠিত করতে থাকি এবং তাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র করে ফেলি। আমি নিজেকে সম্বোধন করে বলি—"হে মৃৎপাত্র, ঐ কাংস্যপাত্রের কাছ থেকে দূরে থেকো;—ও যদি রাগ করে' তোমাকে আঘাত করে তাতেও তুমি চূর্ণ হয়ে যাবে, আর ও যদি সোহাগ করে' তোমার পিঠে চাপড় মারে তাতেও তুমি ফুটো হয়ে অতলে মগ্ন হয়ে যাবে—অতএব বৃদ্ধ ঈসপের উপদেশ শোন, তফাৎ থাকাই সার কথা। উনি থাকুন বড় ঘরে, আর আমার সামান্য ঘরে সামান্য পাত্রের হয়ত ছোটখাট কাজ আছে—কিন্তু সে যদি আপনাকে ভেঙে ফেলে তবে তার বড় ঘরও নেই ছোট ঘরও নেই, তবে সে মাটির সমান হয়ে যাবে। তখন হয়ত আমাদের বড়ঘর-

ওয়ালা ব্যক্তিটি ঐ খণ্ড জিনিষকে তাঁর ড্রয়িংরুমের ক্যাবিনেটের এক পার্শ্বে সাজিয়ে রাখ্‌তে পারেন—সে কিন্তু ক্যুরিয়সিটির স্বরূপে—তার চেয়ে ক্ষুদ্র গ্রামের কুলবধূর কক্ষে বিরাজ করেও গৌরব আছে।"

—*—

৭৬

কটক,

মার্চ্চ, ১৮৯৩।

এক একজন লোক আছে যারা কোন কিছু না করলেও যেন আশাতীত ফল দান করে—সু—সেই দলের লোক। ও যে খুব পাশ করবে, প্রাইজ্ পাবে, লিখ্‌বে, বড় কাজ কিম্বা ভাল চাক্‌রি করবে তা যেন তেমন আবশ্যক মনে হয় না—মনে হয় যেন কিছু না করলেও ওর মধ্যে একটা চরিতার্থতা আছে। অধিকাংশ লোককেই অকর্ম্মণ্য হয়ে থাকা শোভা পায় না, তাতে তাদের অপদার্থতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু সু—কিছুই না করলেও ওকে কেউ অযোগ্য বলে ঘৃণা করতে পারবেনা। কাজকর্ম্মের ব্যস্ততা মানুষের পক্ষে একটা আচ্ছাদনের মত, সমস্ত কমনপ্লেস্ লোকের সেটা ভারি আবশ্যক—তাতে তাদের দৈন্য তাদের শীর্ণতা ঢাকা পড়ে—কিন্তু যারা স্বভাবতই পরিপূর্ণ প্রকৃতির লোক, তারা সমস্ত কর্ম্মাবরণমুক্ত হলেও একটি শোভা এবং সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারে। সু—র মতন অমন ষোলআনা শৈথিল্য আর কোন ছেলের দেখ্‌লে নিশ্চয় অসহ্য বোধ হত—কিন্তু সু—র কুঁড়েমিতে একটি মাধুর্য্য আছে। সে আমি ওকে ভালবাসি বলে নয়—তার প্রধান কারণ হচ্চে চুপচাপ বসে থেকেও ওর মনটি বেশ পরিণত হয়ে উঠ্‌চে এবং ওর আত্মীয় স্বজনের প্রতি ওর কিছুমাত্র ঔদাসীন্য নেই। যে কুঁড়েমিতে মূঢ়তা এবং অন্যের প্রতি অবহেলা ক্রমাগত স্ফীত হয়ে গোলগাল তেলচুকচুকে হয়ে উঠ্‌তে থাকে সেইটেই যথার্থ ঘৃণ্য। সু—একটি সহৃদয় এবং সুবুদ্ধি আলস্যের দ্বারা যেন মধুর-রস-সিক্ত হয়ে আছে। যে গাছে সুগন্ধ ফুল ফোটে সে গাছে আহার্য্য ফল না ধরলেও চলে। সু—কে যে সকলে ভালবাসে সে ওর কোন কাজের দরুণ, ক্ষমতার দরুণ, চেষ্টার দরুণ নয়, ওর প্রকৃতির অন্তর্গত একটি সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্যের দরুণ।

—*—

৭৭

কলিকাতা,

১৮ই এপ্রিল, ১৮৯৩।

ভ্রমণের গোলমালের মধ্যে হোটেলে বসে এটা পড়ে কিরকম লাগ্‌বে সন্দেহ আছে। কোথায় সেই পুরীর সমুদ্র আর কোথায় আগ্রার হোটেল! এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জ্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখী করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝা যায়! পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাক্‌ত; সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুন্‌লে তা যেন বোঝা যায়। আমার অন্তরসমুদ্রও আজ একলা বসে বসে সেইরকম তরঙ্গিত হচ্চে, তার ভিতরে ভিতরে কি একটা যেন সৃজিত হয়ে উঠ্‌ছে। কত অনির্দ্দিষ্ট আশা, অকারণ আশঙ্কা, কতরকমের প্রলয়, কত স্বর্গনরক, কত বিশ্বাস সন্দেহ, কত লোকাতীত প্রত্যক্ষাতীত প্রমাণাতীত অনুভব এবং অনুমান, সৌন্দর্য্যের অপার রহস্য, প্রেমের অতল অতৃপ্তি—মানবমনের জড়িত জটিল সহস্র রকমের অপূর্ব্ব অপরিমেয় ব্যাপার! বৃহৎ সমুদ্রের তীরে কিম্বা মুক্ত আকাশের নীচে একলা না বস্‌লে সেই আপনার অন্তরের গোপন মহারহস্য ঠিক অনুভব করা যায় না। কিন্তু তা নিয়ে আমার মাথা খুঁড়ে মরবার দরকার নেই—আমার যা মনে উদয় হয়েছে আমি তাই বলে খালাস্—তার পরে সমুদ্র সমভাবে তরঙ্গিত হতে থাকুক্ আর মানুষ হাঁস্‌ফাঁস্ করে ঘুরে ঘুরে বেড়াক্।

৭৮

কলিকাতা

৩০শে এপ্রিল ১৮৯৩।

কাল তাই রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ছাতে পড়ে থাক্‌তে পেরেছিলুম। চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠেছিল—চমৎকার হাওয়া দিচ্ছিল—ছাতে আর কেউ ছিলনা। আমি একলা পড়ে পড়ে আমার সমস্ত জীবনের কথা ভাব্‌ছিলুম। এই তেতালার ছাত, এইরকম জ্যোৎস্না, এইরকম দক্ষিণের বাতাস জীবনের স্মৃতিতে কতরকমে মিশ্রিত হয়ে আছে। দক্ষিণের বাগানের শিমুগাছের পাতা ঝরঝর শব্দ করছিল, আমি অর্দ্ধেক চোখ বুজে আমার ছেলেবেলাকার মনের ভাবগুলিকে মনে আন্‌বার চেষ্টা করছিলুম। পুরোণো স্মৃতিগুলো মদের মত;—যত বেশিদিন মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে, ততই তার বর্ণ এবং স্বাদ এবং নেশা যেন মধুর হয়ে আসে। আমাদের এই স্মৃতির বোতলগুলি বুড়ো বয়সের জন্যে "In the deep-delved earth" ঠাণ্ডা করে রেখে দেওয়া যাচ্চে—তখন বোধ হয় ছাতের উপর জ্যোৎস্না রাত্রে এক এক ফোঁটা করে আস্বাদ করতে বেশ লাগ্‌বে। অল্প বয়সে মানুষ কেবলমাত্র কল্পনা এবং স্মৃতিতে সন্তুষ্ট থাকে না, কেননা তখন তার রক্তের জোর তার শরীরের তেজ তাকে কিছু একটা কাজে প্রবৃত্ত করতে চায় কিন্তু বুড়ো বয়সে যখন স্বভাবতই আমরা কাজে অক্ষম, শরীরের যৌবনের অতিরিক্ত তেজ আমাদের কোনরকম তাড়না করচেনা, তখন স্মৃতি বোধ হয় আমাদের পক্ষে যথেষ্ট—তখন জ্যোৎস্না রাত্রের স্থির জলাশয়ের মত আমাদের অচঞ্চল মনে পূর্ব্ব স্মৃতির ছায়া এমনি পরিষ্কার স্পষ্টভাবে পড়ে, যে বর্ত্তমান ব্যাপারের সঙ্গে তার প্রভেদ বোঝা শক্ত।

—*—

৭৯

শিলাইদহ,

মে, ১৮৯৩।

এখন আমি বোটে। এই যেন আমার নিজের বাড়ি। এখানে আমিই একমাত্র কর্ত্তা। এখানে আমার উপরে আমার সময়ের উপরে আর কারো কোনো অধিকার নেই। এই বোটটি আমার পুরোণো ড্রেসিং গাউনের মত—এর মধ্যে প্রবেশ করলে খুব একটি ঢিলে অবসরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খুসি পড়ি, যত খুসি লিখি, এবং যত খুসি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন মনে এই আকাশপূর্ণ, আলোকপূর্ণ, আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি।

এখন প্রথম দিনকতক আমার এই পূর্ব্বপরিচিতের সঙ্গে পুনর্ম্মিলনের নতুন বাধো-বাধো ভাবটা কাটাতেই যাবে। তার পরে নিয়মিত লিখ্‌তে পড়তে নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে আমাদের পুরাতন সখ্য আবার বেশ সহজ হয়ে আস্‌বে। বাস্তবিক, পদ্মাকে আমি বড় ভালবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা আমার যথার্থ বাহন—খুব বেশি পোষমানা নয়, কিছু বুনোরকম;—কিন্তু ওর পিঠে এবং কাঁধে হাত বুলিয়ে ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে। এখন পদ্মার জল অনেক কমে গেছে—বেশ স্বচ্ছ কৃশকায় হয়ে এসেছে—একটি পাণ্ডুবর্ণ ছিপ্‌ছিপে মেয়ের মত, নরম শাড়িটি গায়ের সঙ্গে বেশ সংলগ্ন। সুন্দর ভঙ্গীতে চলে যাচ্চে আর শাড়িটি বেশ গায়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে যাচ্চে। আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি, তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মত,—অতএব তার কথা যদি কিছু বাহুল্য করে লিখি তবে সে কথাগুলো চিঠিতে লেখ্‌বার অযোগ্য মনে করা উচিত হবেনা। সেগুলো হচ্চে এখানকার পার্সোনাল খবরের মধ্যে। একদিনেই কলকাতার সঙ্গে ভাবের কত তফাৎ হয়ে যায়। কাল বিকেলে সেখানে ছাতে বসেছিলুম সে একরকম, আর আজ এখানে দুপুরবেলায় বোটে বসে আছি এ একরকম। কলকাতার

পক্ষে যা সেণ্টিমেণ্টাল, পোয়েটিকাল, এখানকার পক্ষে তা কতখানি সত্যিকার সত্যি। পাব্লিক নামক গ্যাসালোকজ্বালা ষ্টেজের উপর আর নাচতে ইচ্ছে করেনা—এখানকার এই স্বচ্ছ দিবালোক এবং নিভৃত অবসরের মধ্যে গোপনে আপনার কাজ করে যেতে ইচ্ছে করে। নেপথ্যে এসে রংচংগুলো ধুয়ে মুছে না ফেল্লে মনের অশান্তি আর যায়না। সাধনা চালানো, সাধারণের উপকার করা এবং হাঁস্‌ফাঁস্‌ করে মরাটা অনেকটা অনাবশ্যক বলে মনে হয়—তার ভিতরে অনেক জিনিষ থাকে যা খাঁটি সোনা নয় যা খাদ—আর, এই প্রসারিত আকাশ আর সুবিস্তীর্ণ শান্তির মধ্যে যদি কারো প্রতি দৃক্‌পাত না করে আপনার গভীর আনন্দে আপনার কাজ করে যাই তাহলেই যথার্থ কাজ হয়।

—•—

৮৩

শিলাইদহ,
৮ই মে, ১৮৯৩।

কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী—বোধ হয় যখন আমার রথীর মত বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক্‌দত্তা হয়েছিল। তখন থেকে আমাদের পুকুরের ধারে বটের তলা, বাড়িভিতরের বাগান, বাড়িভিতরের একতলার অনাবিষ্কৃত ঘরগুলো, এবং সমস্ত বাহিরের জগৎ, এবং দাসীদের মুখের সমস্ত রূপকথা এবং ছড়াগুলো, আমার মনের মধ্যে ভারি একটা মায়াজগৎ তৈরি করছিল। তখনকার সেই আবছায়া অপূর্ব্ব মনের ভাব প্রকাশ করা ভারি শক্ত,—কিন্তু এই পর্য্যন্ত বেশ বল্‌তে পারি কবিকল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালাবদল হয়েগিয়েছিল। কিন্তু ও মেয়েটি পয়মন্ত নয়, তা স্বীকার করতে হয়;—আর যাই হোক্ সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুখ দেন না বল্‌তে পারিনে, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন কিন্তু এক এক সময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে নেন্। যে লোককে তিনি নির্ব্বাচন করেন, সংসারের মাঝখানে ভিত্তিস্থাপন করে গৃহস্থ হয়ে স্থির হয়ে আয়েস্ করে বসা সে লক্ষ্মীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমার আসল জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে। সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি যেমনি কবিতা লিখ্‌তে আরম্ভ করি অম্‌নি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি—আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায় কিন্তু কবিতায় কখনো মিথ্যা কথা বলিনে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।

৮১

শিলাইদহ,

১০ই মে, ১৮৯৩।

ইতিমধ্যে দেখ্‌চি খুব ফুলো ফুলো বড় বড় কতকগুলো মেঘ চতুর্দ্দিক থেকে জমে এসেছে—আমার এই চারিদিকের দৃশ্যপট থেকে কাঁচা সোনালী রোদ্দুরটুকু যেন মোটা মোটা ব্লটিংপ্যাড্ দিয়ে একেবারে চুপ্‌সে তুলে নিয়েচে। আবার যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় তাহলে ধিক্ ইন্দ্রদেবকে! মেঘগুলোর তেমন ফাঁকা দরিদ্র চেহারা দেখ্‌চিনে, বাবুদের মত দিব্যি সজলশ্যামল টেবোটোবো নধর নন্দন ভাব। এখনি বৃষ্টি আরম্ভ হল বলে—হাওয়াটাও সেইরকম কাঁদো কাঁদো ভিজে ভিজে ঠেক্‌চে। এখানে এই মেঘরৌদ্রের যাওয়াআসা ব্যাপারটা যে কতটা গুরুতর, আকাশের দিকে যে কত লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে, সিমলার সেই অভ্রভেদী পর্ব্বতশৃঙ্গে বসে তা ঠিকটি কল্পনা করা শক্ত হবে। আমার এই দরিদ্র চাষীপ্রজাগুলোকে দেখ্‌লে আমার ভারি মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মত নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায়, তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে—কোনমতে একটুখানি ক্ষুধা ভাঙলেই আবার তখনি সমস্ত ভুলে যায়। সোশিয়ালিষ্ট্‌রা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানিনে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড় নিষ্ঠুর, মানুষ ভারি হতভাগ্য! কেননা পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে ত থাক্, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে! যারা বলে, কোনোকালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবনধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যক জিনিষও বণ্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কল্পনামাত্র, কখনই সকল মানুষ খেতে পরতে পাবেনা, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্দ্ধাশনে কাটাবেই, এর কোন পথ নেই, তারা ভারি কঠিন কথা বলে। কিন্তু এ সমস্ত সামাজিক

সমস্যা এমন কঠিন! বিধাতা আমাদের এমনি একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ দীন বস্ত্রখণ্ড দিয়েছেন, পৃথিবীর একদিক ঢাকতে গিয়ে আর একদিক বেরিয়ে পড়ে—দারিদ্র্য দূর করতে গেলে ধন চলে যায় এবং ধন গেলে সমাজের কত যে শ্রীসৌন্দর্য্য উন্নতির কারণ চলে যায় তার আর সীমা নেই। কিন্তু আবার এক একবার রোদ্দুর উঠচে—পশ্চিমে মেঘও যথেষ্ট জমে আছে।

৮২

শিলাইদহ,

১১ই মে, ১৮৯৩।

কাল বিকেলের দিকে খুব ঘনঘটা করে মেঘ করে খানিকটা বৃষ্টি হয়ে আবার পরিষ্কার হয়ে গেছে। আজ খানকতক দলভ্রষ্ট বিচ্ছিন্ন মেঘ সূর্য্যালোকে শুভ্র হয়ে খুব নিরীহ নিরপরাধভাবে আকাশের ধারে ধারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখেত মনে হয় এদের বর্ষণের অভিপ্রায় কিছুমাত্র নেই। কিন্তু চাণক্য তাঁর সুবিখ্যাত শ্লোকে যাদের যাদের বিশ্বাস করতে নিষেধ করেচেন তার মধ্যে দেবতাকেও ধরা উচিত ছিল। আজ সকালবেলাটি বড় সুন্দর হয়ে উঠেছে—আকাশ পরিষ্কার নীল, নদীর জলে রেখামাত্র নেই এবং ডাঙার কাছে গড়ানে জায়গায় যে ঘাসগুলি হয়েচে তাতে পূর্ব্বদিন-কার বৃষ্টির কণাগুলি লেগে সেগুলি ঝক্‌ঝক্ করচে। এই সমস্ত মিলে সূর্য্যালোকে আজকের প্রকৃতিকে ভারি একটি শুভ্রবসনা মহিমময়ী মহেশ্বরীর মত দেখাচ্চে। সকালবেলাটি এমনি নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে। কেন জানিনে নদীতে একটি নৌকো নেই, বোটের নিকটবর্ত্তী ঘাটে কেউ জল নিতে কেউ স্নান করতে আসেনি, নায়েব সকাল সকাল কাজ সেরে চলে গেছে। খানিকটা চুপ করে কানপেতে থাক্‌লে কি একটা ঝাঁ ঝাঁ শব্দ শোনা যায় এবং এই রৌদ্রালোক আর আকাশ আস্তে আস্তে প্রবেশ করে মাথার ভিতরটি একেবারে ভরে ওঠে এবং সেখানকার সমুদয় ভাব ও চিন্তাগুলিকে একটি নীল সোনালী রঙে রঙিয়ে দেয়। বোটের একপাশে একটা বাঁকা কৌচ আনিয়ে রেখেছি, এইরকম সকালবেলায় তার মধ্যে শরীরটা ছড়িয়ে দিয়ে সমস্ত কাজ ফেলে চুপচাপ করে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে, মনে হয়

—"নাই মোর পূর্ব্বাপর,
যেন আমি একদিনে উঠেছি ফুটিয়া
অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল!"—

যেন আমি এই আকাশের, এই নদীর, এই পুরাতন শ্যামল পৃথিবীর। বোটে আমার

এইরকম করে কাটে। পড়ে' পড়ে' পরিচিত প্রকৃতির কত রকমের যে ভাবের পরিবর্ত্তন দেখি তার ঠিক নেই। এখানে আমার আর একটি সুখ আছে। একএকসময় এক-একটি সরল ভক্ত বৃদ্ধ প্রজা আসে, তাদের ভক্তি এমনি অকৃত্রিম! বাস্তবিক এর সুন্দর সরলতা এবং আন্তরিক ভক্তিতে এ লোকটি আমার চেয়ে কত বড়! আমিই যেন এ ভক্তির অযোগ্য কিন্তু এ ভক্তিটিত বড় সামান্য জিনিষ নয়। ছোট ছেলেদের উপর যেরকম ভালবাসা এই বৃদ্ধ ছেলেদের উপর অনেকটা সেইরকম—কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে। এরা তাদের চেয়েও ছোট। কেননা তারা বড় হবে এরা আর কোন কালেও বড় হবেনা—এদের এই জীর্ণ শীর্ণ কুঞ্চিত বলিত বৃদ্ধদেহখানির মধ্যে কি একটি শুভ্র সরল কোমল মন রয়েচে! শিশুদের মনে কেবল সরলতা আছে মাত্র কিন্তু এমন স্থির বিশ্বাসপূর্ণ একাগ্রনিষ্ঠা নেই। মানুষে মানুষে যদি সত্যি একটা আধ্যাত্মিক যোগ থাকে তাহলে আমার এই অন্তরের মঙ্গল ইচ্ছা ওর হয়ত কিছু কাজে লাগ্‌তে পারে। কিন্তু সব প্রজা এরকম নয়—সেরকম প্রত্যাশা করাও যায় না। সব চেয়ে যা ভাল সব চেয়ে তা দুর্লভ।

—*—

৮৩ শিলাইদহ,

১৩ই মে, ১৮৯৩।

আজ টেলিগ্রাম পেলুম যে Missing gown lying Post office এর দুটো অর্থ হতে পারে। এক অর্থ হচ্চে হারা গাত্রবস্ত্র ডাকঘরে শুয়ে আছেন। আর এক অর্থ হচ্চে—গাউনটা মিসিং এবং পোষ্টঅফিসটা লাইং। দুই অর্থই সম্ভব হতে পারে—কিন্তু যে পর্য্যন্ত প্রতিবাদ না শুনি সে পর্য্যন্ত প্রথম অর্থটাই গ্রহণ করা গেল। কিন্তু মজা হচ্চে এই—সঙ্গে সঙ্গে যে চিঠিখানি এসেচে তাতে পরিষ্কার করে বলা আছে একটা গাউন যে পাওয়া যায়নি তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

বেচারা চিঠি! তার জিম্মায় যে কয়টি কথা লেফাফায় পুরে দেওয়া হয়েচে সেই কয়টি কথা কাঁধে করে নিয়ে দীর্ঘ পথ টিকতে টিকতে চলে আসচে—ইতিমধ্যে যে পৃথিবীতে কত কি হয়ে যাচ্চে তা সে জানে না, এবং তার ছোট ভাই যে এক লম্ফে তাকে ডিঙিয়ে তার সমস্ত কথার একটিমাত্র সংক্ষেপ রূঢ় প্রতিবাদ নিয়ে এসে হাজির হল তারও সে জবাব দিতে পারে না; সে ভালমানুষের মত বলে "আমি কিছু জানিনে বাপু, আমাকে সে যা বলে দিয়েচে আমি তাই বয়ে এনেচি।" বাস্তবিক এনেচে বটে। একটি কথার এদিক ওদিক হয়নি—সমস্ত পথটি মাড়িয়ে, দীর্ঘ পথের কত চিহ্ন, আষ্টে-পৃষ্ঠে কত ছাপ নিয়েই বেচারা ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হয়েচে। তা হোক্ তার খবর ভুল, আমি তাকে ভালবাসি। আর তারে চড়ে' চক্ষের পলকে টেলিগ্রাফ এলেন—কোথাও পথশ্রমের কোন চিহ্ন নেই—লেফাফাখানি একেবারে রাঙা টক্ টক্ করচে—হড়্ বড়্ তড়্ বড়্ করে দুটো কথা বল্লেন আর ভিতর থেকে আটটা দশটা কথা পড়ে গেছে- তার মধ্যে ব্যাকরণ নেই ভদ্রতা নেই কিছু নেই - একটা সম্বোধন নেই একটা বিদায়ের শিষ্টতাও নেই, আমার প্রতি যেন তার কিছুমাত্র বন্ধুতার ভাব নেই, কেবল কোনোমতে তাড়াতাড়ি কথাটা যেমন তেমন করে বলে ফেলে দায় কাটিয়ে চলে যেতে পারলে বাঁচে।

শিলাইদহ,

৮৪

১৬ই মে, ১৮৯৩।

আমি বিকেলে বেলা সাড়ে ছটার পর স্নান করে ঠাণ্ডা এবং পরিষ্কার হয়ে চরের উপর নদীর ধারে ঘণ্টাখানেক বেড়াই, তার পর আমাদের নতুন জলিবোটটাকে নদীর মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপরে বিছানাটি পেতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার অন্ধকারে চীৎ হয়ে চুপচাপ্ পড়ে থাকি। শ—কাছে বসে' নানা কথা বকে যায়। চোখের উপরে আকাশ তারায় একেবারে খচিত হয়ে ওঠে। আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আবার কি কখনো জন্মগ্রহণ করব? আর কি কখনো এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপর বাংলা দেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে জলিবোটের উপর বিছানা পেতে পড়ে থাক্‌তে পাব? হয়ত আর কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধ্যেবেলা আর কখনো ফিরে পাবনা। তখন কোথায় দৃশ্য পরিবর্ত্তন হবে—আর, কিরকম মন নিয়েই বা জন্মাব? এমন সন্ধ্যা হয়ত অনেক পেতেও পারি কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে এত সুগভীর ভালবাসার সঙ্গে পড়ে থাক্‌বেনা। আমি কি ঠিক এম্‌নি মানুষটি তখন থাক্‌ব! আশ্চর্য্য এই আমার সব চেয়ে ভয় হয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি। কেননা সেখানে সমস্ত চিত্তটিকে এমন উপরের দিকে উদ্‌ঘাটিত রেখে পড়ে থাকবার যো নেই এবং পড়ে থাকাও সকলে ভারি দোষের বিবেচনা করে। হয়ত একটা কারখানায় নয়ত ব্যাঙ্কে নয়ত পার্ল্যামেণ্টে সমস্ত দেহ-মনপ্রাণ দিয়ে খাট্‌তে হবে। সহরের রাস্তা যেমন ব্যবসাবাণিজ্য গাড়িঘোড়া চল্‌বার জন্যে ইঁটে বাঁধানো কঠিন, তেমনি মনটা স্বভাবটা বিজ্‌নেস্ চালাবার উপযোগী পাকা করে বাঁধানো—তাতে একটি কোমল তৃণ একটি অনাবশ্যক লতা গজাবার ছিদ্রটুকু নেই। ভারি ছাঁটাছোঁটা গড়াপেটা আইনে বাঁধা মজ্‌বুৎরকমের ভাব। কি জানি, তার চেয়ে আমার এই কল্পনাপ্রিয় অকর্ম্মণ্য আত্মনিমগ্ন বিস্তৃত আকাশপূর্ণ মনের

ভাবটি কিছুমাত্র অগৌরবের বিষয় বলে মনে হয় না। জলিবোটে পড়ে পড়ে জগতের সেই কাজের লোকের কাছে আপনাকে কিছুমাত্র খাটো মনে হয় না। বরঞ্চ আমিও যদি কোমর বেঁধে কাজে লাগতুম তাহলে হয়ত সেই সমস্ত বড় বড় ওক-গাছ-কাটা, জোয়ান্ লোকদের কাছে আপনাকে ভারি যৎসামান্য মনে হত।

---

৮৫ কলকাতা,

২১শে জুন, ১৮৯৩।

এবারকার ডায়ারিটাতে ঠিক প্রকৃতির স্তব নয়—মননামক একটা সৃষ্টিছাড়া চঞ্চল পদার্থ কোনো গতিকে আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাতে যে কিরকম একটা উৎপাত হয়েচে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা গেছে। আসলে, আমরা খাব পরব্ বেঁচে থাকব এইরকম কথা ছিল—আমরা যে বিশ্বের আদিকারণ অনুসন্ধান করি, ইচ্ছাপূর্ব্বক খুব শক্ত একটা ভাব ব্যক্ত করবার প্রয়াস করি, আবার তার মধ্যে পদে পদে মিল থাকা দরকার মনে করি; আপাদমস্তক ঋণে নিমগ্ন হয়ে ও মাসে মাসে ঘরের কড়ি খরচ করে সাধনা বের করি, এর কি আবশ্যকতা ছিল! ওদিকে নারায়ণ সিং দেখ ঘি দিয়ে আটা দিয়ে বেশ মোটা মোটা রুটি বানিয়ে তার সঙ্গে দধি সংযোগ করে আনন্দমনে ভোজনপূর্ব্বক দু এক ছিলিম তামাক টেনে দুপুরবেলাটা কেমন স্বচ্ছন্দে নিদ্রা দিচ্চে এবং সকালে বিকালে লোকেনের সামান্য দুচারটে কাজ করে' রাত্রে অকাতরে বিশ্রাম লাভ করচে। জীবনটা যে ব্যর্থ হল বিফল হল এমন কখন তার স্বপ্নেও মনে হয় না, পৃথিবীর যে যথেষ্ট দ্রুতবেগে উন্নতি হচ্চে না সেজন্যে সে নিজেকে কখনো দায়িক করেনা। জীবনের সফলতা কথাটার কোনো মানে নেই—প্রকৃতির একমাত্র আদেশ হচ্চে বেঁচে থাক। নারায়ণ সিং সেই আদেশটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই নিশ্চিন্ত আছে। আর যে হতভাগার বক্ষের মধ্যে মন নামক একটা প্রাণী গর্ত্ত খুঁড়ে বাসা করেছে, তার আর বিশ্রাম নেই, তার পক্ষে কিছুই যথেষ্ট নয়, তার চতুর্দ্দিকবর্ত্তী অবস্থার সঙ্গে সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে গেছে; সে যখন জলে থাকে তখন স্থলের জন্যে লালায়িত হয়, যখন স্থলে থাকে তখন জলে সাঁতার দেবার জন্যে তার "অসীম আকাঙ্ক্ষার" উদ্রেক হয়। এই দুরন্ত অসন্তুষ্ট মনটাকে প্রকৃতির অগাধ শান্তির মধ্যে বিসর্জ্জন করে একটুখানি স্থির হয়ে বসতে পারলে বাঁচা যায়, কথাটা হচ্চে এই।

৮৬ শিলাইদহ,

২রা জুলাই, ১৮৯৩।

কোনো জিনিষ যথার্থ উপভোগ করতে গেলে তার চতুর্দ্দিকে অবসরের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিতে হয়—তাকে বেশ অনেকখানি মেলিয়ে দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে চতুর্দ্দিকে বিছিয়ে দিয়ে তবে তাকে ষোলআনা আয়ত্ত করা যায়। মফস্বলে একলা থাকবার সময় যে বন্ধু বান্ধবদের চিঠিপত্র এত ভাল লাগে তার একটা প্রধান কারণ হচ্চে—প্রত্যেক অক্ষরটি পর্য্যন্ত একটি একটি ফোঁটার মত করে নিঃশেষপূর্ব্বক গ্রহণ করবার অবসর পাওয়া যায়, মনের কল্পনা ওর প্রত্যেক কথায় লতিয়ে লতিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে ওঠে—বেশ অনেকক্ষণ ধরে একটা গতি অনুভব করা যায়। অতিলোভে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সেই সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সুখের ইচ্ছেটা এমনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এগিয়ে চলে যে, অনেক সময়ে সুখটাকেই ডিঙিয়ে চলে যায়, এবং চক্ষের পলকে সমস্ত ফুরিয়ে ফেলে। এইরকম জমিজমা আম্‌লা মাম্‌লার মধ্যে কোনো চিঠিকেই যথেষ্ট মনে হয় না—মনে হয় যেন ক্ষুধার যোগ্য অন্ন পাওয়া গেল না। কিন্তু যত বয়স হচ্চে তত এইটে দেখ্‌চি পাওয়াটা নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অন্যে কতটা দিতে পারে তা নিয়ে নালিশ-ফরিয়াদি করা ভুল, আমি কতটা নিতে পারি এইটেই হচ্চে আসল কথা। যা হাতের কাছে আসে তাকেই পুরোপুরি হস্তগত করে নেওয়া অনেক শিক্ষা সাধনা এবং সংযমের দ্বারা হয়। সে শিক্ষা লাভ করতে জীবনের প্রায় বারো আনা কাল চলে যায়, তারপরে সে শিক্ষার ফল ভোগ করবার আর বড় সময় পাওয়া যায় না। ইতি সুখতত্ত্বশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়।

৮৭

শিলাইদহ,
৩রা জুলাই, ১৮৯৩।

কাল সমস্ত রাত তীব্র বাতাস পথের কুকুরের মত হুহু করে কেঁদেছিল—আর বৃষ্টিও অবিশ্রাম চল্‌চে। মাঠের জল ছোট ছোট নির্ঝরের মত নানাদিক থেকে কল্‌কল্‌ করে নদীতে এসে পড়চে—চাষারা ওপারের চর থেকে ধান কেটে আনবার জন্যে কেউবা টোগা মাথায় কেউবা একখানা কচুপাতা মাথার উপর ধবে ভিজতে ভিজ্‌তে খেয়া নৌকায় পার হচ্চে—বড় বড় বোঝাই নৌকোর মাথার উপর মাঝি হাল ধরে বসে বসে ভিজ্‌চে, আর মাল্লারা গুণ কাঁধে করে ডাঙার উপর ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে চলেচে—এমন দুর্য্যোগ তবু পৃথিবীর কাজকর্ম্ম বন্ধ থাকবার যো নেই। পাখীরা বিমর্ষ মনে তাদের নীড়ের মধ্যে বসে আছে কিন্তু মানুষের ছেলেরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। আমার বোটের সাম্‌নে দুটি রাখালবালক একপাল গরু নিয়ে এসে চরাচ্চে; গরুগুলি কচরমচর শব্দ করে' এই বর্ষাসতেজ সরসশ্যামল সিক্ত ঘাসগুলির মধ্যে মুখ ভরে দিয়ে ল্যাজ নেড়ে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে স্নিগ্ধ শান্ত নেত্রে আহার করে করে বেড়াচ্চে—তাদের পিঠের উপর বৃষ্টি এবং রাখালবালকের যষ্টি অবিশ্রাম পড়চে, দুইই তাদের পক্ষে সমান অকারণ, অন্যায় এবং অনাবশ্যক, এবং দুই তারা সহিষ্ণুভাবে বিনা-সমালোচনায় সয়ে যাচ্চে এবং কচরমচর করে ঘাস খাচ্চে। এই গরুগুলির চোখের দৃষ্টি কেমন বিষণ্ণ শান্ত সুগম্ভীর স্নেহময়—মাঝের থেকে মানুষের কর্ম্মের বোঝা এই বড় বড় জন্তুগুলোর ঘাড়ের উপর কেন পড়ল? নদীর জল প্রতিদিনই বেড়ে উঠ্‌চে। পর্শুদিন বোটের ছাতের উপর থেকে যতখানি দেখা যেত, আজ, বোটের জানলায় বসে প্রায় ততটা দেখা যাচ্চে—প্রতিদিন সকালে উঠে দেখি তটদৃশ্য অল্প অল্প করে প্রসারিত হয়ে যাচ্চে। এতদিন সাম্‌নে ঐ দূর গ্রামের গাছপালার মাথাটা সবুজ পল্লবের মেঘের মত দেখা যেত—আজ সমস্ত বনটা আগাগোড়া আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে। ডাঙা এবং জল দুই লাজুক প্রণয়ীর মত অল্প অল্প করে পরস্পরের কাছে অগ্রসর হচ্চে। লজ্জার

সীমা উপ্‌চে এল বলে—প্রায় গলাগলি হয়ে এসেছে। এই ভরা বাদরে ভরা নদীর মধ্যে দিয়ে নৌকো করে যেতে বেশ লাগ্‌বে—বাঁধা বোট ছেড়ে দেবার জন্যে মনটা অধীর হয়ে আছে।

৮৮

শিলাইদহ,

৪ঠা জুলাই, ১৮৯৩।

আজ সকালবেলায় অল্প অল্প রৌদ্রের আভাস দিচ্চে। কাল বিকেল থেকে বৃষ্টি ধরে গেছে কিন্তু আকাশের ধারে ধারে স্তরে স্তরে এত মেঘ জমে আছে যে বড় আশা নেই। ঠিক যেন মেঘের কালো কার্পেটটা সমস্ত আকাশ থেকে গুটিয়ে নিয়ে একপ্রান্তে পাকিয়ে জড় করেচে, এখনি একটা ব্যস্তবাগীশ বাতাস এসে আবার সমস্ত আকাশময় বিছিয়ে দিয়ে যাবে, তখন নীলাকাশ এবং সোনালি রৌদ্রের কোনো চিহ্নমাত্র দেখা যাবে না। এবারে এত জলও আকাশে ছিল! আমাদের চরের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করেছে। চাষারা নৌকো বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আস্চে— আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকো যাচ্চে আর ক্রমাগত হাহাকার শুন্তে পাচ্চি—যখন আর কয়দিন থাক্‌লে ধান পাক্‌ত তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কি নিদারুণ তা বেশ বুঝতেই পারা যায়। যদি ঐ শীষের মধ্যে দুটো চারটে ধান একটু শক্ত হয়ে থাকে এই তাদের আশা। প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে দয়া জিনিষটা কোনো এক জায়গায় আছে অবশ্য, নইলে আমরা পেলুম কোথা থেকে— কিন্তু সেটা যে ঠিক কোন্‌খানে আছে খুঁজে পাওয়া শক্ত। এই শত সহস্র নির্দ্দোষ হতভাগ্যের নালিশ কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁচচ্ছে না, বৃষ্টি যেমনি পড়বার তেমনি পড়চে, নদী যেমন বাড়বার তেমনি বাড়চে, বিশ্বসংসারে এ সম্বন্ধে কারো কাছে কোনো দরবার পাবার যো নেই। মনকে বোঝাতে হয় যে কিছু বোঝবার যো নেই—কিন্তু জগতে যে দয়া এবং ন্যায়বিচার আছে এটুকু বোঝা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু এ সমস্ত মিথ্যে খুঁৎখুঁৎ মাত্র—কেননা সৃষ্টি কখনই সম্পূর্ণ সুখের হতে পারে না। যতক্ষণ অপূর্ণতা ততক্ষণ অভাব ততক্ষণ দুঃখ থাক্‌বেই। জগৎ যদি জগৎ না হয়ে ঈশ্বর হত তাহলেই কোথাও কোনো খুঁৎ থাক্‌ত না—কিন্তু ততটা দূর পর্য্যন্ত দরবার করতে সাহস হয় না। ভেবে দেখলে সকল কথাই গোড়ায় গিয়ে ঠেকে যে, সৃষ্টি হল কেন—

কিন্তু সেটা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি যদি না করা যায় তাহলে, জগতে দুঃখ রইল কেন এ নালিশ উত্থাপন করা মিথ্যা। সেইজন্যে বৌদ্ধেরা একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ মারতে চায় ; তারা বলে যতক্ষণ অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ দুঃখের সংশোধন হতে পারে না একেবারে নির্ব্বাণ চাই। খৃষ্টানরা বলে দুঃখটা খুব উচ্চ জিনিষ, ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ হয়ে আমাদের জন্যে দুঃখ বহন করচেন। কিন্তু নৈতিক দুঃখ এক, আর পাকা ধান ডুবে যাওয়ার দুঃখ আর। আমি বলি যা হয়েছে বেশ হয়েচে ; এই যে আমি হয়েছি এবং এই আশ্চর্য্য জগৎ হয়েছে বড় তোফা হয়েছে—এমন জিনিষটা নষ্ট না হলেই ভাল। বুদ্ধদেব তদুত্তরে বলেন, এ জিনিষটা যদি রক্ষা করতে চাও তাহলে দুঃখ সইতে হবে—আমি নরাধম তদুত্তরে বলি ভাল জিনিষ এবং প্রিয় জিনিষ রক্ষা করতে যদি দুঃখ সইতে হয় তাহলে দুঃখ সব—তা আমি থাকি আর আমার জগৎটি থাকুক ; মাঝে মাঝে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, মনঃক্ষোভ, নৈরাশ্য বহন করতে হবে, কিন্তু সে দুঃখের চেয়ে যখন অস্তিত্ব ভালবাসি এবং অস্তিত্বের জন্যই সে দুঃখ বহন করি তখন ত আর কোনো কথা বলা শোভা পায় না।

৮৯

ইছামতী,

৭ই জুলাই, ১৮৯৩।

কাল সমস্ত দিন বেশ পরিষ্কার ছিল। অনেকদিন পরে মেঘ কেটে রৌদ্রে দশদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল; প্রকৃতি যেন স্নানের পর নতুন-ধোয়া বাসন্তী রঙের কাপড়টি পরে পরিচ্ছন্ন প্রসন্ন প্রফুল্ল মুখে ভিজে চুলটি মৃদুমন্দ বাতাসে শুকচ্ছিলেন। কাজ সেরে বেলা সাড়ে চারটে পাঁচটার সময় যখন বোট ছেড়ে দিলুম তখন পূর্ব্বদিকে খুব একটা গাঢ় মেঘ উঠ্‌ল। ক্রমশঃ একটু বাতাস এবং বৃষ্টিও যে হয়নি তা নয়। সেই শাখানদীটার ভিতরে যখন ঢুকলুম বৃষ্টি ধরে গেল। জলে চর ভেসে গেছে—মানুষ-প্রমাণ লম্বা ঘাস এবং ঝাউ বনের ভিতর দিয়ে সর্ সর্ শব্দে গুণ টেনে বোট চল্‌তে লাগ্‌ল। খানিক দূরে গিয়ে অনুকূল বাতাস পাওয়া গেল। পাল তুলে দিতে বল্লুম, পাল তুলে দিলে। দুদিকে ঢেউ কেটে কল্ কল্ শব্দ তুলে বোট সগর্ব্বে চলে যেতে লাগ্‌ল। আমি বাইরে চৌকি নিয়ে বস্‌লুম। সেই নিবিড় নীল মেঘের অন্তরালে, অর্দ্ধনিমগ্ন জলশূন্য চর এবং পরিপূর্ণ দিগন্তপ্রসারিত নদীর মধ্যে সূর্য্যাস্ত যে কি জিনিষ সে আমি বর্ণনা করতে চেষ্টা করবনা। বিশেষতঃ আকাশের অতিদূরপ্রান্তে পদ্মার জলরেখার ঠিক উপরেই মেঘের যেখানে ফাঁক পড়েছে সেখানটা এমনি অতি-মাত্রায় সূক্ষ্মতম সোনালিতম হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেই স্বর্ণপটের উপর সারি সারি লম্বা কৃশ গাছগুলির মাথা এমনি সুকোমল সুনীল রেখায় অঙ্কিত হয়েছিল—প্রকৃতি সেখানে যেন আপনার চরম পরিণতিতে পৌঁছে একটা কল্পলোকের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। মাঝি জিজ্ঞাসা করলে বোট চরের কাছারীঘাটে রাখ্‌ব কি? আমি বল্লুম, না পদ্মা পেরিয়ে চল্।—মাঝি পাড়ি দিলে,—বাতাস বেগে বইতে লাগ্‌ল, পদ্মা নৃত্য করতে লাগল, পাল ফুলে উঠ্‌ল, দিনের আলো মিলিয়ে এল, আকাশের ধারের মেঘগুলি ক্রমে আকাশের মাঝখানে ঘনঘটা করে জমে গেল, চারদিকে পদ্মার উদ্দামচঞ্চল জল করতালি দিচ্চে—সম্মুখে দূরে নীল মেঘস্তূপের নীচে পদ্মাতটের নীল বনরেখা দেখা যাচ্চে—নদীর মাঝ-

খানে আমাদের বোট ছাড়া আর একটিও নৌকো নেই—তীরের কাছে দুই একটা জেলে ডিঙি ছোট ছোট পাল উড়িয়ে গৃহমুখে চলেছে,—আমি যেন প্রকৃতির রাজার মত বসে আছি আর আমাকে তার দুরন্ত ফেনিলমুখ রাজ-অশ্ব সনৃত্যগতিতে বহন করে নিয়ে চলেছে।

সাজাদপুর,

৯০

৭ই জুলাই, ১৮৯৩।

ছোটখাট গ্রাম, ভাঙাচোরা ঘাট, টিনের ছাতওয়ালা বাজার, বাঁখারির বেড়া দেওয়া গোলাঘর, বাঁশঝাড়, আম কাঁঠাল খেজুর সিমুল কলা আকন্দ ভেরেণ্ডা ওল কচু লতাগুল্ম তৃণের সমষ্টিবদ্ধ ঝোপঝাড় জঙ্গল, ঘাটেবাঁধা মাস্তুলতোলা বৃহদাকার নৌকোর দল, নিমগ্নপ্রায় ধান এবং অর্দ্ধমগ্ন পাটের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত এঁকে বেঁকে কাল সন্ধ্যের সময় সাজাদপুরে এসে পৌচেছি। এখন কিছুদিনের মত এইখানেই স্থায়ী হওয়া গেল। অনেকদিন বোটে থাকার পর সাজাদপুরের বাড়িটা বেশ লাগে ভাল—একটা যেন নূতন স্বাধীনতা পাওয়া যায়—যতটা খুসি নড়বার চড়বার এবং শরীর প্রসারণ করবার জায়গা পাওয়া মানুষের মানসিক সুখের যে একটা প্রধান অঙ্গ সেটা হঠাৎ আবিষ্কার করা যায়। আজ প্রাতে মাঝে মাঝে বেশ একটুখানি রৌদ্র দেখা দিচ্চে, বাতাসটি চঞ্চলবেগে বচ্চে, ঝাউ এবং লিচুগাছ ক্রমাগত সরসর মরমর, করে দুল্‌চে, নানাজাতির পাখী নানা ভাষা নানা সুরে ডেকে ডেকে প্রাতঃকালের আরণ্য মজলিষ সরগরম করে তুলেছে। আমি আমাদের দোতলার এই সঙ্গীহীন প্রশস্ত নির্জ্জন আলোকিত উন্মুক্ত ঘরের মধ্যে বসে জানালা থেকে খালের উপরকার নৌকাশ্রেণী, ওপারের তরুমধ্যগত গ্রাম এবং ওপারের অনতিদূরবর্ত্তী লোকালয়ের মৃদু কর্ম্মপ্রবাহ নিরীক্ষণ করে বেশ একটুখানি মনের আনন্দে আছি। পাড়াগাঁয়ের কর্ম্মস্রোত খুব বেশি তীব্রও নয়, অথচ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নির্জ্জীবও নয়। কাজ এবং বিশ্রাম দুই যেন পাশাপাশি মিলিত হয়ে হাতধরাধরি করে চলেচে। খেয়ানৌকো পারাপার করচে, পান্থরা ছাতা হাতে করে খালের ধারের রাস্তা দিয়ে চলেছে, মেয়েরা ধুচুনি ডুবিয়ে চাল ধুচ্চে, চাষারা আঁটিবাঁধা পাট মাথায় করে হাটে আস্‌চে—দুটো লোক একটা গাছের গুঁড়ি মাটিতে ফেলে কুড়ুল নিয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দে কাঠ চেলা করচে, একটা ছুতোর অশথ গাছের তলায় জেলেডিঙি উল্‌টে ফেলে বা টারি হাতে মেরামত করচে,

গ্রামের কুকুরটা খালের ধারে ধারে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্চে, গুটিকতক গরু বর্ষার ঘাস অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহারপূর্ব্বক অলসভাবে রৌদ্রে মাটির উপর পড়ে কান এবং লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্চে, এবং কাক এসে তাদের মেরুদণ্ডের উপর বসে যখন বড় বেশি বিরক্ত করচে তখন একবার পিঠের দিকে মাথাটা নেড়ে আপত্তি জানাচ্চে। এখানকার এই দুই একটা একঘেয়ে ঠক্ ঠক্ ঠুক্ ঠাক্ শব্দ, উলঙ্গ ছেলে-মেয়েদের খেলার কল্লোল, রাখালের করুণ উচ্চস্বরে গান, দাঁড়ের ঝুপ্ ঝাপ ধ্বনি, কলুর ঘানির তীক্ষ্ণকাতর নিখাদস্বর, সমস্ত কর্ম্মকোলাহল একত্র মিলে এই পাখীর ডাক এবং পাতার শব্দের সঙ্গে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য ঘটাচ্চে না—সমস্তটাই যেন একটা শান্তিময় স্বপ্নময় করুণামাখা একটা বড় সঙ্গীতের অন্তর্গত—খুব বিস্তৃত বৃহৎ অথচ সংযত মাত্রায় বাঁধা। আমার মাথার মধ্যে সূর্য্যের আলোক এবং এই সমস্ত শব্দ একেবারে যেন কানায় কানায় ভরে এসেছে অতএব চিঠি বন্ধ করে খানিকক্ষণ পড়ে থাকা যাক্।

৯১

সাজাদপুর,

১০ই জুলাই, ১৮৯৩।

এসব গান যেন একটু নিরালায় গাবার মত। সুরটা যে মন্দ হয়েচে এমন আমার বিশ্বাস নয়, এমন কি ভাল হয়েছে বল্লে খুব বেশি অত্যুক্তি হয় না। ও গানটা আমি নাবার ঘরে অনেকদিন একটু একটু করে সুরের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করেছিলুম। নাবার ঘরে গান তৈরি করবার ভারি কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ নিরালা, দ্বিতীয়ত অন্য কোনো কর্ত্তব্যের কোনো দাবী থাকেনা। মাথায় এক টিন জল ঢেলে পাঁচ মিনিট গুন গুন করলে কর্ত্তব্যজ্ঞানে বিশেষ আঘাত লাগেনা—সব চেয়ে সুবিধা হচ্চে কোনো দর্শক-সম্ভাবনামাত্র না থাকাতে সমস্ত মন খুলে মুখভঙ্গী করা যায়। মুখভঙ্গী না করলে গান তৈরি করবার পুরো অবস্থা কিছুতেই আসে না। ওটা কিনা ঠিক যুক্তিতর্কের কাজ নয়—নিছক ক্ষিপ্তভাব। এ গানটা আমি এখনো সর্ব্বদা গেয়ে থাকি—আজ প্রাতঃকালেও অনেকক্ষণ গুন্ গুন্ করেছি, গাইতে গাইতে গভীর একটা ভাবোন্মাদও জন্মায় অতএব এটা যে আমার একটা প্রিয় গান সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

এখানে আমি একলা খুব মুগ্ধ এবং তদ্গতচিত্তে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে গেয়ে থাকি এবং জীবন ও পৃথিবীটা একটি সূর্য্যকরোজ্জ্বল অতি সূক্ষ্ম অশ্রুবাষ্পে আবৃত হয়ে সাতরঙা ইন্দ্রধনু-রেখায় রঞ্জিত হয়ে দেখা দেয়—প্রতিদিনের সত্যকে চিরদিনের সৌন্দর্য্যের মধ্যে তর্জ্জমা করে দেওয়া যায়—দুঃখকষ্টও আভাময় হয়ে ওঠে। অনতিবিলম্বেই খাজাঞ্চি এক ছটাক মাখন, এক পোয়া ঘি ও ছয় পয়সার সর্ষপ তৈলের হিসাব এনে উপস্থিত করে। আমার এখানকার ইতিহাস এইরকম।

—*—

৭২

সাজাদপুর,

৩০শে আষাঢ়, ১৮৯৩।

আজকাল কবিতা লেখাটা আমার পক্ষে যেন একটা গোপননিষিদ্ধ সুখসম্ভোগের মত হয়ে পড়েচে—এদিকে আগামী মাসের সাধনার জন্যে একটি লাইন লেখা হয়নি, ওদিকে মধ্যে মধ্যে সম্পাদকের তাড়া আসচে, অনতিদূরে আশ্বিনকার্ত্তিকের যুগল সাধনা রিক্ত হস্তে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনা করচে, আর আমি আমার কবিতার অন্তঃপুরে পালিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিচ্চি। রোজ মনে করি আজ একটা দিন বৈত নয়—এমনি করে কত দিন কেটে গেল। আমি বাস্তবিক ভেবে পাইনে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক এক সময় মনে হয় আমি ছোট ছোট গল্প অনেক লিখ্‌তে পারি এবং মন্দ লিখ্‌তে পারিনে—লেখ্‌বার সময় সুখও পাওয়া যায়। এক এক সময় মনে হয় আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয় সেগুলো ডায়ারি প্রভৃতি নানা আকারে প্রকাশ করে রেখে দেওয়া ভাল, বোধ হয় তাতে ফলও আছে আনন্দও আছে। এক এক সময় সামাজিক বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা খুব দরকার, যখন আর কেউ করচেনা তখন কাজেই আমাকে এই অপ্রিয় কর্ত্তব্যটা গ্রহণ করতে হয়—আবার এক এক সময় মনে হয় দূর হোকগে ছাই, পৃথিবী আপনার চরকায় আপনি তেল দেবে এখন,—মিল করে ছন্দ গেঁথে ছোট ছোট কবিতা লেখাটা আমার বেশ আসে, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আপনার মনে আপনার কোণে সেই কাজই করা যাক্। মদগর্ব্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনটিকেই হাতছাড়া করতে চায়না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েচে। মিউজ্‌দের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাইনে—কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং হয়ত "দীর্ঘ দৌড়ে" কোনটিই পরিপূর্ণভাবে আমার আয়ত্ত হয়না। সাহিত্যবিভাগেও কর্ত্তব্যবুদ্ধির অধিকার আছে কিন্তু অন্য বিভাগের কর্ত্তব্যবুদ্ধির সঙ্গে তার একটু প্রভেদ আছে। কোন্‌টাতে পৃথিবীর সব চেয়ে

উপকার হবে সাহিত্যকর্ত্তব্যজ্ঞানে সে কথা ভাববার দরকার নেই কিন্তু কোন্‌টা আমি সব চেয়ে ভাল করতে পারি সেইটেই হচ্চে বিচার্য্য। বোধ হয় জীবনের সকল বিভাগেই তাই। আমার বুদ্ধিতে যতটা আসে তাতেত বোধ হয় কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার। কিন্তু আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্ব্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয় এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তাহলেত মন্দ হয় না—আবার যখন একটা কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এম্‌নি নেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই কি, এটাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার যখন "বাল্য-বিবাহ" কিম্বা "শিক্ষার হেরফের" নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয় এই হচ্চে জীবনের সর্ব্বোচ্চ কাজ। আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যিকথা যদি বল্‌তে হয় তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্ব্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি—কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মত তাঁকেও সহজে পাবার যো নেই—তাঁর একেবারে ধনুকভাঙা পণ—তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান্ না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। একলা কবিতাটিকে নিয়ে থাকাই আমার পক্ষে সব চেয়ে সুবিধে—বোধ হয় যেন উনিই আমাকে সবচেয়ে বেশি ধরা দিয়েছেন—আমার ছেলেবেলাকার আমার বহুকালের অনুরাগিনী সঙ্গিনী।

নীরব কবিসম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠেছে সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সরব এবং নীরবের মধ্যে অনুভূতির পরিমাণ সমান থাক্‌তে পারে কিন্তু আসল কবিত্ব জিনিষটি স্বতন্ত্র। কেবল ভাষার ক্ষমতা বলে' নয়, গঠন করবার শক্তি। একটা অলক্ষিত অচেতন নৈপুণ্য বলে ভাবগুলি কবির হাতে বিচিত্র আকার ধারণ করে। সেই সৃজন-ক্ষমতাই কবিত্বের মূল। ভাষা, ভাব এবং অনুভাব তার সরঞ্জামমাত্র। কারো বা ভাষা আছে কারো বা অনুভাব আছে, কারো বা ভাষা এবং অনুভাব দুই আছে, কিন্তু আর একটি ব্যক্তি আছে যার ভাষা অনুভাব এবং সৃজনীশক্তি আছে, এই শেষোক্ত লোকটিকে কবি নাম দেওয়া যেতে পারে। প্রথমোক্ত তিনটি লোক নীরবও হতে পারেন সরবও হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা কবি নন। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে ভাবুক বল্লেই ঠিক বিশেষণটা প্রয়োগ করা হয়। তাঁরাও জগতে অত্যন্ত দুর্লভ এবং কবির তৃষিত চিত্ত সর্ব্বদাই তাঁদের জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে।

উপরে এই ভূমিকার পরে আমার সেই "জাল-ফেলা" কবিতাটার ব্যাখ্যা একটু সহজ হবে। লেখাটা চোখের সামনে থাক্‌লে তার মানে নিজে একটু ভাল করে বুঝে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারতুম—তবু একটা ঝাপসারকমের ভাব মনে আছে। মনে কর একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রভাতকালে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্য্যোদয় দেখছিল; সে সমুদ্রটা তার আপনার মন কিম্বা ঐ বাহিরের বিশ্ব কিম্বা উভয়ের সীমানামধ্যবর্ত্তী একটি ভাবের পারাবার, সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। যাই হোক সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় অগাধ সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে লোকটার মনে হল এই রহস্যপাথারের মধ্যে জাল ফেলে দেখা যাক্‌না কি পাওয়া যায়। এই বলেত সে ঘুরিয়ে জাল ফেল্‌লে। নানারকমের অপরূপ জিনিষ উঠ্‌তে লাগ্‌ল—কোনটা বা হাসির মত শুভ্র কোনটা বা অশ্রুর মত উজ্জ্বল, কোনটা বা লজ্জার মত রাঙা। মনের উৎসাহে সে সমস্ত দিন ধরে ঐ কাজই কেবল করলে—গভীর তলদেশে যে সকল সুন্দর রহস্য ছিল সেইগুলিকে তীরে এনে রাশীকৃত করে তুল্‌লে। এম্‌নি করে জীবনের সমস্ত দিনটি যাপন করলে। সন্ধ্যার সময় মনে করলে এবারকার মত যথেষ্ট হয়েছে এখন এইগুলি নিয়ে তাকে দিয়ে আসা যাক্‌গে। কাকে যে সে কথাটা স্পষ্ট করে বলা হয়নি—হয়ত তার প্রেয়সীকে, হয়ত তার স্বদেশকে। কিন্তু যাকে দেবে সেত এ সমস্ত অপূর্ব্ব জিনিষ কখনো দেখেনি। সে ভাবলে এগুলো কি, এর আবশ্যকতাই বা কি, এতে কি অভাব দূর হবে, দোকানদারের কাছে যাচিয়ে দেখ্‌লে এর কতই বা মূল্য হতে পারবে! এক কথায়, এ বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নয় এ কেবল কতকগুলো রঙীন্ ভাবমাত্র, তারও যে কোন্‌টার কি নাম কি বিবরণ তারও ভাল পরিচয় পাওয়া যায় না। ফলতঃ সমস্ত দিনের জালফেলা অগাধ সমুদ্রের এই রত্নগুলি যাকে দেওয়া গেল সে বল্লে এ আবার কি? জেলেরও মনে তখন অনুতাপ হল, সত্যি বটে, এ ত বিশেষ কিছু নয়, আমি কেবল জাল ফেলেছি আর তুলেছি; আমিত হাটেও যাইনি পয়সা কড়িও খরচ করিনি এর জন্যেত আমাকে কাউকে এক পয়সা খাজনা কিম্বা মাশুল দিতে হয়নি! সে তখন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণমুখে লজ্জিতভাবে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের দ্বারে বসে বসে একে একে রাস্তায় ফেলে দিলে। তার পর দিন সকাল বেলায় পথিকরা এসে সেই বহুমূল্য জিনিষগুলি দেশে বিদেশে আপন আপন ঘরে নিয়ে গেল। বোধ হচ্চে এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তিনি মনে করচেন, তাঁর গৃহকার্য্যনিরতা অন্তঃ-

পুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী, তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহ করতে পারবেনা, তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়, অতএব এখনকার মত এ সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে, তোমরাও অবহেলা কর আমিও অবহেলা করি কিন্তু এরাত্রি যখন পোহাবে তখন "পষ্টারিটি" এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে। কিন্তু তাতে ঐ জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে?—যাইহোক্, "পষ্টারিটি" যে অভিসারিণী রমণীর মত দীর্ঘরাত্রি ধরে ধীরে ধীরে কবির দিকে অগ্রসর হচ্চে এবং হয়ত নিশিশেষে এসে উপস্থিত হতেও পারে এ সুখকল্পনাটুকু কবিকে ভোগ করতে দিতে কারো বোধহয় আপত্তি না হতেও পারে।—সেই মন্দিরের কবিতার ঠিক অর্থটা কি ভাল মনে পড়চেনা। বোধহয় সেটা সত্যিকার মন্দির সম্বন্ধে। অর্থাৎ যখন কোণে বসে বসে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন করে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয়বজ্র পড়ে, সেই সমস্ত সুদীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায় তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, সূর্য্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে তন্ত্রমন্ত্র ধূপধূনার স্থান অধিকার করে এবং তখন দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি।

পতিসর,

৯১

১১ই আগষ্ট ১৮৯৩

অনেকগুলো বড় বড় বিলের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে। এই বিলগুলো ভারি অদ্ভুত—কোনো আকার আয়তন নেই, জলেস্থলে একাকার—পৃথিবী সমুদ্রগর্ভ থেকে নতুন জেগে উঠ্‌বার সময় যেমন ছিল। কোথাও কিছু কিনারা নেই—খানিকটা জল খানিকটা মগ্নপ্রায় ধানক্ষেতের মাথা, খানিকটা শেওলা এবং জলজ উদ্ভিদ ভাস্‌চে—পানকৌড়ি সাঁতার দিচ্চে—জাল ফেলবার জন্যে বড় বড় বাঁশ পোতা, তারি উপর কটা রঙের বড় বড় চিল বসে আছে—ভারি একাকার একঘেয়েরকমের দৃশ্য। দ্বীপের মত অতিদূরে গ্রামের রেখা দেখা যাচ্চে—যেতে যেতে হঠাৎ আবার খানিকটা নদী, দুধারে গ্রাম, পাটের ক্ষেত এবং বাঁশের ঝাড়, আবার কখন যে সেটা বিস্তৃত বিলের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্চে বোঝবার যো নেই।

ঠিক সূর্য্যাস্তের কাছাকাছি সময় যখন একটি গ্রাম পেরিয়ে আসছিলুম একটা লম্বা নৌকোয় অনেকগুলো ছোক্‌রা ঝপ্‌ ঝপ্‌ করে দাঁড় ফেলছিল এবং সেই তালে গান গাচ্ছিল—

"যোবতী, ক্যান্‌ বা কর মন্‌ ভারী?
পাবনা থাক্যে আন্যে দেব ট্যাকা দামের মোটরি।"

স্থানীয় কবিটি যে ভাব অবলম্বন করে সঙ্গীত রচনা করেচেন আমরাও ওভাবের ঢের লিখেছি কিন্তু ইতরবিশেষ আছে।—আমাদের যুবতী মন ভারী করলে তৎক্ষণাৎ জীবনটা কিম্বা নন্দনকানন থেকে পারিজাতটা এনে দিতে প্রস্তুত হই—কিন্তু এ অঞ্চলের লোক খুব সুখে আছে বল্‌তে হবে, অল্প ত্যাগস্বীকারেই যুবতীর মন পায়। মোটরি জিনিষটি কি তা বলা আমার সাধ্য নয়, কিন্তু তার দামটাও নাকি পার্শ্বেই উল্লেখ করা আছে তাতেই বোঝা যাচ্চে খুব বেশি দুর্ম্মূল্য নয়, এবং নিতান্ত অগম্য স্থান থেকেও আনতে হয় না। গানটা শুনে বেশ মজার লাগ্‌ল—যুবতীর মন ভারি হলে

জগতে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় এই বিলের প্রান্তেও তার একটা সংবাদ পাওয়া গেল। এ গানটি কেবল অস্থানেই হাস্যজনক কিন্তু দেশকালপাত্রবিশেষে এর যথেষ্ট সৌন্দর্য্য আছে—আমার অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য কবিভ্রাতার রচনাগুলিও এই গ্রামের লোকের সুখদুঃখের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক—আমার গানগুলি সেখানে কম হাস্যজনক নয়।

পতিসার,

৯৪ ১৩ই আগষ্ট, ১৮৯৩।

এবার এই বিলের পথ দিয়ে কালিগ্রামে আস্‌তে আস্‌তে আমার মাথায় একটি ভাব বেশ পরিষ্কাররূপে ফুটে উঠেছে। কথাটা নতুন নয় অনেকদিন থেকে জানি কিন্তু তবু একএকবার পুরোনো কথাও নতুন করে অনুভব করা যায়। দুই দিকে দুই তীর দিয়ে সীমাবদ্ধ না থাক্‌লে জলস্রোতের তেমন শোভা থাকেনা—অনির্দ্দিষ্ট অনিয়ন্ত্রিত বিল একঘেয়ে শোভাশূন্য। ভাষার পক্ষে ছন্দের বাঁধন ঐ তীরের কাজ করে। ভাষাকে একটি বিশেষ আকার এবং বিশেষ শোভা দেয়—তার একটি সুন্দর চেহারা ফুটেওঠে। তীরবদ্ধ নদীগুলির যেমন একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে—তাদের যেমন এক একটি স্বতন্ত্র লোকের মত মনে হয় ছন্দের দ্বারা কবিতা সেইরূপ এক একটি মূর্ত্তিমান অস্তিত্বের মত দাঁড়িয়ে যায়। গদ্যের সেইরকম সুন্দর সুনির্দ্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্য নেই—সে একটা বৃহৎ বিশেষত্ববিহীন বিলের মত। আবার তটের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতেই নদীর মধ্যে একটা বেগ আছে একটা গতি আছে—কিন্তু প্রবাহহীন বিল কেবল বিস্তৃতভাবে দিগ্‌বিদিক্‌গ্রাস করে পড়ে থাকে। ভাষার মধ্যেও যদি একটা আবেগ একটা গতি দেবার প্রয়োজন হয় তবে তাকে ছন্দের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে বেঁধে দিতে হয়—নইলে সে কেবল ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে কিন্তু সমস্ত বল নিয়ে একদিকে ধাবিত হতে পারে না। বিলের জলকে পল্লিগ্রামের লোকেরা বলে বোবা জল—তার কোনো ভাষা নেই, আত্মপ্রকাশ নেই। তটবদ্ধ নদীর মধ্যে সর্ব্বদা একটা কলধ্বনি শোনা যায়; ছন্দের মধ্যে বেঁধে দিলে কথাগুলোও সেই-রকম পরস্পরের প্রতি আঘাত সংঘাত করে একটা সঙ্গীতের সৃষ্টি করতে থাকে—সেই জন্যে ছন্দের ভাষা বোবা ভাষা নয়, তার মুখে সর্ব্বদাই কলগান। বাঁধনের মধ্যে থাকা-তেই গতির সৌন্দর্য্য, ধ্বনির সৌন্দর্য্য এবং আকারের সৌন্দর্য্য। বাঁধনের মধ্যে থাকাতে যেমন সৌন্দর্য্য তেমনি শক্তি। কবিতা যে স্বভাবতই ধীরে ধীরে একটি ছন্দের মধ্যে ধরা দিয়ে আপনাকে পরিস্ফুট করে তুলেছে ওটা একটি কৃত্রিম অভ্যাসজাত সুখ দেবার জন্যে

নয়—ওর একটি গভীর স্বাভাবিক সুখ আছে। অনেক মূর্খ মনে করে কবিতার ছন্দোবন্ধ কেবল একটা বাহাদুরী করা; ওতে কেবল সাধারণ লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে সুখ দেয়—ও কেবল ভাষার ব্যায়াম মাত্র। কিন্তু সে ভারি ভুল। কবিতার ছন্দ যে নিয়মে উৎপন্ন হয়েছে, বিশ্বজগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যই সেই নিয়মে সৃষ্ট হয়েছে। একটি সুনির্দ্দিষ্ট বন্ধনের মধ্যে দিয়ে বেগে প্রবাহিত হয়ে মনের মধ্যে আঘাত করে বলেই সৌন্দর্য্যের এমন অনিবার্য্য শক্তি। আর সুষমার বন্ধন ছাড়িয়ে গেলেই সব একাকার হয়ে যায় তার আর আঘাত করবার শক্তি থাকে না। বিল ছাড়িয়ে যেমনি নদীতে এবং নদী ছাড়িয়ে যেম্‌নি বিলে গিয়ে পড়্‌ছিলুম অমনি আমার মনে এই তত্ত্বটি দেদীপ্যমান হয়ে জেগে উঠ্‌ছিল।

—•—

৯৮

পতিসার,

২৬শে শ্রাবণ, ১৩৯৩।

আমি অনেকদিন থেকে ভেবে দেখেছি পুরুষরা কিছু খাপছাড়া আর মেয়েরা বেশ সুসম্পূর্ণ। মেয়েদের কথাবার্ত্তা বেশভূষা, চালচলন, আচারব্যবহার এবং জীবনের কর্ত্তব্যের মধ্যে একটি অখণ্ড সামঞ্জস্য আছে। তার প্রধান কারণ হচ্চে যুগযুগান্তর থেকে প্রকৃতি তাদের কর্ত্তব্য নিজে নির্দ্দিষ্ট করে দিয়ে তাদের আগাগোড়া সেই ভাবে সেই উদ্দেশ্যে গঠিত করে দিয়েছে। এ পর্য্যন্ত কোনো পরিবর্ত্তন কোনো রাষ্ট্রবিপ্লব সভ্যতার কোনো ভাঙন-গড়নে তাদের সেই ঐক্য থেকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়নি—তারা বরাবর সেবা করেছে, ভাল বেসেছে, আদর করেছে, আর কিছু করেনি। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভাষায় ভঙ্গীতে সেই কাজের নৈপুণ্য এবং সৌন্দর্য্য যেন মিশে এক হয়ে গেছে—তাদের স্বভাব এবং তাদের কাজ যেন পুষ্প এবং পুষ্পের গন্ধের মত সম্মিলিত হয়ে গেছে—তাদের মধ্যে সেই জন্যে কোনো বিরোধ কোনো ইতস্ততঃ নেই। পুরুষের চরিত্রের মধ্যে বিস্তর উঁচু নীচু, তারা যে নানাকার্য্যে নানাশক্তি নানাপরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে তৈরি হয়ে এসেছে তাদের অঙ্গে এবং স্বভাবে তার যেন চিহ্ন রয়ে গেছে। কোথাও কিছু নেই কপালটা হয়ত বৃহৎ উঁচু হয়ে উঠ্‌ল, মাঝের থেকে হয়ত নাকটা এমনি ঠেলে উঠ্‌ল যে, তাকে কার সাধ্য দাবিয়ে রাখে—চোয়াল দুটো হয়ত সুষমার কোনো নিয়ম মান্‌লেনা। যদি চিরকাল পুরুষ একভাবে চালিত, এককার্য্যে শিক্ষিত হয়ে আস্‌ত তা হলে তাদেরও মুখে এবং স্বভাবে একটা সামঞ্জস্য দাঁড়িয়ে যেত; একটা ছাঁচ বহুকাল থেকে তৈরি হয়ে যেত;—তাহলে তাদের আর বল প্রকাশ করে বহুচিন্তা করে কাজ করতে হত না, সকল কাজ সুন্দরভাবে সহজে সম্পন্ন হত; তাহলে তাদের একটা সহজ নীতিও দাঁড়িয়ে যেত—অর্থাৎ বহুযুগ থেকে অবিচ্ছেদে যে কাজ করে আস্‌চে সেই কাজের কাছে তাদের মন বশ মান্‌ত, সেই বহুযুগের অভ্যস্ত কর্ত্তব্য থেকে কোনো সামান্য শক্তি তাদের বিক্ষিপ্ত করতে পারত না। স্ত্রীলোককে প্রকৃতি মা

করে দিয়ে তাকে একেবারে ছাঁচে ঢালাই করে ফেলেছে—পুরুষের সেরকম কোনো স্বাভাবিক আদিম বন্ধন নেই, সেইজন্যে একটি ধ্রুবকেন্দ্র আশ্রয়ে পুরুষ সর্ব্বতোভাবে তৈরি হয়ে যায়নি—সে চিরকাল ধরে কেবলি বিক্ষিপ্ত হয়ে হয়ে এসেছে—তার শতমুখী উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি তাকে একটি সুন্দর সমগ্রতায় গড়ে তোলেনি। আমি সেদিনকার চিঠিতে বন্ধনকে সৌন্দর্য্যের কারণ বলে অনেকখানি লিখেছিলুম মনে আছে—মেয়েরা সেইরকম একটি স্বাভাবিক ছন্দের বন্ধনে সম্পূর্ণসুন্দর হয়ে তৈরি হয়ে এসেছে—আর পুরুষরা গদ্যের মত বন্ধনহীন এবং সৌন্দর্য্যহীন—তাদের আগাগোড়ার মধ্যে কোনো একটি "ছাঁদ নেই।" মেয়েদের সঙ্গে যে লোকে চিরকাল সঙ্গীতের কবিতার, লতার, ফুলের, নদীর তুলনা দিয়ে এসেছে এবং কখনো পুরুষের সঙ্গে দেবার কথা তাদের মনেও উদয় হয়নি তার কারণই এই। প্রকৃতির সমস্ত সুন্দর জিনিষ যেমন সুসম্বদ্ধ সুসম্পূর্ণ সুসংহত সুসংযত মেয়েরাও সেইরকম; তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা কোনো চিন্তা কোনো মনন এসে তাদের ছন্দোভঙ্গ করে দিচ্চে না, কোনো তর্ক এসে তাদের মিল নষ্ট করে দিচ্চে না।

৯৮ কলকাতা,

২১ শে আগষ্ট ১৮৯৩।

আজ কতকগুলো খবরের কাগজের কাঁচিছাঁটা টুক্‌রো পাওয়া গেল। কোথায় প্যারিসের আর্টিষ্ট্ সম্প্রদায়ের উদ্দাম উন্মত্ততা আর কোথায় আমার কালিগ্রামের সরল চাষী প্রজাদের দুঃখদৈন্য নিবেদন! আমার কাছে এই সমস্ত দুঃখপীড়িত অটল বিশ্বাসপরায়ণ অনুরক্ত প্রজাদের মুখে বড় একটি কোমল মাধুর্য্য আছে, বাস্তবিক এরা যেন আমার একটি দেশযোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের আপনার লোক মনে করতে একটা সুখ আছে। এরা অনেক দুঃখ অনেক ধৈর্য্যসহকারে সহ্য করেছে তবু এদের ভালবাসা কিছুতেই ম্লান হয় না। আজ একজন এসে বলছিল, "সে বছর ভাল ধান হয়নি বলে চুঁচড়োয় বুড়ো বাপের কাছে এন্‌ছাপ নিতে গিয়েছিলুম তা সে বল্লে আমি তোদের কিছু ছেড়ে দিচ্চি তোরাও আমাকে কিছু খেতে দিস্। তার কাছে দরবার করতে গিয়েছিলুম বলে সেই অপবাদে এখানকার আমিন আমাকে ফেরেবি মকদ্দমা করে তিন মাস জেল খাটিয়েছিল। আমি তখন তোমার মাটিকে সেলাম করে ভিন্ এলাকায় গিয়েছিলুম।"—কিন্তু তবু তার এম্‌নি ভক্তি যে সেই ভিন্ এলাকার জমিদার আমাদের কতক জমি চুরি করে ভোগ করছিল বলে সে এখানকার সেরেস্তায় জানিয়ে যায় সেই রাগে তার নতুন জমিদার তার ধানসুদ্ধ জমি কেড়ে নিয়েছে। সে বলে, "আমি যার মাটিতে বুড়োকাল পর্য্যন্ত মানুষ হয়েছি তার হিতের কথা তাকে আমি বল্‌তে পাবনা!" এই বলে সে চোখ থেকে দুই এক ফোঁটা জল মুছে ফেল্লে। সে যে কেমন সহজে কোনরকম চাতুরী না করে যেন একটা খবর দিয়ে যাবার মত সমস্তটা বলে গেল তা দেখলে এই ব্যাপারটার যথার্থ গভীরতা বুঝতে পারা যায়। এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা হয়, আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভাল মনে হয় তা এরা জানেনা। কিন্তু তবু প্যারিসের সভ্যতা থেকে কত তফাৎ! সে এর

চেয়ে কত কঠিন কত উজ্জ্বল কত সুগঠিত ! তবু এখানকার মানুষের মধ্যে যে জিনিষটি আছে সে বড় অনাদরের নয়। যতক্ষণ না সভ্যতার মাঝখানে এই স্বচ্ছ সরলতার প্রতিষ্ঠা হয় ততক্ষণ সভ্যতা কখনই সম্পূর্ণ এবং সুন্দর হবে না। সরলতাই মানুষের স্বাস্থ্যের একমাত্র উপায়—সে যেন গঙ্গার মত, তার মধ্যে স্নান করে সংসারের অনেক তাপ দূর হয়ে যায়। আর য়ুরোপ সমস্ত তাপকে যেন লালন করে তুলচে এবং তার উপরে আবার সহস্রবিধ মাদকতার কৃত্রিম উত্তাপে আপনাকে রাত্রিদিন উত্তেজিত করে তুলচে। খবরের কাগজের যে কটি টুক্‌রো এসেছে প্রত্যেকটিতেই এই প্রমাণ দেয় !

৯৭

পতিসার,

১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪।

যে পারে বোট লাগিয়েছি এপারে খুব নির্জ্জন। গ্রাম নেই বসতি নেই চষা মাঠ ধূ ধূ করচে, নদীর ধারে ধারে খানিকটা করে শুক্‌নো ঘাসের মত আছে সেই ঘাসগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে গোটাকতক মোষ চরে বেড়াচ্চে। আর আমাদের ছুটো হাতী আছে তারাও এপারে চরতে আসে। তাদের দেখ্‌তে বেশ মজা লাগে। একটা পা উঠিয়ে ঘাসের গোড়ায় তু চার বাব একটু একটু ঠোকর মারে, তার পরে শুঁড় দিয়ে টান মারতেই বড় বড় ঘাসের চাপড়া একেবারে মাটিসুদ্ধ উঠে আসে, সেই চাপড়াগুলো শুঁড়ে করে ছুলিয়ে ছুলিয়ে ঝাড়ে, তার মাটিগুলো ঝরে ঝরে পড়ে যায়, তার পরে মুখের মধ্যে পূরে দিয়ে খেয়ে ফেলে। আবার এক একসময় খেয়াল যায়, খানিকটা ধূলো শুঁড়ে করে নিয়ে ফুঁ দিয়ে নিজের পেটে পিঠে সর্ব্বাঙ্গে হুস্ করে ছড়িয়ে দেয়—এই-রকম ত হাতির প্রসাধনক্রিয়া। বৃহৎ শরীর, বিপুল বল, শ্রীহীন আয়তন, অত্যন্ত নিরীহ—এই প্রকাণ্ড জন্তুটাকে দেখ্‌তে আমার বেশ লাগে। এর এই প্রকাণ্ডত্ব এবং বিশ্রীত্বর জন্যেই যেন এর প্রতি একটা কি বিশেষ স্নেহের উদ্রেক হয়—এর সর্ব্বাঙ্গের অসৌষ্ঠব থেকে এ'কে একটা মস্ত শিশুর মত মনে হয়। তাছাড়া জন্তুটা বড় উদার প্রকৃতির—শিব ভোলানাথের মত—যখন ক্ষ্যাপে তখন খুব ক্ষ্যাপে যখন ঠাণ্ডা হয়—তখন অগাধ শান্তি। বড়ত্বর সঙ্গে সঙ্গে যে একরকম শ্রীহীনত্ব আছে—তাতে অন্তরকে বিমুখ করে না, বরঞ্চ আকর্ষণ করে আনে। আমার ঘরে যে বেঠোভেনের ছবি আছে অনেক সুন্দর মুখের সঙ্গে তুলনা করলে তাকে দর্শনযোগ্য মনে না হতে পারে, কিন্তু আমি যখন তার দিকে চাই সে আমাকে খুব টেনে নিয়ে যায়—ঐ উস্কোখুস্কো মাথাটার ভিতরে কতবড় একটা শব্দহীন শব্দজগৎ! এবং কি একটা বেদনা ময় অশান্ত ক্লিষ্ট প্রতিভা, রুদ্ধঝড়ের মত ঐ লোকটার ভিতবে ঘূর্ণ্যমান হত।

৯৮ পতিসার,

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪

মাঝে মাঝে মেঘ করচে—মাঝে মাঝে পরিষ্কার হয়ে যাচ্চে—থেকে থেকে হঠাৎ হুহু করে একটা হাওয়া এসে আমার বোটের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচিত্র ক্যাঁ কোঁঃ শব্দে আর্ত্তনাদ তুল্‌চে আজ দুপুর বেলাটা এম্‌নি ভাবে চল্‌চে।—

এখন বেলা একটা বেজেছে—পাড়াগেঁয়ে মধ্যাহ্নের এই হাঁসের ডাক, কাপড় কাচার শব্দ, নৌকো চলাচলের ছল্ ছল্ ধ্বনি, দূরে গোরুর পাল পার করবার হৈ হৈ রব, এবং আপনার মনের ভিতরকার একটা উদাস আলস্যপূর্ণ স্বগত সঙ্গীতস্বর কলকাতায় চৌকিটেবিলসমাকীর্ণ বর্ণবৈচিত্র্যবিহীন নিত্যনৈমিত্তিকতার মধ্যে কল্পনাও করতে পারিনে। কলকাতাটা বড় ভদ্র এবং বড় ভারি, গবর্মেণ্টের আপিসের মত। জীবনের প্রত্যেক দিনটাই যেন একই আকারে একই ছাপ নিয়ে টাঁকশাল থেকে তক্‌তকে হয়ে কেটে কেটে বেরিয়ে আস্‌চে—নীরস মৃত দিন; কিন্তু খুব ভদ্র এবং সমান ওজনের। এখানে আমি দলছাড়া—এবং এখানকার প্রত্যেক দিন আমার নিজের দিন—নিত্য-নিয়মিত দম-দেওয়া কলের সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার আপনার মনের ভাবনা-গুলি এবং অখণ্ড অবসরটিকে হাতে করে নিয়ে মাঠের মধ্যে বেড়াতে যাই—সময় কিম্বা স্থানের মধ্যে কোনো বাধা নেই। সন্ধ্যেটা জলে স্থলে আকাশে ঘনিয়ে আস্‌তে থাকে—আমি মাথাটা নীচু করে আস্তে আস্তে বেড়াতে থাকি।

৯৯

পতিসর,
১৯শে মার্চ্চ, ১৮৯৪।

জ্যোৎস্না প্রতি রাত্রেই অল্প অল্প করে ফুটে উঠ্‌চে। আমি তাই আজকাল সন্ধ্যের পরেও অনেকক্ষণ বাইরে বেড়াই। নদীর এপারের মাঠে কোথাও কিছু সীমাচিহ্ন নেই, গাছপালা নেই—চষা মাঠে একটি ঘাসও নেই, কেবল নদীর ধারের ঘাসগুলো প্রখর রৌদ্রে শুকিয়ে হলদে হয়ে এসেছে। জ্যোৎস্নায় এই ধূ ধূ শূন্য মাঠ ভারি অপূর্ব্ব দেখতে হয়।—সমুদ্র এইরকম অসীম বলে মনে হয় কিন্তু তার একটা অবিশ্রাম গতি এবং শব্দ আছে—এই মাটির সমুদ্রের কোথাও কিছু গতি নেই শব্দ নেই বৈচিত্র্য নেই প্রাণ নেই—ভারি একটা উদাস মৃত শূন্যতা—চল্‌বার মধ্যে কেবল এক প্রান্তে আমি একটি প্রাণী চলচি এবং আমার পায়ের কাছে একটি ছায়া চলে বেড়াচ্চে। বহুদূরের মাঠে এক এক জায়গায়—যেখানে গত শস্যের শুকনো গোড়া কিছু অবশিষ্ট ছিল সেইখানে চাষারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, মাঝে মাঝে কেবল সেই আগুনের শ্রেণী দেখা যাচ্চে। একটা প্রকাণ্ড বিস্তারিত প্রাণহীনতার উপর যখন অস্পষ্ট চাঁদের আলো এসে পড়ে তখন যেন একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদশোকের ভাব মনে আসে—যেন একটি মরুময় বৃহৎ গোরের উপরে একটি শাদা কাপড়পরা মেয়ে উপুড় হয়ে মুখ ঢেকে মূর্চ্ছিতপ্রায় নিস্তব্ধ পড়ে রয়েছে।

১০৩

পতিসর,

২৫শে মার্চ্চ, ১৮৯৪।

আজকাল আমার সন্ধ্যাভ্রমণের একমাত্র সঙ্গীটির অভাব হয়েছে। সেটি আর কেউ নয় আমাদের শুক্লপক্ষের চাঁদ। কালথেকে আর তাঁর দেখা নেই। ভারি অসুবিধে হয়েছে, শীঘ্রই অন্ধকার হয়ে যায়, যথেষ্ট বেড়াবার পক্ষে একটু ব্যাঘাত জন্মায়।

আজকাল ভোরের বেলায় চোখ মেলেই ঠিক আমার খোলা জানলার সাম্‌নেই শুকতারা দেখ্‌তে পাই—তাকে আমার ভারি মিষ্টি লাগে—সেও আমার দিকে চেয়ে থাকে, যেন বহুকালের আমার আপনার লোক। মনে আছে যখন শিলাইদহে কাছারি করে সন্ধ্যেবেলায় নৌকো করে নদী পার হতুম, এবং রোজ আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখতে পেতুম আমার ভারি একটা সান্ত্বনা বোধ হত। ঠিক মনে হত আমার নদীটি যেন আমার ঘরসংসার এবং আমার সন্ধ্যাতারাটি আমার এই ঘরের গৃহলক্ষ্মী—আমি কখন কাছারি থেকে ফিরে আস্‌ব এই জন্যে সে উজ্জ্বল হয়ে সেজে বসে আছে। তার কাছ থেকে এমন একটি স্নেহস্পর্শ পেতুম! তখন নদীটি নিস্তব্ধ হয়ে থাকৃত, বাতাসটি ঠাণ্ডা, কোথাও কিছু শব্দ নেই, ভারি যেন একটা ঘনিষ্ঠতার ভাবে আমার সেই প্রশান্ত সংসারটি পরিপূর্ণ হয়ে থাক্‌ত। আমার সেই শিলাইদহে প্রতি সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ অন্ধকারে নদী পার হওয়াটা খুব স্পষ্টরূপে প্রায়ই মনে পড়ে। ভোরের বেলায় প্রথম দৃষ্টিপাতেই শুকতারাটি দেখে তাকে আমার একটি বহুপরিচিত সহাস্য সহচরী না মনে করে থাক্‌তে পারিনে—সে যেন একটি চিরজাগ্রত কল্যাণকামনার মত ঠিক আমার নিদ্রিত মুখের উপর প্রফুল্ল স্নেহ বিকিরণ করতে থাকে।

আজ বেড়িয়ে বোটে ফিরে এসে দেখি বাতির কাছে এত বেশি পতঙ্গের ভিড় হয়েছে যে টেবিলে বসা অসাধ্য। আজ তাই বাতি নিবিয়ে দিয়ে বাইরে কেদারা নিয়ে অন্ধকারে বসেছিলুম—আকাশের সমস্ত জ্যোতির্জ্জগৎ, অনন্ত রহস্যের অন্তঃপুর-বাসিনী সমস্ত মেয়ের দলের মত উপরের তলার খড়খড়ি থেকে আমাকে দেখছিল,

আমি তাদের কিছুই জানিনে এবং কোনোকালেই জান্‌তে পাব কিনা তাও জানিনে—অথচ ঐ জ্যোতির্ম্মগুলীর মধ্যে বিচিত্র জীবনের অনন্ত ইতিহাস প্রবাহিত হয়ে যাচ্চে। আজ সন্ধ্যের সময় আর চিঠি লেখা হয়ে ওঠেনি—তাই এখন লিখ্‌চি। এখন কত রাত হবে? এগারোটা। যখন চিঠিটা পৌঁছবে তখন দিনের বেলাকার প্রখর আলোকে জগৎটা খুবই সজাগ চঞ্চল, নানান্‌ কাজে ব্যস্ত—তখন কোথায় এই সুষুপ্ত নিস্তব্ধ রাত্রি কোথায় ঐ অনন্ত বিশ্বলোকের জ্যোতির্ম্ময় শব্দহীন বার্ত্তা! এত সুতীব্র প্রভেদ! কিছুতে ঠিক ভাবটি আনা যায় না। মানুষের মনের ক্ষমতা এত সামান্য! যে খুবই পরিচিত, চোখ বুজে তার আকৃতির প্রত্যেক রেখাটি মনে আনা যায়না—একসময় যা সর্ব্বপ্রধান আর একসময় তা যথার্থরূপে স্মৃতিগম্য করাও শক্ত হয়ে ওঠে। দিনের বেলায় রাতকে ভুলি, রাতের বেলায় দিনকে ভুলি। চাঁদের খণ্ড অনেকক্ষণ হল উঠেছে—চতুর্দ্দিক একেবারে নিস্তব্ধ নিদ্রিত—কেবল গ্রামের গোটা দুই কুকুর ওপার থেকে ডাক্‌চে—আমার এই বোটে কেবল একটি বাতি জ্বল্‌চে—আর সর্ব্ব জায়গায় আলো নিবেছে—নদীতে একটু গতিমাত্র নাই, তাতেই মনে হয় মাছগুলো রাত্তিরে ঘুমোয়। জলের ধারে সুপ্ত গ্রাম এবং জলের উপর গ্রামের সুপ্ত ছায়া।

———•———

১৫১

পতিসর,

২২শে মার্চ্চ, ১৮৯৪।

"পশুপ্রীতি" বলে ব—একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছে—আজ সমস্ত সকালবেলায় সেইটে নিয়ে পড়েছিলুম। কাল আমি বোটে বসে জানলার বাইরে নদীর দিকে চেয়ে আছি এমন সময় হঠাৎ দেখি—একটা কি পাখী সাঁৎরে তাড়াতাড়ি ওপারের দিকে চলে যাচ্চে আর তার পিছনে মহা ধর্ ধর্ মার মার রব উঠেছে। শেষকালে দেখি একটি মুরগী—তার আসন্ন মৃত্যুকালে বাবুর্চ্চিখানার নৌকো থেকে হঠাৎ কিরকমে ছাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, ঠিক্ যেই তীরের কাছে গিয়ে পৌঁচেছে অমনি যমদূত মানুষ ক্যাঁক্ করে তার গলা টিপে ধরে আবার নৌকো করে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমি ফটিককে ডেকে বল্লুম আমার জন্যে আজ মাংস হবে না। এমন সময় ব—র পশুপ্রীতি লেখাটা এসে পৌঁছল—আমি পেয়ে কিছু আশ্চর্য্য হলুম। আমারত আর মাংস খেতে রুচি হয় না। আমরা যে কি অন্যায় এবং নিষ্ঠুর কাজ করি তা ভেবে দেখিনে বলে মাংস গলাধঃকরণ করতে পারি। পৃথিবীতে অনেক কাজ আছে যার দূষণীয়তা মানুষের স্বহস্তে গড়া—যার ভালমন্দ, অভ্যাসপ্রথা দেশাচার সমাজনিয়মের উপর নির্ভর করে কিন্তু নিষ্ঠুরতা সেরকম নয়, এটা একেবারে আদিম দোষ, এর মধ্যে কোনো তর্ক নেই, কোনো দ্বিধা নেই, হৃদয় যদি আমাদের অসাড় না হয়, হৃদয়কে যদি চোখ বেঁধে অন্ধ করে না রেখে দিই তাহলে নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে নিষেধ একেবারে স্পষ্ট শুনতে পাই—অথচ ওটা আমরা হেসেখেলে সকলে মিলে খুব অনায়াসে আনন্দসহকারে করে থাকি, এমন কি, যে না করে তাকে কিছু অদ্ভুত বলে মনে হয়। পাপপুণ্যসম্বন্ধে মানুষের এমনি একটা কৃত্রিম অপূর্ব্ব ধারণা। আমার বোধ হয় সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম সর্ব্ব জীবে দয়া। প্রেম হচ্চে সমস্ত ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। সেদিন একটা ইংরিজি কাগজে পড়লুম, পঞ্চাশহাজার পৌণ্ড মাংস ইংলণ্ড থেকে আফ্রিকার কোনো এক সেনানিবাসে পাঠান হয়েছিল—মাংসটা খারাপ হওয়াতে

তারা ফিরে পাঠিয়ে দেয় ; তার পরে সেই মাংস পোর্ট সমেৎ পাঁচ ছশ টাকায় নিলেম হয়ে যায়—ভেবে দেখ দেখি—জীবের জীবনের কি ভয়ানক অপব্যয় এবং কি অল্প মূল্য ! আমরা যখন একটা খানা দিই তখন কত প্রাণী কেবলমাত্র ডিশ পূরণের জন্যে আত্মবিসর্জ্জন দেয়, হয়ত কেবল ফিরে ফিরে যায় কেউ পাতে নেয়না। যতক্ষণ আমরা অচেতনভাবে থাকি এবং অচেতনভাবে হিংসা করি ততক্ষণ আমাদের কেউ দোষ দিতে পারেনা। কিন্তু যখন মনে দয়া উদ্রেক হয় তখন যদি সেই দয়াটাকে গলা টিপে মেরে দশজনের সঙ্গে মিশে হিংস্রভাবে কাজ করে যাই তাহলেই যথার্থ আপনার সমস্ত সাধুপ্রকৃতিকে অপমান করা হয়। আমিত মনে করেছি—আরো একবার নিরামিষ খাওয়া ধরে দেখ্‌ব।

আমার একটি নির্জ্জনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে—আমি লোকেনের ওখান থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি—যখনি সময় পাই সেই বইটা উল্টে পাল্টে দেখি—ঠিক মনে হয় তার সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে কথা কচ্চি—এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি। অনেক বই এর চেয়ে ভাল লেখা আছে এবং এই বইয়ের অনেক দোষ থাক্‌তে পারে কিন্তু এই বইটি আমার মনের মত। অনেক সময় আসে যখন সব বই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলে দিতে হয় কোনোটা ঠিক আরামের বোধ হয় না—যেমন রোগের সময় অনেক সময় বিছানার ঠিক আরামের অবস্থাটি পাওয়া যায় না, নানারকমে পাশ ফিরে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে, কখনো বালিশের উপর বালিশ চাপাই, কখনো বালিশ ফেলে দিই, সেইরকম মানসিক অবস্থায় আমিয়েলের যেখানেই খুলি সেখানেই মাথাটি ঠিক গিয়ে পড়ে শরীরটা ঠিক বিশ্রাম পায়। আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু আমিয়েল পশুদের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতাসম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছে—ব—র লেখায় আমি সেইটে সমস্তটা নোট বসিয়ে দিয়েছি। কাদম্বরীর সেই মৃগয়া বর্ণনা থেকে অনেকটা আমি ব—কে তর্জ্জমা করতে বলে দিয়েছি। পাখীরাও যে কতকটা আমাদেরি মত—একটা জায়গায় আছে যেখানে তাতে আমাতে প্রভেদ নেই—এইটে বাণভট্ট আপন করুণ কল্পনাশক্তির দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করেছেন।

১০২

পতিসর,

২৮শে মার্চ্চ, ১৮৯৪।

এদিকে গরমটাও বেশ পড়েছে—কিন্তু রৌদ্রের উত্তাপটাকে আমি বড় একটা গ্রাহ্য করিনে। তপ্ত বাতাস ধুলোবালি খড়কুটো উড়িয়ে নিয়ে হুহু শব্দ করে ছুটেছে—প্রায়ই হঠাৎ এক এক জায়গায় একটা আজ্গবি ঘুর্ণিবাতাস দাঁড়িয়ে উঠে শুক্নো পাতা এবং ধুলোর ওড়না ঘুরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নেচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্চে—সেটা দেখ্তে বেশ লাগে। নদীর ধারে বাগান থেকে পাখীগুলো ভারি মিষ্টি করে ডাক্চে—মনে হচ্চে ঠিক বসন্তই বটে, তপ্ত খোলা থেকে একেবারে গরম গরম নাবিয়ে এনেছে—কিন্তু গরমটা পরিমাণে কিঞ্চিৎ বেশি, আর একটুখানি জুড়িয়ে আন্লে বিশেষ ক্ষতি ছিলনা। আজ সকাল বেলাটায় হঠাৎ দিব্যি ঠাণ্ডা পড়েছিল—এমন কি, প্রায় শীতকালেরই মত—স্নান করবার সময় মনে খুব প্রবল উৎসাহ ছিলনা। এই প্রকৃতি নামক একটা বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কখন যে কি হচ্চে তার হিসেব পাওয়া শক্ত—কোথায় তার কোন্ অজ্ঞাত কোণে কি একটা কাণ্ড ঘটচে আর অকস্মাৎ চারদিকের সমস্ত ভাবখানা বদ্লে যাচ্চে। আমি কাল ভাবছিলুম মানুষের মনখানাও ঠিক ঐ প্রকাণ্ড প্রকৃতির মত রহস্যময়। চতুর্দ্দিকে শিরা উপশিরা স্নায়ু মস্তিষ্ক মজ্জার ভিতর কি এক অবিশ্রাম ইন্দ্রজাল চল্চে—হুহুঃশব্দে রক্তস্রোত ছুটেছে স্নায়ুগুলো কাঁপচে হৃৎপিণ্ড উঠ্‌চে পড়চে, আর এই রহস্যময়ী মানবপ্রকৃতির মধ্যে ঋতু পরিবর্ত্তন হচ্চে। কোথা থেকে কখন্ কি হাওয়া আসে আমরা কিছুই জানিনে। আজ মনে করলুম জীবনটা দিব্যি চালাতে পারব, বেশ বল আছে, সংসারের দুঃখযন্ত্রণাগুলোকে একেবারে ডিঙিয়ে চলে যাব, এই ভেবে সমস্ত জীবনের প্রোগ্রামটি ছাপিয়ে এনে শক্ত করে বাঁধিয়ে পকেটে রেখে নিশ্চিন্ত আছি; কাল দেখি কোন্ অজ্ঞাত রসাতল থেকে আর একটা হাওয়া দিয়েছে, আকাশের ভাবগতিক সমস্ত বদলে গেছে, তখন আর মনে হয় না এ দুর্য্যোগ কোনো-কালে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারব। এসবের উৎপত্তি কোন্‌খানে? কোন্ শিরার মধ্যে

স্নায়ুর মধ্যে কি একটা নড়চড় হয়ে গেছে মাঝের থেকে আমি আমার সমস্ত বলবুদ্ধি নিয়ে আর কুলিয়ে উঠ্‌তে পারিনে। নিজের ভিতরকার এই অপার রহস্যের কথা মনে করলে ভারি ভয় হয়—কি করতে পারব না পারব কিছুই জোর করে বল্‌তে পারিনে—মনে হয়, কিছুই না জেনে আমি এ কি একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড সর্ব্বদাই স্কন্ধে বহন করে নিয়ে বেড়াই, আয়ত্ত করতে পারিনে অথচ এর হাতও কিছুতেই এড়াতে পারিনে—জানিনে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে আমিই বা একে কোথায় নিয়ে যাব—আমার স্কন্ধে এই ভয়ঙ্কর রহস্য যোজনা করে দেবার কি প্রয়োজন ছিল? বুকের ভিতর কি হয়, শিরার মধ্যে কি চল্‌চে, মস্তিষ্কের মধ্যে কি নড়চে, কত কি অসংখ্য কাণ্ড আমাকে অবিশ্রাম আচ্ছন্ন করে ঘট্‌চে, আমি দেখ্‌তেও পাচ্চিনে, আমার সঙ্গে পরামর্শও করচেনা, অথচ সবসুদ্ধ নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কর্ত্তাব্যক্তির মত মুখ করে মনে করচি আমি একজন আমি! তুমিত ভারি তুমি—তোমার নিজের কতটুকুই বা জান তার ঠিক নেই। আমিত অনেক ভেবেচিন্তে এইটুকু ঠিক করেছি আমি নিজেকে কিছুই জানিনে। আমি একটা সজীব পিয়ানো যন্ত্রের মত—ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে অনেকগুলো তার এবং কলবল আছে—কখন্ কে এসে বাজায় কিছুই জানিনে—কেন বাজে তাও সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত—কেবল কি বাজে সেইটেই জানি—সুখ বাজে কি ব্যথা বাজে, কড়ি বাজে কি কোমল বাজে, তালে বাজে কি বেতালে বাজে এইটুকুই বুঝ্‌তে পারি। আর জানি আমার অক্টেভ নীচের দিকেই বা কতদূর, উপরের দিকেই বা কতদূর। না—তাও কি ঠিক জানি?

৮০

পতিসর,

৩০শে মার্চ্চ, ১৮৯৪।

এত অকারণ আশঙ্কা এবং কষ্ট মানুষের অদৃষ্টে থাকে! ছোট বড় এত সহস্র বিষয়ের উপর আমাদের মনের সুখশান্তি নির্ভর করে। অনেক দুঃখ আছে যা আমার নিজকৃত এবং যা সবিনয়ে সহিষ্ণুভাবে বহন করা কর্ত্তব্য মনে হয়—কিন্তু চিঠি না পেয়ে যখন আশঙ্কা হয় যে বুঝি একটা কিছু বিপদ কিম্বা ব্যামো হয়েছে—তখন কষ্টটাকে শান্ত করবার জন্যে হাতের কাছে কোনো ফিলজফিই পাওয়া যায় না। তখন বুদ্ধিটাও একেবারে কাজের বার হয়ে যায়। কাল সমস্তক্ষণ বেড়াতে বেড়াতে এমন সকল অসম্ভব এবং অসঙ্গত কল্পনা মনে উদয় হচ্ছিল এবং বুদ্ধি তার কোনো প্রতিবাদ করছিল না যে আজ তা স্মরণ করে হাসিও পাচ্চে লজ্জাও বোধ হচ্চে—অথচ স্থির নিশ্চয় জানি যে, আস্‌চে বারে, যেদিন এইরকম ঘটনা হবে ঠিক আবার এরই পুনরাবৃত্তি হবে। আমিও অনেকবার বলেছি বুদ্ধিটা মানুষের নিজস্ব জিনিষ নয়, ওটা এখনো আমাদের মনের মধ্যে ন্যাচরলাইজ্‌ড্‌ হয়ে যায় নি।

যখন মনে করি জীবনের পথ সুদীর্ঘ, দুঃখ কষ্টের কারণ অসংখ্য এবং অবশ্যম্ভাবী তখন এক এক সময় মনের বল রক্ষা করা প্রাণপণ কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় সন্ধ্যের সময় একলা বসে বসে টেবিলের বাতির আলোর দিকে দৃষ্টি নিবিষ্ট করে মনে করি জীবনটাকে বীরের মত অবিচলিত ভাবে নীরবে এবং বিনা অভিযোগে বহন করব—সেই কল্পনায় মনটা উপস্থিতমত অনেকখানি স্ফীত হয়ে ওঠে এবং আপনাকে হাতে হাতে একজন মস্ত বীরপুরুষ বলে ভ্রম হয়—তার পরে পথ চলতে পায়ে যেই কুশের কাঁটাটি ফোটে অমনি যখন লাফিয়ে উঠি তখন ভবিষ্যতের পক্ষে ভারি সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন আবার জীবনটাকে সুদীর্ঘ এবং আপনাকে সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে হয়। কিন্তু সে যুক্তিটা বোধ হয় ঠিক নয়—বাস্তবিক, বোধ হয় কুশের কাঁটায় বেশি অস্থির করে। মনের ভিতরে একটি গোছালো গিন্নিপনা

দেখা যায়—সে দরকার বুঝে ব্যয় করে, সামান্য কারণে বলের অপব্যয় করতে চায়না। সে যেন বড় বড় সঙ্কট এবং আত্মত্যাগের জন্যে আপনার সমস্ত বল কৃপণের মত সযত্নে সঞ্চয় করে রাখে। ছোট ছোট বেদনায় হাজার কান্নাকাটি করলেও তার রীতিমত সাহায্য পাওয়া যায় না। কিন্তু যেখানে দুঃখ গভীরতম সেখানে তার আলস্য নেই। এই জন্যে জীবনে একটা প্যারাডক্স্ প্রায়ই দেখা যায় যে, বড় দুঃখের চেয়ে ছোট দুঃখ যেন বেশি দুঃখকর। তার কারণ, বড় দুঃখে হৃদয়ের যেখানটা বিদীর্ণ হয়ে যায় সেইখান থেকেই একটা সান্ত্বনার উৎস উঠতে থাকে, মনের সমস্ত দলবল সমস্ত ধৈর্য্যবীর্য্য এক হয়ে আপনার কাজ করতে থাকে,তখন দুঃখের মাহাত্ম্যের দ্বারাই তার সহ্য করবার শক্তি বেড়ে যায়। মানুষের হৃদয়ে একদিকে যেমন সুখলাভের ইচ্ছা তেমনি আর একদিকে আত্মত্যাগের ইচ্ছাও আছে; সুখের ইচ্ছা যখন নিষ্ফল হয় তখন আত্মত্যাগের ইচ্ছা বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং সেই ইচ্ছার চরিতার্থতা সাধন করবার অবসর পেয়ে মনের ভিতরে একটা উদার উৎসাহসঞ্চার হয়। ছোট দুঃখের কাছে আমরা কাপুরুষ কিন্তু বড় দুঃখ আমাদের বীর করে তোলে, আমাদের যথার্থ মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে দেয়। তার ভিতরে একটা সুখ আছে। দুঃখের সুখ বলে একটা কথা অনেকদিন থেকে প্রচলিত আছে সেটা নিতান্ত বাক্‌চাতুরী নয় এবং সুখের অসন্তোষ একটা আছে সেও সত্য। তার মানে বেশি শক্ত নয়। যখন আমরা নিছক্ সুখ ভোগ করতে থাকি তখন আমাদের মনের একার্দ্ধ অকৃতার্থ থাকে, তখন একটা কিছুর জন্যে দুঃখ ভোগ এবং ত্যাগ স্বীকার করতে ইচ্ছে করে, নইলে আপনাকে অযোগ্য বলে মনে হয়—এই কারণেই যে সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত সেই সুখই স্থায়ী এবং সুগভীর, তাতেই যথার্থ আমাদের সমস্ত প্রকৃতির চরিতার্থতা সাধন হয়। কিন্তু সুখ দুঃখের ফিলজফি ক্রমেই বেড়ে চল্‌তে লাগ্‌ল।

১৩৪

শিলাইদহ,
২৪শে জুন, ১৮৯৪।

সবে দিন চারেক হল এখানে এসেছি কিন্তু মনে হচ্চে যেন কতদিন আছি তার ঠিক নেই—মনে হচ্চে আজই যদি কলকাতায় যাই তাহলে যেন অনেক বিষয়ে অনেক পরিবর্ত্তন দেখ্‌তে পাব।

আমিই কেবল সময়স্রোতের বাইরে একটি জায়গায় স্থির হয়ে আছি, আর সমস্ত জগৎ আমার অজ্ঞাতে একটু একটু করে ঠাঁই বদল করচে। আসলে, কলকাতা থেকে এখানে এলে সময়টা চতুর্গুণ দীর্ঘ হয়ে আসে, কেবল আপনার মনোরাজ্যে বাস করতে হয়, সেখানে ঘড়ি ঠিক চলে না। ভাবের তীব্রতা অনুসারে মানসিক সময়ের পরিমাপ হয়—কোন কোন ক্ষণিক সুখ দুঃখ মনে হয় যেন অনেকক্ষণ ধরে ভোগ করচি। যেখানে বাইরের লোকপ্রবাহ এবং বাইরের ঘটনা এবং দৈনিক কার্য্যপরম্পরা আমাদের সর্ব্বদা সময়গণনায় নিযুক্ত না রাখে সেখানে, স্বপ্নের মত, ছোট মুহূর্ত্ত দীর্ঘকালে এবং দীর্ঘকাল ছোটমুহূর্ত্তে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হতে থাকে। তাই আমার মনে হয় খণ্ড কাল এবং খণ্ড আকাশ আমাদের মনের ভ্রম। প্রত্যেক পরমাণু অসীম এবং প্রত্যেক মুহূর্ত্তই অনন্ত। এ সম্বন্ধে পারস্য উপন্যাসে খুব ছেলেবেলায় একটা গল্প পড়েছিলুম সেটা আমার ভারি ভাল লেগেছিল—এবং তখন যদিও খুব ছোট ছিলুম তবুও তার ভিতরকার ভাবটা একরকম করে বুঝ্‌তে পেরে-ছিলুম। কালের পরিমাণটা যে কিছুই নয় সেইটে দেখাবার জন্যে একজন ফকির একটা টবের মধ্যে মন্ত্রঃপূত জল রেখে বাদশাকে বল্লে তুমি এর মধ্যে ডুব দিয়া স্নান কর। বাদশা ডুব দেবামাত্র দেখ্‌লে সে এক সমুদ্রের ধারে নতুন দেশে উপস্থিত—সেখানে সে দীর্ঘজীবন ধরে নানা ঘটনা নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে নানা সুখ দুঃখ অতিবাহন করলে। তার বিয়ে হল, তার একে একে অনেকগুলি ছেলে হল, ছেলেরা মরে গেল, স্ত্রী মরে গেল, টাকাকড়ি সব নষ্ট হয়ে গেল এবং সেই শোকে যখন সে

একেবারে অধীর হয়ে পড়েছে এমন সময় হঠাৎ দেখলে সে আপন রাজসভার জলের টবের মধ্যে। ফকিরের উপর খুব ক্রোধ প্রকাশ করাতে সভাসদ্‌রা সকলেই বল্লে, মহারাজ, আপনি কেবলমাত্র জলে ডুব দিয়েই মাথা তুলেছেন। আমাদের সমস্ত জীবনটা এবং জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ এই রকম এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বদ্ধ; আমরা সেটাকে যতই সুদীর্ঘ এবং যতই সুতীব্র মনে করি যেমনি সংসারের টব থেকে মাথা তুলব অমনি সমস্তটা মুহূর্ত্তকালের স্বপ্নের মত ক্ষুদ্র হয়ে যাবে। কালের ছোট বড় কিছুই নেই—আমরাই ছোট বড়।

কাল দিনের বেলাটা বেশ ছিল। আমার এই নদীর জলরেখা, বালির চর এবং ওপারের বনদৃশ্যের উপরে মেঘ এবং রৌদ্রের মুহুর্মুহু নতুন খেলা চলছিল—খোলা জানলার ভিতর দিয়ে যে দিকেই চোখ পড়ছিল এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল। কোনো সুন্দর জিনিষকে "স্বপ্নের মত" কেন বলে ঠিক জানিনে, বোধ হয় নিছক সৌন্দর্য্যটা প্রকাশ করবার জন্যে। অর্থাৎ ওর মধ্যে যেন Realityর ভারটুকু মাত্র নেই—অর্থাৎ এই শস্যক্ষেত্র থেকে যে আহার সংগ্রহ করতে হয়, এই নদী দিয়ে যে পাটের নৌকো যাবার রাস্তা, এই চর যে জমিদারের সঙ্গে খাজনা দিয়ে বন্দোবস্ত করে নিতে হয় ইত্যাদি শত সহস্র কথা মন থেকে দূর করে দিয়ে কেবলমাত্র হিসাবহীন বিশুদ্ধ আনন্দময় সৌন্দর্য্যের ছবি যখন আমরা উপভোগ করি তখন আমরা সেটাকে স্বপ্নের মত বলি। অন্য সময়ে আমরা জগৎকে প্রধানতঃ সত্য বলে দেখি তারপরে তাকে আমরা সুন্দর অথবা অন্যরূপে জানি—কিন্তু যে সময়ে তাকে আমরা প্রধানতঃ সুন্দর হিসাবে দেখি, তারপরে সত্যহোক্ না হোক্ লক্ষ্য করিনে তখন আমরা তাকে বলি স্বপ্নের মত।

১৩৫

শিলাইদহ,

২৬শে জুন, ১৮৯৪।

আজ সকালে বিছানা থেকে উঠেই দেখি পাংশুবর্ণ মেঘে ঘর ভারে আকাশ অন্ধকার এবং অবনত, বাদলার ভিজে হাওয়া দিচ্চে, টিপ্ টিপ্ করে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়চে, নদীতে নৌকো বেশি নেই, ধান কাটবার জন্যে কাস্তে হাতে চা ষারা মাথায় টোকা পরে গায়ে চট মুড়ি দিয়ে খেয়ানৌকোয় পার হচ্চে, মাঠে গরু চরচেনা এবং ঘাটে স্নানার্থিনী জনপদবধূদের বাহুল্য নেই—অন্যদিন এতক্ষণ আমি তাদের উচ্চকণ্ঠের কলধ্বনি এপার থেকে শুনতে পেতুম, আজ সে সমস্ত কাকলী এবং পাখীর গান নীরব। যেদিক থেকে বৃষ্টির ছাঁট আসবার সম্ভাবনা সেদিককার জান্‌লা এবং পর্দ্দা ফেলে দিয়ে অন্যদিককার জান্‌লা খুলে আমি এতক্ষণ কাজের প্রত্যাশায় বসে ছিলুম। অবশেষে ক্রমেই আমার ধারণা হচ্চে আজ এ বাদ্‌লায় আমলারা ঘরের বার হবেনা—হায়, আমিও শ্যাম নই, তারাও রাধিকা নয়,—বর্ষাভিসারের এমন সুযোগ মাঠে মারা গেল। তাছাড়া বাঁশি যদি বাজাতুম এবং রাধিকার যদি কিছুমাত্র সুরবোধ থাকৃত তাহলে বৃকভানুনন্দিনী বিশেষ "হর্ষিতা" হতনা। যাই হোক, অবস্থাগতিকে যখন রাধিকাও আসচেননা আমলারাও তদ্রূপ এবং আমার "Muse"ও সম্প্রতি আমাকে পরিত্যাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছেন, তখন বসে বসে একখণ্ড চিঠি লেখা যেতে পারে। আসল হয়েছে কি, এতক্ষণ কোনো কাজ না থাকাতে নদীর দিকে চেয়ে গুন্ গুন্ স্বরে ভৈরবী টোড়ি রামকেলি মিশিয়ে একটা প্রভাতী রাগিণী সৃজনকরে আপন-মনে আলাপ করছিলুম, তাতে অকস্মাৎ মনের ভিতরে এমন একটা সুতীব্র অথচ সুমধুর চাঞ্চল্য জেগে উঠ্‌ল, এমন একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবেগ উপস্থিত হল, এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমার এই বাস্তব জীবন এবং বাস্তব জগৎ আগাগোড়া এমন একটি মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করে দেখা দিলে, অস্তিত্বের সমস্ত দুরূহ সমস্যার এমন একটা সঙ্গীতময় ভাবময় অথচ ভাষাহীন অর্থহীন অনির্দ্দেশ্য উত্তর কানে এসে বাজ্‌তে লাগ্‌ল, এবং

সেই সুরের ছিদ্র দিয়ে নদীর উপর বৃষ্টি জলের তরল পতন শব্দ অবিশ্রাম ধ্বনিত হয়ে এমন একটা পুলক সঞ্চার করতে লাগ্‌ল—জগতের প্রান্তবর্ত্তী এই সঙ্গীহীন একটিমাত্র প্রাণীকে ঘিরে আষাঢ়ের অশ্রুসজল ঘনঘোর শ্যামল মেঘের মত "সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা" এমনি স্তরে স্তরে ঘনিয়ে এল যে, হঠাৎ এক সময় বলে উঠ্‌তে হল, যে, থাক্, আর কাজ নেই, এইবার Criticism on Contemporary thought and thinkers পড়তে বসা যাক্।"

১০৮

শিলাইদা,
২৭শে জুন, ১৮৯৪।

কাল থেকে হঠাৎ আমার মাথায় একটা হ্যাপি থট্ এসেছে। আমি চিন্তা করে দেখলুম পৃথিবীর উপকার করব ইচ্ছা থাক্‌লেও কৃতকার্য্য হওয়া যায় না; কিন্তু তার বদলে যেটা করতে পারি সেইটে করে ফেল্লে অনেক সময় আপনিই পৃথিবীর উপকার হয়, নিদেন যাহোক্ একটা কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। আজকাল মনে হচ্চে, যদি আমি আর কিছুই না করে ছোট ছোট গল্প লিখ্‌তে বসি তাহলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য্য হতে পারলে হয়ত পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখ্‌ব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধঘরের সঙ্কীর্ণতা দূর করবে, এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবেমাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং সে পাঁচ লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চল্‌চে, হেনকালে পূর্ব্বসঞ্চিত বিন্দুবিন্দু বারিশীকরবর্ষী তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের সমাগম হল—তাতে করে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হল। তা হোক্ তবু সে মনের মধ্যে আছে। দিনযাপনের আজ আর এক রকম উপায় পরীক্ষা করে দেখা গেছে। আজ বসে বসে ছেলেবেলাকার স্মৃতি এবং তখনকার মনের ভাব খুব স্পষ্ট করে মনে আনবার চেষ্টা করছিলুম। যখন পেনেটির বাগানে ছিলুম, যখন পৈতের নেড়া মাথা নিয়ে প্রথমবার বোলপুরের বাগানে গিয়েছিলুম, যখন পশ্চিমের বারান্দার সবশেষের ঘরে আমাদের ইস্কুলঘর ছিল, এবং আমি একটা নীলকাগজের

ছেঁড়া খাতার বাঁকা লাইন কেটে বড় বড় কাঁচা অক্ষরে প্রকৃতির বর্ণনা লিখতুম, যখন তোষাখানার ঘরে শীতকালের সকালে চিন্তা বলে একটা চাকর গুন্‌গুন্ স্বরে মধুকানের সুরে গান করতে করতে মাখন দিয়ে রুটি তোষ করত,—তখন আমাদের গায়ে গরম কাপড় ছিলনা, একখানা কামিজ পরে সেই আগুনের কাছে বসে শীত নিবারণ করতুম এবং সেই সশব্দবিগলিতনবনীসুগন্ধি রুটিখণ্ডের উপরে লুব্ধদুরাশদৃষ্টি নিক্ষেপ করে চুপ করে বসে চিন্তার গান শুন্‌তুম—সেই সমস্ত দিনগুলিকে ঠিক বর্ত্তমানের করে দেখছিলুম এবং সেই সমস্ত দিনগুলির সঙ্গে এই রৌদ্রালোকিত পদ্মা এবং পদ্মার চর ভারী এক-রকম সুন্দরভাবে মিশ্রিত হচ্ছিল,—ঠিক যেন আমার সেই ছেলেবেলাকার খোলা জান্‌লা-নার ধারে বসে এই পদ্মার একটি দৃশ্যখণ্ড দেখ্‌চি বলে মনে হচ্ছিল। তারপরে আমি ভাবলুম এই ত আমি কোনো উপকরণ না নিয়ে কেবল গল্প লিখে এবং বর্ত্তমানকে দূর-কালের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে নিজেকে নিজে সুখী করতে পারি। তার পরেই মনে হল, প্রবাদ আছে "Nothing succeeds like success"—"টাকায় টাকা আনে"—তেমনি সুখও সুখ আনে। সুখের সময়েই আমরা মনে করি আমাদের সুখী হবার অসীম ক্ষমতা আছে—তারপরে দুঃখের সময় দেখতে পাই কোনো ক্ষমতাই কোনো কাজ করচেনা, সব কলই একেবারে বিগ্‌ড়ে গেছে। কাল বোধ হয় একটু কিছু সুখের আভাস মনের ভিতর রীরী করে উঠেছিল তাই সমস্ত কলগুলো একেবারে চল্‌তে আরম্ভ করেছিল, জীবনের অতীতস্মৃতি এবং প্রকৃতির বর্ত্তমান শোভা একসঙ্গেই সজীব হয়ে উঠেছিল, তাই সকালে আজ জেগে উঠেই মনে হল আমি কবি। যতই কবিত্ব থাক, যতই ক্ষমতার গর্ব্ব করি মানুষ ভয়ানক পরাধীন। পৃথিবীর উপর থেকে এই কাঙাল জীবগুলো লম্বা হয়ে উঠে খাড়া হয়ে শীর্ণ হয়ে বেড়াচ্ছে,—আস্ত স্বর্গটি চায়, তারপরে টুক্‌রোটাক্‌রা যা পায় তাতেই ক্ষুধানিবৃত্তির চেষ্টা করে, অবশেষে ভিক্ষাপ্রসারিত ঊর্দ্ধ-গামী দেহ ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুকে স্বর্গপ্রাপ্তি বলে রটনা করে। যেটুকু সুখে জীবনের সমস্ত কলগুলো চলে সেইটুকু সুখ যদি চিরকাল ধরে রাখা যায় তাহলে সমস্ত শক্তি বিকশিত সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে যাওয়া যেতে পারে। আজ গিরিবালা অনাহূত এসে উপস্থিত হয়েছেন কাল বড় আবশ্যকের সময় তাঁর দোদুল্যমান বেণীর সূচ্যগ্রভাগটুকুও দেখা যাবে না। কিন্তু সে কথা নিয়ে আজ আন্দোলনের দরকার নেই। শ্রীমতী গিরিবালার তিরোধান সম্ভাবনা থাকে ত থাক—আজ যখন তাঁর শুভা-গমন হয়েছে তখন সেটা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নেই।

এবারকার পত্রে অবগত হওয়া গেল যে আমার ঘরের ক্ষুদ্রতমাটি ক্ষুদ্র ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করতে শিখেছে। আমি সে চিত্র বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি। তার সেই নরম-নরম মুঠোর আঁচড়ের জন্যে আমার মুখটা নাকটা তৃষার্ত্ত হয়ে আছে। সে যেখানে-সেখানে আমাকে মুঠো করে ধরে টল্‌মলে মাথাটা নিয়ে হাম্‌ করে খেতে আস্‌ত এবং ক্ষুদে ক্ষুদে আঙুলগুলোর মধ্যে আমার চষমার হারটা জড়িয়ে নিতান্ত নির্ব্বোধ নিশ্চিন্ত গম্ভীরভাবে গাল ফুলিয়ে চেয়ে থাকৃত সেই কথাটা মনে পড়চে।

১০৭

শিলাইদা

৩০শে জুন ১৮৯৪

আমার এই ক্ষুদ্র নির্জ্জনতাটি আমার মনের কারখানা ঘরের মত; তার নানাবিধ অদৃশ্য যন্ত্রতন্ত্র এবং সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে,—কেউ যখন বাইরে থেকে আসেন তখন সেগুলি তাঁর চোখে পড়েনা—কখন কোথায় পা ফেলেন তার ঠিক নেই দিব্য অজ্ঞানে হাস্যমুখে বিশ্বসংসারের খবর আলোচনা করতে করতে আমার অবসরের তাঁতে চড়ানো অনেক সাধনার সূক্ষ্ম সূত্রগুলি পট্‌পট্‌ করে ছিঁড়তে থাকেন। যখন ষ্টেশনে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে আবার একাকী আমার কর্ম্মশালায় ফিরে আসি তখন দেখ্‌তে পাই আমার কত লোকসান হয়েছে। অনেক কথা, অনেক কাজ, অনেক আলোচনা আছে যা অন্যের পক্ষে সামান্য এবং জনতার মধ্যে স্বাভাবিক, কিন্তু নির্জ্জন জীবনের পক্ষে আঘাতজনক। কেননা নির্জ্জনে আমাদের সমস্ত গোপন অংশ গভীর অংশ বাহির হয়ে আসে সুতরাং সেই সময়ে মানুষ বড় বেশি নিজেরই মত অর্থাৎ কিছু সৃষ্টিছাড়া গোচের হয়—সে অবস্থায় সে লোকসঙ্গের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। বাহ্য প্রকৃতির একটা গুণ এই যে সে অগ্রসর হয়ে মনের সঙ্গে কোনো বিরোধ করে না; তার নিজের মন বলে কোনো বালাই না থাকাতে মানুষের মনকে সে আপনার সমস্ত জায়গাটি ছেড়ে দিতে রাজি হয়; সে নিয়ত সঙ্গদান করে তবু সঙ্গ আদায় করেনা, সে অনন্ত আকাশ অধিকার করে থাকে তবু সে আমার একতিল জায়গা জোড়ে না;—নির্ব্বোধের মত বকে না, সুবুদ্ধির মত তর্ক করে না,—আমার শিশু কন্যাটির মত আকাশের কোলে শুয়ে থাকে,—যখন শান্তভাবে থাকে সেও মিষ্টি লাগে; যখন গর্জ্জন করে হাত পা ছুঁড়তে থাকে সেও মিষ্টি লাগে; বিশেষত যখন তার স্নান পান বেশ পরিবর্ত্তনের বন্দোবস্ত ভার আমার উপর কিছুমাত্র নেই—তখন এই ভাষাহীন মনোহীন বিরাটসুন্দর শিশুটি আমার নির্জ্জনের পক্ষে বেশ। ভাষায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ বুদ্ধিমান বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ লোকালয়ের পক্ষেই উপাদেয়।

১৫৮

সাহাজাদপুরের পথ।
জুলাই ১৮৯৪।

সন্ধ্যাবেলায় পাবনা সহরের একটি খেয়াঘাটের কাছে বোট বাঁধা গেল। ওপার থেকে জনকতক লোক বাঁয়াতবলার সঙ্গে গান গাচ্চে, একটা মিশ্রিত কলরব কানে এসে প্রবেশ করচে; রাস্তা দিয়ে স্ত্রী পুরুষ যারা চল্‌চে তাদের ব্যস্তভাব; গাছপালার ভিতর দিয়ে দীপালোকিত কোটাবাড়ি দেখা যাচ্চে, খেয়াঘাটে নানাশ্রেণী লোকের ভিড়। আকাশে নিবিড় একটা একরঙা মেঘ, সন্ধ্যাও অন্ধকার হয়ে এসেছে; ওপারে সারবাঁধা মহাজনী নৌকায় আলো জ্বলে উঠ্‌ল, পূজাঘর থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজ্‌তে লাগ্‌ল,—বাতি নিবিয়ে দিয়ে বোটের জানলায় বসে আমার মনে ভারি একটা অপূর্ব্ব আবেগ উপস্থিত হল। অন্ধকারের আবরণের মধ্যে দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগ্‌ল। এই মেঘলা আকাশের নীচে, নিবিড় সন্ধ্যার মধ্যে, কত লোক, কত ইচ্ছা, কত কাজ, কত গৃহ, গৃহের মধ্যে জীবনের কত রহস্য,—মানুষে মানুষে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি কত শত সহস্রপ্রকারের ঘাত প্রতিঘাত। বৃহৎ জনতার সমস্ত ভালমন্দ সমস্ত সুখদুঃখ এক হয়ে তরুলতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্ষানদীর দুইতীর থেকে একটি সকরুণ সুন্দর সুগম্ভীর রাগিণীর মত আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ করতে লাগ্‌ল। আমার "শৈশব সন্ধ্যা" কবিতায় বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম। কথাটা সংক্ষেপে এই যে, মানুষ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী, অথচ ভালমন্দ এবং সুখদুঃখপরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন সুগভীর কলস্বরে চিরদিন চল্‌চে ও চলবে—নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই চিরন্তন কলধ্বনি শুন্‌তে পাওয়া যাচ্চে। মানুষের দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা ও স্বাতন্ত্র্য এই অবিচ্ছিন্ন সুরের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্চে, সবসুদ্ধ খুব একটা বিস্তৃত আদিঅন্তশূন্য প্রশ্নোত্তরহীন মহাসমুদ্রের একতানশব্দের মত অন্তরের নিস্তব্ধতার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করচে। এক এক সময়ে কোথাকার কোন্ ছিদ্র দিয়ে জগতের বড় বড় প্রবাহ হৃদয়ের মধ্যে পথ পায়—তার যে একটা ধ্বনি শোনা যায় সেটাকে কথায় তর্জ্জমা করা অসাধ্য।

১৩৩

সাহাজাদপুরের পথে।

৭ই জুলাই ১৮৯৪

অদৃষ্টক্রমে এ নভেলটা নিতান্তই অপাঠ্য। কেবলমাত্র আরম্ভ করেছিলুম বলেই প্রাণপণে শেষ করে ফেল্লুম। আরম্ভ করেছি বলেই যে শেষ করতে হবে এ কর্ত্তব্য-বোধের অর্থ বোঝা শক্ত। লোকেন যে বলে আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তির একটা অহঙ্কার আছে সেটা কতকটা ঠিক। তারা কেউ সহজে স্বীকার করতে চায় না আমরা সামান্য বা ক্ষণস্থায়ী বাধাতেই পরাভূত, এইজন্যে অনেক সময়ে তারা নিজেকে ধুইয়ে ধুইয়ে জাগিয়ে রাখে। আমাদের ইচ্ছাশক্তিরও একটা গর্ব্ব আছে। সে একটা জিনিষ নিয়ে আরম্ভ করেছে বলেই অবশেষে নিজের প্রতিকূলেও সেটা শেষ করতে চায়। সেই একগুঁয়ে অনাবশ্যক অহঙ্কারবশত একটা বাজে বকুনিভরা অসংলগ্ন প্রকাণ্ড অপাঠ্যগ্রন্থ একটি দীর্ঘ বর্ষাদিনে বদ্ধঘরে বসে শেষকরে ফেল্লুম—শেষ করবার মহৎসুখ ছাড়া আর কোনো সুখ পেলুম না।

—o—

১১৩

সাহাজাদপুর

১০ই জুলাই ১৮৯৪।

ভাল করে ভেবে দেখ্‌লে হাসি পায় যে, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা থাক্‌লেও ইহজীবনে দুটো মানুষে কতটুকু অংশ রেখায় রেখায় সংলগ্ন! যাকে দশ বছর জানি তাকে দশটা বছরের কত সুদীর্ঘ অংশই জানিনে; বোধ করি আজীবন সম্পর্কেরও জমাখরচ হিসাব করলেও তেমন বড় অঙ্ক হাতে থাকে না। সে কথা ভেবে দেখলে সবাইকেই অপরিচিত বলে বোধ হয়; তখন বুঝতে পারি খুব বেশি পরিচয় হবার কথা নেই, কেননা দুদিন পরে বিচ্ছিন্ন হতেই হবে;—আমাদের পূর্ব্বে কোটি কোটি লোক এই সূর্য্যালোকে নীলাকাশের নীচে জীবনের পান্থশালায় মিলেছে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে বিস্মৃত হয়ে অপসৃত হয়ে গেছে। এ রকম ভেবে দেখ্‌লে কোনো কোনো প্রকৃতিতে বৈরাগ্যের উদয় হয় কিন্তু আমার ঠিক উল্টোই হয়; আমার আরো বেশি করে দেখ্‌তে বেশি করে জান্‌তে ইচ্ছা করে। এই যে আমরা কয়েকজন প্রাণী জড় মহাসমুদ্রের বুদ্‌বুদের মত ভেসে একজায়গায় এসে ঠেকেছি, এই অপূর্ব্ব সংযোগটুকুর মধ্যে যত বিস্ময় যত আনন্দ তা আবার শত যুগে গড়ে উঠবে কিনা সন্দেহ। তাই কবি বসন্ত রায় লিখচেন:—

নিমিষে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।

বাস্তবিক, মানুষের এক নিমেষের মধ্যে শত যুগেরই সংযোগ বিয়োগ ত ঘটে। এবারে চলে আসবার আগে যেদিন একদিন দুপুর বেলায় স—পার্কষ্ট্রীটে এসেছিলেন, পিয়ানো বাজ্‌ছিল, আমি গান গাবার উদ্যোগ করছিলুম, হঠাৎ একসময়ে সকলের দিকে চেয়ে আমার মনে হল অনন্তকালের অসীম ঘটনাপরম্পরার মধ্যে এই একটুখানি আশ্চর্য্য ব্যাপার। মনে হল এর মধ্যে যেটুকু সৌন্দর্য্য ও আনন্দ আছে এবং এই যে খোলা জানলা দিয়ে মেঘলা আকাশের আলোটুকু আস্‌চে এ একটা অসাধারণ লাভ। প্রাত্যহিক অভ্যাসের জড়ত্ব একদিন কেন যে একটুখানি ছিঁড়ে যায় জানিনে, তখন যেন সদ্যোজাত হৃদয় দিয়ে আপনাকে, সম্মুখবর্ত্তী দৃশ্যকে, এবং বর্ত্তমান ঘটনাকে

অনন্তকালের চিত্রপটের উপরে প্রতিফলিত দেখ্‌তে পাই। অভ্যাসের একটা গুণ আছে যে, চারিদিকের অনেকগুলো জিনিষকে কমিয়ে এনে হাল্কা করে দেয়, বর্ম্মের মত আচ্ছন্ন করে বাইরের অতিশয় সংস্পর্শ থেকে মনকে রক্ষা করে—কিন্তু সেই অভ্যাস আমার মনে তেমন করে এঁটে ধরে না—পুরাতনকে বারবার নূতনের মতই দেখি—সেই জন্যে অন্য লোকের সঙ্গে ক্রমশ আমার মনের Perspective আলাদা হয়ে যায়—ভয়ে ভয়ে পরীক্ষা করে দেখ্‌তে হয় কে কোন্‌খানে আছি!

শিলাইদা,

৫ই আগষ্ট, ১৮৯৪।

কাল সমস্ত রাত্রি খুব অজস্রধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আজ ভোরে যখন উঠ্‌লুম তখনো অশ্রান্ত বৃষ্টি। এইমাত্র স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি পশ্চিমদিকে আউষধানের ক্ষেতের উপর খুব সজল শ্যামল অবনত মেঘ স্তূপে স্তূপে স্তরে স্তরে জমে রয়েছে এবং পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে মেঘ খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে রৌদ্র ওঠবার চেষ্টা করচে—রৌদ্রে বৃষ্টিতে খানিকক্ষণের জন্যে যেন সন্ধি হয়েছে। যেদিকে ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়ে সকালবেলাকার আলো বিচ্ছুরিত হয়ে বেরিয়ে আস্‌চে সেদিকে অপার পদ্মা-দৃশ্যটি বড় চমৎকার হয়েছে। জলের রহস্যগর্ভ থেকে একটি স্নানশুভ্র অলৌকিক জ্যোতিঃপ্রতিমা উদিত হয়ে নীরব মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে; আর ডাঙার উপরে কালো মেঘ স্ফীতকেশর সিংহের মত ভ্রূকুটি করে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে থাবা মেলে দিয়ে চুপ করে বসে আছে—সে যেন একটি সুন্দরী দিব্যশক্তির কাছে হার মেনেছে কিন্তু এখনো পোষমানে নি—দিগন্তের এককোণে আপনার সমস্ত রাগ এবং অভিমান গুটিয়ে নিয়ে বসে আছে। এখনি আবার বৃষ্টি হবে তার লক্ষণ দেখা যাচ্চে; রীতিমত শ্রাবণের বর্ষণের উপক্রম হচ্চে। সুপ্তোত্থিত সহাস্য জ্যোতীরশ্মি যে মুক্তদ্বারের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই দ্বারটি আবার আস্তে আস্তে রুদ্ধ হয়ে আস্‌চে; পদ্মার ঘোলা জলরাশি ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে; নদীর একতীর থেকে আরএক তীর পর্য্যন্ত মেঘের সঙ্গে মেঘ আবদ্ধ হয়ে সমস্ত আকাশ অধিকার করে নিয়েছে—খুব নিবিড় রকমের আয়োজনটা হয়েছে।

এতদিনে আউষধান এবং পাটের ক্ষেত শূন্যপ্রায় হয়ে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু এবারে দেবতার গতিকে ক্ষেতের সমস্ত শস্য ক্ষেতেই আন্দোলিত হচ্চে। দেখ্‌তে ভারি সুন্দর হয়েছে। বর্ষার আকাশ সজল মেঘে স্নিগ্ধ এবং পৃথিবী হিল্লোলিত শ্যাম-শস্যে কোমল;—উপরে একটি গাঢ় রং এবং নীচেও একটি গাঢ় রঙের প্রলেপ; মাটি কোথাও অনাবৃত নয়; মাটির রংটি কেবল এই ঘোলা নদীর জলের মধ্যেই দেখা যাচ্চে। পদ্মা একএকটি দেশপ্রদেশ বহন করে নিয়ে চলেছে—ওর জলের মধ্যেই কত জমিদারের জমিদারী গুলিয়ে রয়েছে। পদ্মা ভীষণ কৌতুকে একরাজার রাজ্য হরণ করে আপন গেরুয়া আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে অন্য রাজার দরজায় রাতারাতি থুয়ে আস্‌চে—শেষে প্রাতঃকালে রাজায় রাজায় লাঠালাঠি কাটাকাটি।

১৯২

শিলাইদা

৮ই আগষ্ট ১৮৯৪।

একটিমাত্র মানুষ কেবলমাত্র সাম্‌নে উপস্থিত থাক্‌লেই প্রকৃতির অর্দ্ধেক কথা কানে আসে না। আমি দেখেছি থেকে থেকে টুক্‌রোটুকরো কথাবার্ত্তা কওয়ার চেয়ে মানসিক শক্তির অপব্যয় আর কিছুতে হতে পারে না। দিনের পর দিন যখন একটি কথা না কয়ে কাটে তখন হঠাৎ টের পাওয়া যায় আমাদের চতুর্দ্দিকই কথা কচ্চে। আজ নদীর কলধ্বনির প্রত্যেক তরলল-কার আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন কোমল আদর বর্ষণ করচে—মনটি আমার আজ অত্যন্ত নির্জ্জন এবং সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ; মেঘমুক্ত আলোকে উজ্জ্বল শস্যহিল্লোলিত জলকল্লোলিত চতুর্দ্দিকটার সঙ্গে মুখোমুখি বিশ্রব্ধপ্রীতিসম্মিলনের উপযুক্ত একটি নীরব গোপনতা আমার মধ্যে স্থিরভাবে বিরাজ করচে। আমি জানি আজ সন্ধ্যার সময় যখন কেদারা টেনে বোটের ছাতের উপর একলাটি বসব তখন আমার আকাশে আমার সেই সন্ধ্যাতারাটি ঘরের লোকের মত দেখা দেবে। আমি শীতের সময় যখন এই পদ্মাতীরে আস্‌তুম—কাছারি থেকে ফিরতে অনেক দেরি হত। বোট ওপারে বালির চরের কাছে বাঁধা থাক্‌ত—ছোট জেলেডিঙি চড়ে নিস্তব্ধ নদীটি পার হতুম—তখন এই সন্ধ্যাটি সুগম্ভীর অথচ সুপ্রসন্নমুখে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকত। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আমার একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক। জীবনের যে গভীরতম অংশ সর্ব্বদা মৌন এবং সর্ব্বদা গুপ্ত, সেই অংশটি আস্তে আস্তে বের হয়ে এসে এখানকার অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাবৃত মধ্যাহ্নের মধ্যে নীরবে এবং নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে বেড়িয়েছে;—এখানকার দিনগুলো তার সেই অনেক দিনের পদচিহ্নের দ্বারা যেন অঙ্কিত।

১১২

শিলাইদা

৯ই আগষ্ট ১৮৯৪।

নদী একেবারে কানায় কানায় ভরে এসেছে। ওপারটা প্রায় দেখা যায় না। জল এক এক জায়গায় টগ বগ করে ফুট্‌চে, আবার এক এক জায়গায় কে যেন অস্থির জলকে দুইহাত দিয়ে চেপে চেপে সমান করে মেলে দিয়ে যাচ্চে। আজ দেখ্‌তে পেলুম ছোট একটি মৃতপাখী স্রোতে ভেসে আস্‌চে—ওর মৃত্যুর ইতিহাস বেশ বোঝা যাচ্চে। কোন এক গ্রামের ধারে বাগানের আম্রশাখায় ওর বাসা ছিল। সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরে এসে সঙ্গীদের নরম নরম গরম ডানাগুলির সঙ্গে পাখা মিলিয়ে শ্রান্তদেহে ঘুমিয়ে ছিল। হঠাৎরাত্রে পদ্মা একটুখানি পাশ ফিরেছেন অমনি গাছের নীচেকার মাটি ধসে পড়ে গেছে—নীড়চ্যুত পাখী হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্যে জেগে উঠ্‌ল তারপরে আর তাকে জাগ্‌তে হল না। আমি যখন মফস্বলে থাকি তখন একটি বৃহৎ সর্ব্বগ্রাসী রহস্যময়ী প্রকৃতির কাছে নিজের সঙ্গে অন্য জীবের প্রভেদ অকিঞ্চিৎকর বলে উপলব্ধি হয়। সহরে মনুষ্যসমাজ অত্যন্ত প্রধান হয়ে ওঠে—সেখানে সে নিষ্ঠুরভাবে আপনার সুখদুঃখের কাছে অন্য কোনো প্রাণীর সুখদুঃখ গণনার মধ্যেই আনে না। য়ুরোপেও মানুষ এত জটিল ও এত প্রধান যে তারা জন্তুকে বড় বেশি জন্তু মনে করে। ভারতবর্ষীয়েরা মানুষ থেকে জন্তু ও জন্তু থেকে মানুষ হওয়াটাকে কিছুই মনে করে না এইজন্য আমাদের শাস্ত্রে সর্ব্বভূতে দয়াটা একটা অসম্ভব আতিশয্য বলে পরিত্যক্ত হয়নি। মফস্বলে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে দেহে দেহে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হলে সেই আমার ভারতবর্ষীয় স্বভাব জেগে ওঠে। একটি পাখীর সুকোমল পালকে আবৃত স্পন্দমান ক্ষুদ্র বক্ষটুকুর মধ্যে জীবনের আনন্দ যে কত প্রবল তা আর আমি অচেতন-ভাবে ভুলে থাক্‌তে পারিনে।

১১৬

শিলাইদা

১০ই আগষ্ট, ১৮৯৪।

কাল খানিকরাত্রে জলের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। নদীর মধ্যে হঠাৎ একটা তুমুল কল্লোল এবং প্রবল চঞ্চলতা উপস্থিত হয়েছে। বোধ হয়, অকস্মাৎ একটা নতুন জলের স্রোত এসে পড়েছে। রোজই প্রায় এই রকম ব্যাপার ঘটচে। বসে আছি-আছি, হঠাৎ দেখতে পাই নদী ছল্‌ছল কল্‌কল্ করে জেগে উঠেছে, আর সবসুদ্ধ খুব একটা ধুমধাম পড়ে গেছে। বোটের তক্তার উপর পা রাখলে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় তার নীচে দিয়ে কতরকমের বিচিত্রশক্তি অবিশ্রাম চল্‌চে; খানিকটা কাঁপচে, খানিকটা টল্‌চে, খানিকটা ফুল্‌চে, খানিকটা আছাড়খেয়ে পড়চে—ঠিক যেন আমি সমস্ত নদীর নাড়ির স্পন্দন অনুভব করচি। কাল অর্দ্ধেক রাত্রে হঠাৎ একটা চঞ্চল উচ্ছ্বাস এসে নাড়ির নৃত্য অত্যন্ত বেড়ে উঠেছিল। আমি অনেকক্ষণ জানলার ধারে বেঞ্চের উপর বসে রইলুম। খুব একরকম ঝাপ্‌সা আলো ছিল—তাতে করে সমস্ত উতলা নদীকে আরো যেন পাগলের মত দেখাচ্ছিল। আকাশে মাঝে মাঝে মেঘ। একটা খুব জ্বল্‌জ্বলে মস্ত তারার ছায়া দীর্ঘতর হয়ে জলের মধ্যে অনেকদূর পর্য্যন্ত একটা জ্বালাময় বিদ্ধ বেদনার মত থরথর করে কাঁপছিল। নদীর দুইতীর অস্পষ্ট আলোকে এবং গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন অচেতন। মাঝখান দিয়ে একটা নিদ্রাহীন উন্মত্ত অধীরতা ভরপূরবেগে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে চলেছে। অর্দ্ধেক রাত্রে ঐরকম দৃশ্যের মধ্যে জেগে উঠে বসে থাকলে আপনাকে এবং জগৎকে কি এক নতুন রকমের মনে হয়—দিনের বেলাকার লোকসংসর্গের জগৎটা মিথ্যা হয়ে যায়। আবার আজ সকালে উঠে আমার সেই গভীর রাত্রের জগৎ স্বপ্নের মত কত দূরবর্ত্তী এবং লঘু হয়ে গেছে। মানুষের পক্ষে দুটোই সত্য অথচ দুটোই বিষম স্বতন্ত্র। আমার মনে হয় দিনের জগৎটা য়ুরোপীয় সঙ্গীত—সুরে বেসুরে খণ্ডে অংশে মিলে একটা গতিশীল প্রকাণ্ড হার্ম্মনির জটলা। আর রাত্রের জগৎটা আমাদের ভারতবর্ষীয়

সঙ্গীত—একটি বিশুদ্ধ করুণ গম্ভীর অমিশ্ররাগিণী। দুটোই আমাদের বিচলিত করে অথচ দুটোই পরস্পর বিরোধী। কি করা যাবে! প্রকৃতির গোড়ায় একটা দ্বিধা একটা বিরোধ আছে;—রাজা এবং রাণীর মধ্যে সমস্ত বিভক্ত। দিন এবং রাত্রি, বিচিত্র এবং অখণ্ড, পরিব্যক্ত এবং অনাদি। আমরা ভারতবর্ষীয়েরা সেই রাত্রির-রাজত্বে থাকি—আমরা অখণ্ড অনাদির দ্বারা অভিভূত। আমাদের নির্জ্জন এককের গান, য়ুরোপের সজন লোকালয়ের সঙ্গীত। আমাদের গানে শ্রোতাকে মনুষ্যের প্রতিদিনের সুখদুঃখের সীমা থেকে বের করে নিয়ে নিখিলের মূলে যে একটি সঙ্গীহীন বৈরাগ্যের দেশ আছে সেইখানে নিয়ে যায়—আর য়ুরোপের সঙ্গীত মনুষ্যের সুখদুঃখের অনন্ত উত্থানপতনের মধ্যে বিচিত্রভাবে নৃত্য করিয়ে নিয়ে চলে।

১১৪

শিলাইদা

১৩ই আগষ্ট ১৮৯৪।

অহমিকার প্রভাবেই যে নিজের কথা বল্‌তে চাই তা নয়। যেটা যথার্থ চিন্তা করব, যথার্থ অনুভব করব, যথার্থ প্রাপ্ত হব, যথার্থরূপে তাকে প্রকাশ করে তোলাই তার স্বাভাবিক পরিণাম। ভিতরকার একটা শক্তি ক্রমাগতই সেইদিকে কাজ করচে। অথচ সে শক্তিটা যে আমারই তা মনে হয় না—সে একটা জগৎব্যাপ্ত শক্তি। নিজের কাজের মাঝখানে নিজের আয়ত্তের বহির্ভূত আর একটি পদার্থ এসে তারই স্বভাবমত কাজ করে। সেই শক্তির হাতে আত্মসমর্পণ করাই জীবনের আনন্দ। সে যে কেবল প্রকাশ করায় তা নয়, সে অনুভব করায়, ভালবাসায়, সেইজন্যে অনুভূতি নিজের কাছে প্রত্যেকবার নূতন ও বিস্ময়জনক। নিজের শিশু কন্যাকে যখন ভাললাগে তখন সে বিশ্বের মূল রহস্য মূল সৌন্দর্য্যের অন্তবর্ত্তী হয়ে পড়ে—এবং স্নেহউচ্ছ্বাস উপাসকের মত হয়ে আসে। আমার বিশ্বাস আমাদের প্রীতিমাত্রই রহস্যময়ের পূজা; কেবল সেটা আমরা অচেতনভাবে করি। ভালবাসামাত্রই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বের অন্তরতম একটি শক্তির সজাগ আবির্ভাব,—যে নিত্য আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি। নইলে ওর কোনো অর্থই থাকে না। বিশ্বজগতে সর্ব্বব্যাপী আকর্ষণশক্তি যেমন—ছোটবড় সর্ব্বত্রই তার যেমন কাজ, অন্তরজগতে সেই রকম একটা বিশ্বব্যাপী আনন্দের আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণেই আমরা বিশ্বের মধ্যে সৌন্দর্য্য ও হৃদয়ের মধ্যে প্রেম অনুভব করি,—জগতের ভিতরকার সেই অনন্ত আনন্দের ক্রিয়া আমাদের মনের ভিতরেও কার্য্য করে। আমরা সেটাকে যদি বিচ্ছিন্নভাবে দেখি তবে তার যথার্থ কোনো অর্থ থাকে না। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের মধ্যে আমরা কেন আনন্দ পাই তার একটিমাত্র সদুত্তর হচ্চে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

১১৬

শিলাইদা

১৬ই আগষ্ট ১৮৯৪।

এখন শুক্লপক্ষ কিনা—বেড়াবার সময় চমৎকার জ্যোৎস্না পাই। আমার দক্ষিণে সুবিস্তীর্ণ মাঠ, মাঝে মাঝে আউষ ধান, একপ্রান্ত দিয়ে একটি সঙ্কীর্ণ মেঠো রাস্তা, সম্মুখে পূর্ব্বদিকে হাটের গোলাঘর, সামনে স্তূপাকার খড় জমা রয়েছে—জ্যোৎস্নায় সমস্ত ছবির মত দেখাচ্চে। সন্ধ্যাবেলাটি আমার মাথার উপর, আমার চোখের সামনে, আমার পায়ের তলায়, আমার চতুর্দ্দিকে এমন সুন্দর, এমন শান্তিময়, এমন মানুষটির মত নিবিড়ভাবে আমার নিকটবর্ত্তী হয়ে আসে যে, আকাশের নক্ষত্রলোক থেকে আর পদ্মার সুদূর ছায়াময় তীররেখা পর্য্যন্ত সমস্তটি একটি নিভৃত গোপন গৃহের মত ছোট হয়ে ঘিরে দাঁড়ায়—আমার মধ্যে যে দুটি প্রাণী আছে, বাইরের আমি, এবং আমার অন্তঃপুরবাসী আত্মা এই দুটিতে মিলে সমস্ত ঘরটি দখল করে বসে থাকি—এই দৃশ্যের মধ্যগত সমস্ত পশুপক্ষী প্রাণী আমাদের অন্তর্গত হয়ে যায়—কানে জলের কলশব্দ আস্‌তে থাকে, মুখের উপর মাথার উপর জ্যোৎস্নার শুভ্র হস্ত আদরের স্পর্শ করতে থাকে, আকাশে চকোর পাখী ডেকে চলে যায়, জেলের নৌকো পদ্মার মাঝখানে খরস্রোতের উপর দিয়ে বিনা চেষ্টায় অনায়াসে পিছলে বহে যেতে থাকে, আকাশব্যাপী স্নিগ্ধরাত্রি আমার রোমে রোমে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে উত্তাপ জুড়িয়ে দেয়—চোখ বুজে কান পেতে দেহ প্রসারিত করে প্রকৃতির একমাত্র যত্নের জিনিষের মত পড়ে থাকি, তার সহস্র সহচরী আমার সেবা করে। মনের কল্পনাও তার দুটি হস্তে থালা সাজিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়—মৃদুমন্দ বাতাসের সঙ্গে তার কোমল অঙ্গুলির স্পর্শ আমার চুলের মধ্যে অনুভব করি।

১১৭ শিলাইদা

১৯শে আগষ্ট ১৮৯৪।

এবারে আমার সঙ্গে আমি রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলী এনেছি। তাতে গুটি তিনেক সংস্কৃত বেদান্তগ্রন্থ ও তার অনুবাদ আছে। তার থেকে আমার অনেক সাহায্য হয়েছে। বেদান্তপাঠে বিশ্ব এবং বিশ্বের আদিকারণ সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসংশয় হয়ে থাকেন কিন্তু আমার সংশয় দূর হয় না। এক হিসাবে অন্য অনেক মত অপেক্ষা বেদান্তমত সরল। সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তা কথাটা শুন্‌তে সহজ কিন্তু অমন সমস্যা আর নেই। বেদান্ত তারি একেবারে গর্ডান-গ্রন্থি ছেদন করে বসে আছেন—সমস্যাটাকে একেবারে আধখানা ছেঁটেই ফেলেছেন। সৃষ্টি একেবারেই নেই, আমরাও নেই, আছেন কেবল ব্রহ্ম, আর মনে হচ্চে যেন আমরা আছি। আশ্চর্য্য এই মানুষ মনে একথা স্থান দিতে পারে, আরও আশ্চর্য্য এই কথাটা শুন্‌তে যত অসঙ্গত আসলে তা নয়—বস্তুত কিছুই যে আছে সেইটে প্রমাণ করাই শক্ত। যাই হোক্ আজকাল সন্ধ্যাবেলায় যখন জ্যোৎস্না ওঠে এবং আমি যখন অর্দ্ধনিমীলিত চোখে বোটের বাইরে কেদারায় পা ছড়িয়ে বসি, স্নিগ্ধ সমীরণ আমার চিন্তাক্লান্ত তপ্ত ললাট স্পর্শ করতে থাকে তখন এই জলস্থল আকাশ, এই নদীকল্লোল, ডাঙার উপর দিয়ে কদাচিৎ একআধজন পথিক ও জলের উপর দিয়ে কদাচিৎ একআধখানা জেলেডিঙির গতায়াত, জ্যোৎস্নালোকে অপরিস্ফুট মাঠের প্রান্ত, দূরে অন্ধকারজড়িত বনবেষ্টিত সুপ্তপ্রায় গ্রাম, সমস্তই ছায়ারই মত মায়ারই মত বোধ হয় অথচ সে মায়া সত্যের চেয়ে বেশি সত্য হয়ে জীবনমনকে জড়িয়ে ধরে, এবং এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মুক্তি এ কথা কিছুতেই মনে হয় না। দার্শনিক বল্‌তে পারেন, জগৎ-টাকে সত্যজ্ঞান করাতে দিনের বেলায় যে একটা দৃঢ় বন্ধনজাল থাকে সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত ছায়াময় ও সৌন্দর্য্যময় হয়ে আসাতে সেই বন্ধন অনেকটা পরিমাণে শিথিল হয়ে আসে। যখন জগৎটাকে একেবারে নিছক মায়া বলেই নিশ্চয় জান্‌ব তখনি মুক্তির বাধা থাকবে না। এ কথাটা আমি অতি ঈ—ষৎ অনুমান এবং অনুভব করতে পারি—হয়ত কোন্‌-দিন দেখ্‌ব বৃদ্ধবয়সের পূর্ব্বে আমি জীবন্মুক্ত হয়ে বসে আছি।

—*—

১১৪

কুষ্টিয়ার পথে,
২৪ শে আগষ্ট, ১৮৯৪।

পদ্মাকে এখন খুব জাঁকালো দেখ্‌তে হয়েছে—একেবারে বুক ফুলিয়ে চলেছে—ওপারটা একটিমাত্র কাজলের নীলরেখার মত দেখা যায়। আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি, বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তাহলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষ পশুর মধ্যে যে চলাচল তাতে খানিকটা চলা খানিকটা না চলা, কিন্তু নদীর আগাগোড়াই চল্‌চে; সেই জন্যে আমাদের মনের সঙ্গে আমাদের চেতনার সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আমাদের শরীর আংশিকভাবে পদচালনা করে, অঙ্গচালনা করে, আমাদের মনটার আগাগোড়াই চলেছে। সেই জন্যে এই ভাদ্রমাসের পদ্মাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মত বোধ হয়—সে মনের ইচ্ছার মত ভাঙচে চুরচে এবং চলেছে,—মনের ইচ্ছার মত সে আপনাকে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে এবং অস্ফুট কলসঙ্গীতে নানাপ্রকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করচে। বেগবান একাগ্রগামিনী নদী আমাদের ইচ্ছার মত আর বিচিত্র শস্যশালিনী স্থির ভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মত।

আমাদের বোট ছেড়ে দিয়েছে। তীরটা এখন বামে পড়েছে। খুব নিবিড় প্রচুর সরস সবুজের উপর খুব ঘননীল সজল মেঘরাশি মাতৃস্নেহের মত অবনত হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে গুরুগুরু মেঘ ডাক্‌চে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষার যমুনাবর্ণনা মনে পড়ে। প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণব কবির ছন্দঝঙ্কার এনে দেয়। তার প্রধান কারণ এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য্য নয়—এর মধ্যে একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্চে—এর মধ্যে অনন্ত বৃন্দাবন। বৈষ্ণব পদাবলীর মর্ম্মের ভিতর যে প্রবেশ করেছে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে সে বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুন্‌তে পায়।

১১৭

সাহাজাদপুর,
৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

অনেককাল বোটের মধ্যে বাস করে হঠাৎ সাজাদপুরের বাড়িতে এসে উত্তীর্ণ হলে বড় ভাললাগে। বড় বড় জানলাদরজা—চারিদিক থেকে আলো বাতাস আস্‌চে—যেদিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই গাছের সবুজ ডালপালা চোখে পড়ে এবং পাখীর ডাক শুন্‌তে পাই; দক্ষিণের বারান্দায় কেবলমাত্র কামিনীফুলের গন্ধে মস্তিষ্কের সমস্ত রন্ধ্র পূর্ণ হয়ে ওঠে। হঠাৎ বুঝতে পারি এতদিন বৃহৎ আকাশের জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষুধা ছিল সেটা এখানে এসে পেটভরে পূর্ণ করে নেওয়া গেল। আমি চারটি বৃহৎঘরের একলা মালিক—সমস্ত দরজাগুলি খুলে বসে থাকি। এখানে যেমন আমার মনে লেখবার ভাব ও ইচ্ছা আসে এমন কোথাও না। বাইরের জগতের একটা সজীব প্রভাব ঘরে অবাধে প্রবেশ করে, আলোতে আকাশে বাতাসে শব্দে গন্ধে সবুজ হিল্লোলে এবং আমার মনের নেশায় মিশিয়ে কত গল্পের ছাঁচ তৈরি হয়ে ওঠে। বিশেষত এখানকার দুপুরবেলাকার মধ্যে একটা নিবিড় মোহ আছে। রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জ্জনতা, পাখীদের, বিশেষত, কাকের ডাক, এবং সুন্দর সুদীর্ঘ অবসর—সবসুদ্ধ আমাকে উদাস করে দেয়। কেন জানিনে, মনে হয়, এই রকম সোনালি রৌদ্রেভরা দুপুরবেলা দিয়ে আরব্যউপন্যাস তৈরি হয়েছে—অর্থাৎ সেই পারস্য এবং আরব্যদেশ, দামাস্ক, সমরকন্দ, বুখারা—আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, শিরাজের মদ,—মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড়সওয়ার পথিক, ঘনখেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছজলের উৎস,—নগরের মাঝে মাঝে চাঁদোয়াখাটানো সঙ্কীর্ণ বাজারের পথ, পথের প্রান্তে পাগড়ি এবং ঢিলে কাপড়পরা দোকানী খর্ম্মুজ এবং মেওয়া বিক্রি করচে; পথের ধারে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, ভিতরে ধূপের গন্ধ, জানলার কাছে বৃহৎ তাকিয়া এবং কিংখাব বিছানো; জরির চটি, ফুলো পায়জামা এবং রঙিন কাঁচলি পরা আমিনা জোবেদি সুফি, পাশে পায়ের কাছে কুণ্ডলায়িত গুড়গুড়ির

নল গড়াচ্চে, দরজার কাছে জমকালো কাপড়পরা কালো হাব্‌ষি পাহারা দিচ্চে, এবং এই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে, এই ঐশ্বর্য্যময় সৌন্দর্য্যময় ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে, মানুষের হাসিকান্না আশাআকাঙ্ক্ষা নিয়ে কত শতসহস্ররকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্চে। আমার এই সাজাদপুরের দুপুরবেলা গল্পের দুপুরবেলা। মনে আছে ঠিক এই সময়ে এই টেবিলে বসে আপনার মনে ভোর হয়ে পোষ্টমাষ্টার গল্পটা লিখেছিলুম। আমিও লিখ্‌ছিলুম এবং আমার চারদিকের আলো, বাতাস ও তরুশাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ করে দিচ্ছিল। এই রকম চতুর্দ্দিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে নিজের মনের মত একটা কিছু রচনা করে যাওয়ার যে সুখ তেমন সুখ জগতে খুব অল্পই আছে। আজ সকালে বসে "ছড়া" সম্বন্ধে একটা লেখা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম—বড় ভাল লাগ্‌ছিল। ছড়ার রাজ্যে আইনকানুন নেই, মেঘরাজ্যের মত। দুর্ভাগ্যক্রমে যে রাজ্যেই থাকি আইনকানুনের বৈষয়িক রাজ্যকে বাধা দেবার জো নেই; আমার লেখার মাঝখানে তারই একটা উপদ্রব উপস্থিত হল—আমার মেঘের ইমারৎ উড়িয়ে দিলে। এইসব ব্যাপারে আহারের সময় এসে পড়ল। দুপুরবেলায় পেটভরে খাওয়ার মত এমন জড়ত্বজনক আর কিছুই নেই। আমরা বাঙালীরা কসে মধ্যাহ্নভোজন করি বলেই মধ্যাহ্নটাকে হারাই। দরজা বন্ধ করে তামাক খেতে খেতে পান চিবতে চিবতে পরিতৃপ্ত নিদ্রার আয়োজন হতে থাকে, তাতেই আমরা বেশ চিক্‌চিকে গোলগাল হয়ে উঠি। অথচ বাংলাদেশের বৈচিত্র্যহীন সুদূরপ্রসারিত সমতল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে জনহীন শ্রান্ত মধ্যাহ্ন যেমন গভীরভাবে বৃহৎ ভাবে বিস্তীর্ণ হতে পারে এমন আর কোথাও না।

১১৮

পতিসর,

১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

ভাদ্রমাসের দিন, বাতাস বেশি নেই; বোটের শিথিল পাল ঝুলে ঝুলে পড়চে— নৌকাটি আলস্যমন্থরগমনে অত্যন্ত উদাসীনের মত চলেছে। এই শৈবালবিকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ জলরাজ্যের মধ্যে শরতের উজ্জ্বল রৌদ্রে আমি জানালার কাছে এক চৌকিতে বসে আরএক চৌকির উপরে পা দিয়ে সমস্ত বেলা কেবল গুন্ গুন্ করে গান করচি। রামকেলী প্রভৃতি সকালবেলাকার সুরের একটু আভাস লাগাবামাত্র এমন একটি বিশ্বব্যাপী করুণা বিগলিত হয়ে চারিদিককে বাষ্পাকুল করচে যে এই সমস্ত রাগিণীকে সমস্ত আকাশের সমস্ত পৃথিবীর নিজের গান বলে মনে হচ্চে। এ একটা ইন্দ্রজাল, একটা মায়ামন্ত্র। আমার এই গুন্ গুন্ গুঞ্জরিত সুরের সঙ্গে কত টুক্‌রো টুক্‌রো কথা যে আমি জুড়ি তার সংখ্যা নেই। এমন একলাইনের গান সমস্তদিন কত জম্‌চে এবং কত বিসর্জ্জন দিচ্চি। এই চৌকিটাতে বসে আকাশ থেকে সোনালি রোদ্দুরটুকু চোখ দিয়ে চাখ্‌তে চাখ্‌তে এবং জলের উপরকার শৈবালের সরস কোমলতার উপর মনটাকে বুলিয়ে চল্‌তে চল্‌তে যতটুকু অনায়াস আপনাভরে আপনি মাথায় এসে পড়ে তার বেশি চেষ্টা করা আপাতত আমার সাধ্যাতীত। আজ সমস্ত সকাল নিতান্ত সাদাসিধা রামকেলীতে যে গোটাদুইতিন ছত্র বারবার আবৃত্তি করেছিলুম সেটুকু মনে আছে—নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করে দিলুম :—

ওগো তুমি নবনবরূপে এস প্রাণে!—(আমার নিত্যনব)
এস গন্ধেবরণেগানে!
আমি যেদিকে নিরখি তুমি এসহে
আমার মুগ্ধমুদিত নয়ানে।

১২৬

দিঘাপতিয়া জল পথে,
২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

বড় বড় গাছ জলের মধ্যে সমস্ত গুঁড়িটি ডুবিয়ে দিয়ে শাখাপ্রশাখা জলের উপর অবনত করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আম গাছ বটগাছের অন্ধকার জঙ্গলের ভিতর নৌকা বাঁধা, এবং তারি মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গ্রামের লোকেরা স্নান করচে। এক একটি কুঁড়েঘর স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তার চারপাশের প্রাঙ্গণ জলমগ্ন। ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে বোট সরসর শব্দে যেতে যেতে হঠাৎ কোনো জলাশয়ের মধ্যে গিয়ে পড়ে—সেখানে নালবনের মধ্যে শাদা শাদা নালফুল ফুটে আছে—পানকৌড়ি জলের ভিতর ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরচে। জল যেখানে সুবিধা পাচ্চে প্রবেশ করচে—স্থলের এমন পরাভব আর কোথাও দেখা যায় না। আর একটু জল বাড়লেই ঘরের ভিতরে জল প্রবেশ করবে, তখন মাচা বেঁধে তার উপরে বাস করতে হবে; গরুগুলো দিনরাত একহাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে; রাজ্যের সাপ জলমগ্ন গর্ত্ত ত্যাগ করে ঘরের চালে আশ্রয় নেবে এবং যেখানকার যত গৃহহীন কীটপতঙ্গ সরীসৃপ মানুষের সহবাস গ্রহণ করবে। যখন গ্রামের চারিদিকের জঙ্গলগুলো জলে ডুবে পাতালতাগুল্মে পচতে থাকে, গোয়ালঘর ও লোকালয়ের বিবিধ আবর্জ্জনা চারিদিকে ভেসে বেড়ায়, পাট পচানির গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত, উলঙ্গ পেটমোটা পা-সরু রুগ্ন ছেলে-মেয়েরা যেখানেসেখানে জলেকাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে—মশার ঝাঁক স্থির জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মত ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়; গৃহস্থের মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মত ঘরকন্নার নিত্য-কর্ম্ম করে যায় তখন সে দৃশ্য কোনোমতেই ভাল লাগে না। ঘরে ঘরে বাতে ধরচে, পা ফুল্‌চে, সর্দ্দি হচ্চে, জ্বরে ধরচে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদচে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারচে না—এত অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য্য, দারিদ্র্য, মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত্ত সহ্য হয়? সকল রকম শক্তির কাছেই আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। প্রকৃতি উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা উপদ্রব করে তাও সই, শাস্ত্র চিরদিন ধরে যে সকল উপদ্রব করে আস্‌চে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বল্‌তে সাহস হয় না।

১১৫

বোয়ালিয়ার পথে,
২২ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

যখন ভেবে দেখি এ জীবনে কেবলমাত্র ৩২টি শরৎকাল এসেছে এবং গেছে তখন ভারি আশ্চর্য্য বোধ হয়। অথচ মনে হয় আমার স্মৃতিপথ ক্রমশই অস্পষ্টতর হয়ে অনাদিকালের দিকে চলে গেছে এবং এই বৃহৎ মানসরাজ্যের উপর যখন মেঘমুক্ত সুন্দর প্রভাতের রৌদ্রটি এসে পড়ে তখন আমি যেন আমার এক মায়া-অট্টালিকার বাতায়নে বসে এক সুদূর বিস্তৃত ভাবরাজ্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি এবং আমার কপালে যে বাতাসটি এসে লাগতে থাকে সে যেন অতীতের সমস্ত অস্পষ্ট মৃদু গন্ধপ্রবাহ বহন করে আনতে থাকে। আমি আলো ও বাতাস এত ভালবাসি! গেটে মরবার সময় বলেছিলেন—More light—আমার যদি সে সময়ে কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করবার থাকে ত আমি বলি More light and more space! অনেকে বাংলা দেশকে সমতলভূমি বলে আপত্তি প্রকাশ করে—কিন্তু সেই জন্যেই এ দেশের মাঠের দৃশ্য নদীতীরের দৃশ্য আমার এত বেশি ভাল লাগে। যখন সন্ধ্যার আলোক এবং সন্ধ্যার শান্তি উপর থেকে নামতে থাকে তখন সমস্ত অনবরুদ্ধ আকাশটি একটি নীলকান্তমণির পেয়ালার মত আগাগোড়া পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে; যখন স্তিমিত শান্ত নীরব মধ্যাহ্ন তার সমস্ত সোনার আঁচলটি বিছিয়ে দেয় তখন কোথাও সে বাধা পায় না—চেয়ে চেয়ে দেখবার এবং দেখে দেখে মনটা ভরে নেবার এমন জায়গা আর কোথায় আছে!

১২৮

রোয়ালিয়া,

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

আমি অনেক সময় ভেবে দেখেছি সুখী হলুম কি দুঃখী হলুম সেইটে আমার পক্ষে শেষ কথা নয়। আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি সমস্ত সুখদুঃখের ভিতরে নিজের একটা প্রসার অনুভব করতে থাকে। আমাদের ক্ষণিক জীবন এবং চিরজীবন দুটো একত্র সংলগ্ন হয়ে আছে মাত্র কিন্তু দুটো এক নয় এ আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করি। আমাদের ক্ষণিক জীবনই সুখ-দুঃখ ভোগ করে, আমাদের চিরজীবন সেই সুখ দুঃখ নেয় না, তার থেকে একটা তেজ সঞ্চয় করে। গাছের পাতা প্রতিদিন রৌদ্রে প্রসারিত হয়ে শুষ্ক হয়ে ঝরে যাচ্চে, আবার নতুন পাতা গজাচ্চে; গাছের ক্ষণিক জীবন কেবল রৌদ্র ভোগ করচে এবং সেই উত্তাপেই শুকিয়ে পড়ে যাচ্চে, আর গাছের চিরজীবন তার ভিতর থেকে দাহহীন চির অগ্নি সঞ্চয় করচে। আমাদেরও প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্ত্তের পল্লবরাশি চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়ে জগতের সমস্ত প্রবহমান সুখ দুঃখ ভোগ করচে এবং সেই সুখ দুঃখের উত্তাপেই শুষ্ক হয়ে দগ্ধ হয়ে ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্চে কিন্তু আমাদের চিরজীবনকে সেই প্রতিমুহূর্ত্তের দাহ স্পর্শ করতে পারচেনা, অথচ তার তেজটুকু সে ক্রমাগতই গ্রহণ করচে। যে মানুষের প্রতিমুহূর্ত্তের সুখদুঃখ ভোগশক্তি সামান্য, তার দাহও অল্প, তেমনি তার চিরপ্রাণের সঞ্চয়ও অকিঞ্চিৎকর। *সুখদুঃখের তাপ থেকে সংরক্ষিত হয়ে তাদের ক্ষণিক জীবনটা অনেকদিন স্থির থাকে,* তারা অচেতনতার আবরণে ক্ষণিককে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী করে রাখে; দুদিনকে এমনি তাজা রেখে দেয় যে হঠাৎ মনে হয় তা চিরদিনের; সংসারের সামান্য ব্যাপারকে এমনি করে তোলে যেন তা অসামান্য।

———•———

১৫১

বোয়ালিয়া,
২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

আমরা যখন খুব বড় রকমের একটা আত্মবিসর্জ্জন করি তখন কেন করি? একটা মহৎ আবেগে আমাদের ক্ষণিক জীবনটা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার সুখদুঃখ আমাদের আর স্পর্শ করতে পারে না। আমরা হঠাৎ দেখ্তে পাই আমরা আমাদের সুখদুঃখের চেয়ে বড়, আমরা প্রতিদিনের তুচ্ছবন্ধন থেকে মুক্ত। সুখের চেষ্টা এবং দুঃখের পরিহার, এই আমাদের ক্ষণিকজীবনের প্রধান নিয়ম কিন্তু এক একটা সময় আসে যখন আমরা আবিষ্কার করতে পারি যে, আমাদের ভিতরে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে সে নিয়ম খাটে না। তখন আমরা আমাদের ক্ষণিক জীবনটাকে পরাভূত করেই একটা আনন্দ পাই, দুঃখকে গলার হার করে নিয়েই মনে উল্লাস জন্মায়। তখন মনে হয় অন্তরের সেই স্বাধীন পুরুষের বলেই সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে চিরকাল আমি আমার প্রকৃতির সফলতাসাধন করব। কিন্তু আবার চারিদিকের সংসারের জনতা, প্রতিদিনের ক্ষুধাতৃষ্ণা, প্রবল হয়ে উঠে সেই অন্তরতম স্বাধীনতার ক্ষেত্রটিকে আমাদের চোখ থেকে ঢেকে ফেলে, তখন আত্মবিসর্জ্জন সুকঠিন হয়ে ওঠে। আমি যখন একলা মফস্বলে থাকি তখন প্রকৃতির ভিতরকার আনন্দ আমার অন্তরের আনন্দনিকেতনের দ্বার খুলে দেয়; গানের সুরের দ্বারা গানের কথাগুলো যেমন অমরতাপ্রাপ্ত হয় তেমনি প্রাত্যহিক সংসারটা অন্তরের চিরানন্দরাগিণীর দ্বারা চিরমহিমা লাভ করে; আমাদের সমস্ত স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধ একটি বিনম্র ধর্ম্মোপাসনার ভাবে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে ওঠে,—দুঃখবেদনার দুঃখত্ব যে চলে যায় তা নয় কিন্তু সে যেন আমার নিজত্বের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করে এমন সুবৃহৎ আকাশে ব্যাপ্ত হয় যে সেখানে সে একটা সৌন্দর্য্য বিকিরণ করতে থাকে। এবার বোটে এসে আমি অন্তর্যামী নামক একটি কবিতা লিখেছি তাতে আমি আমার অন্তরজীবনের কথা অনেকটা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি!

১২৪

কলিকাতা,

৫ই অক্টোবর, ১৮৯৪।

আজ সকালের বাতাসে অতি ঈষৎ শীতের সঞ্চার হয়েছে, একটুখানি শিউরে ওঠার মত। কাল দুর্গোৎসব; আজ তার সুন্দর সূচনা। ঘরে ঘরে দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দ প্রবাহিত হচ্চে তখন তাদের সঙ্গে আমার ধর্ম্মসংস্কারের বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে। পশু দিন স-র বাড়ি যাবার সময় দেখেছিলুম রাস্তার দুধারে প্রায় বড় বড় বাড়ির দালানমাত্রেই প্রতিমা তৈরি হচ্চে। দেখে আমার মনে হল, দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই হঠাৎ দিনকয়েকের জন্যে ছেলেমানুষ হয়ে উঠে একটা বড় গোছের খেলায় লেগে গেছে। ভেবে দেখতে গেলে আনন্দের আয়োজনমাত্রই পুতুলখেলা—অর্থাৎ তাতে আনন্দ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, লাভ নেই—বাইরে থেকে দেখে মনে হয় সময় নষ্ট। কিন্তু সমস্ত দেশের লোকের মনে যাতে একটা ভাবের আন্দোলন এনে দেয় তা কি কখনো নিষ্ফল হতে পারে? সমাজের মধ্যে কত লোক আছে যারা নীরস বিষয়ী-লোক—এই উৎসবে তাদেরও মন একটা সর্ব্বব্যাপী ভাবের টানে বিচলিত হয়ে সকলের সঙ্গে মিলে যায়। এমনি করে প্রতিবৎসর কিছুকালের জন্য মনের এমন একটি অনুকূল আর্দ্র অবস্থা আসে যাতে স্নেহ প্রীতি দয়া সহজে অঙ্কুরিত হতে পারে; আগমনী বিজয়ার গান, প্রিয়সম্মিলন, নহবতের সুর, শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা সমস্তটা মিলে মনের মধ্যে আনন্দকাব্য রচনা করে। ছেলেদের যে আনন্দ সেইটেই বিশুদ্ধ আনন্দের আদর্শ। তারা তুচ্ছ উপলক্ষ্যকে নিয়ে নিজের মন দিয়ে ভরে তোলে, সামান্য কদাকার পুতুল নিয়ে তাকে নিজের ভাব দিয়ে সুন্দর ও প্রাণ দিয়ে সজীব করে তোলে। এই ক্ষমতাটা যে লোক বড় বয়স পর্য্যন্ত রাখতে পারে সেইত ভাবুক। তার কাছে চারিদিকের বস্তু কেবল বস্তু নয়—কেবল দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর নয় কিন্তু ভাবগোচর—তার সমস্ত সঙ্কীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা সে একটি সঙ্গীতের দ্বারা পূর্ণ করে নেয়। দেশের সমস্ত লোক ভাবুক হতেই পারে না কিন্তু এই রকম উৎসবের সময় ভাবস্রোত অধিকাংশ লোকের মনকে অধিকার করে। তখন, যেটাকে দূরে থেকে সামান্য পুতুল বলে মনে হয়, কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে তার সে মূর্ত্তি থাকে না।

কলিকাতা,

১২৫   ৭ই অক্টোবর, ১৮৯৫।

আমাদের যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে কেবল নিজের ইচ্ছা অনুসারে দিতে পারিনে। সে আমাদের আয়ত্তের অতীত, তা আমাদের দানবিক্রয়ের ক্ষমতা নেই। মূল্য নিয়ে বিক্রি করতে চেষ্টা করলেই তার উপরকার আবরণটি কেবল পাওয়া যায়, আসল জিনিষটি হাত থেকে সরে যায়। নিজের যা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কজনই বা তা নিজে ধরতে বা পৃথিবীতে রেখে যেতে পেরেছে? আমরা দৈবক্রমে প্রকাশিত হই, ইচ্ছা করলে চেষ্টা করলে প্রকাশিত হতে পারিনে। চব্বিশ ঘণ্টা যাদের কাছে থাকি তাদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত। কারো কারো এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, যে অন্যের ভিতরকার সত্যটিকে সে অত্যন্ত সহজেই টেনে নিতে পারে। সে তার নিজের গুণে। যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে অন্তরের কথা তার চিঠিতে প্রকাশ পাচ্চে তাহলে এই বুঝতে হবে যে যাকে চিঠি লেখা হচ্চে তারো একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে।

বোলপুর,

১৯শে অক্টোবর, ১৮৯৪।

কাল কেবল বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে একখানি ছোট কবিতা লিখেছি এবং একটি তিব্বতভ্রমণের বই পড়েছি। এরকম জায়গায় নভেল আমি ছুঁতে পারিনে। এই জনশূন্য মাঠের মধ্যে, শালবনের বেষ্টনে, সমস্ত-দরজা খোলা জাজিমপাতা দোতলার একলা ঘরে, পাখীদের করুণকলধ্বনিপূর্ণ স্বপ্নাবেশময় শরৎমধ্যাহ্নে বিলাতি-নভেল কোনোমতেই খাপ খায় না। ভ্রমণবৃত্তান্তের একটা মস্ত সুবিধা এই যে তার মধ্যে অবিশ্রাম গতি আছে অথচ প্লটের বন্ধন নেই—মনের একটি অবারিত স্বাধীনতা পাওয়া যায়। এখানকার জনহীন মাঠের মাঝখান দিয়ে একটি রাঙা রাস্তা চলে গেছে; সেই রাস্তা দিয়ে যখন দুইচার জন লোক কিম্বা দুটো একটা গোরুর গাড়ি মন্থর গমনে চলতে থাকে তার বড় একটা টান আছে;—মাঠ তাতে আরো যেন ধূ ধূ করে ওঠে; মনে হয় এই মানুষগুলো যে কোথায় যাচ্চে তার যেন কোনো ঠিকানা নেই। ভ্রমণবৃত্তান্তের বইও আমার এই মানসিক নিরালার মধ্যে সেই রকম একটি গতিপ্রবাহের ক্ষীণ রেখা অঙ্কিত করে দিয়ে চলে যেতে থাকে—তাতে করে আমার মনের সুবিস্তীর্ণ নিস্তব্ধ নির্জ্জন আকাশটি আরো যেন বেশি করে অনুভব করতে পারি।

১২৫

বোলপুর,
২৮শে অক্টোবর, ১৮৯৪।

এখনো আটটা বাজেনি তবু মনে হচ্চে যেন অর্দ্ধরাত্রি। কলকাতার বাড়িতে এখন কে কি করচে কিছুই জানিনে। পৃথিবীতে আমরা যাদের জানি সবাইকেই ফুট্‌কি লাইনে জানি—অর্থাৎ মাঝে মাঝে অনেকখানি ফাঁক—সেই ফাঁকগুলো নিজের মনে যেমনতেমন করে ভরিয়ে নিতে হয়। যাদের মনে করি সবচেয়ে ভাল জানি তাদেরও পরিচয়ের সঙ্গে বহুল পরিমাণে নিজের কল্পনা মিশিয়ে নিতে হয়। কত জায়গায় ঐক্যধারা ছিন্ন হয়, পথচিহ্ন লুপ্ত হয়, অনিশ্চিত অস্পষ্ট অন্ধকার থেকে যায়। সুপরিচিত লোকও যদি কল্পনার সূত্রে গাঁথা ছিন্ন অংশমাত্র হয় তাহলে কার সঙ্গে কিসের সঙ্গেইবা আমার পরিচয় আছে—আমাকেই বা অবিচ্ছিন্ন রেখায় কে জানে? কিন্তু হয়ত বিচ্ছিন্ন বলেই, হয়ত তাদের মধ্যে কল্পনাযোজনার স্থান আছে বলেই তারা আমাদের যথার্থ অন্তরঙ্গ। নইলে অপরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিহিসাবে বোধ হয় সকলেই অন্তর্যামী ছাড়া আর সকলের কাছেই দুষ্প্রাপ্য। আমরা নিজেকেও অংশ-অংশ করে জানি—কল্পনাদিয়ে পূরিয়ে নিয়ে একটা স্বরচিত গল্পের নায়ক করে নিই মাত্র। খণ্ড উপকরণ নিয়ে আমরা নিজেকে নিজে সৃষ্টি করে তুলব বলেই বিধাতা এই বিচ্ছেদগুলি রেখে দিয়েছেন।

বোলপুর,

১২৮ ৩১শে অক্টোবর ১৮৯৪।

প্রথম শীতের আরম্ভে সমস্ত দিন ধরে যে একটা উত্তুরে বাতাস দিতে থাকে সেইটে আজ সকাল থেকে সুরু হয়েছে। বাতাসটা হীহী করতে করতে আসচে আর আমলকি তরুশ্রেণীর পাতাগুলি হলদে হয়ে উঠে কাঁপতে কাঁপতে ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্চে। এখানকার বনরাজ্যের মধ্যে যেন খাজনাআদায়ের পেয়াদা এসেছে—সমস্ত কাঁপচে, ঝরচে এবং দীর্ঘনিশ্বাসে আকুলিত হয়ে উঠচে। দুপুরবেলাকার রৌদ্রক্লান্ত বিশ্রামপূর্ণ বৈরাগ্যে, ঘন আম্রশাখায় ঘুঘুর অবিশ্রামকূজনে এই ছায়ালোকখচিত স্বপ্নাতুর প্রহরগুলাকে যেন বিরহবিধুর করে তুলচে। আমার টেবিলের উপরকার ঘড়ির শব্দটাও এই মধ্যাহ্নের সুরের সঙ্গে যেন তাল রেখে চলেছে, ঘরের ভিতরে সমস্ত দুপুরবেলাটা কাঠবিড়ালীর ছুটাছুটি চলছে। ফুলো ল্যাজ, কালো এবং ধূসর রেখায় অঙ্কিত রোমশ নরম গা, ছোট দুটি কালো কৌটার মত দুটি চঞ্চল চোখ, নিতান্তই নিরীহ অথচ অত্যন্ত কেজো লোকের মত ব্যস্ত ভাবটা দেখে আমার বেশ মজা লাগে। এই ঘরের কোণে লোহার জাল দেওয়া আলমারিতে ডাল চাল প্রভৃতি আহার্য্য সামগ্রী এই সমস্ত লোভীদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়—ঔৎসুক্যব্যগ্র নাসিকাটি নিয়ে তারা সারাদিন এই আলমারিটার চারিদিকে ছিদ্র খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্চে। দু চারটা কণা যা আলমারির বাইরে বিক্ষিপ্ত থাকে সেইগুলিকে সন্ধান করে নিয়ে সামনের গুটি-কয়েক ছোট তীক্ষ্ণ দন্ত দিয়ে কুট্‌কুট্ করে ভারি তৃপ্তির সঙ্গে তারা আহার করে; মাঝে মাঝে লেজের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসে' সামনের দুটি হাত জোড় করে' সেই শস্যকণাগুলিকে মুখের মধ্যে গুছিয়েগাছিয়ে জুৎ করে নিতে থাকে,—এমন সময় আমি একটুখানি নড়েছি কি অমনি চকিতের মধ্যে লেজটি পিঠের উপর তুলে দিয়ে দে-দৌড়। যেতে যেতে হঠাৎ একবার অর্দ্ধপথে পাপোষটার উপর থেমে একটা পা তুলে ফস্ করে একটা কাণ চুলকে নিয়ে আবার এসে উপস্থিত—এমনি সমস্ত বেলাই কুট্‌কাট্ দুড়্‌দুড়্ এবং তৈজসপত্রের মধ্যে টুংটাং ঝুন্‌ঝুন্ চলচেই।

কলিকাতা,

১২৮

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

ছেলেবেলা থেকে ঐ ফেরিওয়ালার হাঁকগুলো আমাকে কেমন একটু বিচলিত করে,—নিস্তব্ধ দুপুর বেলায় চীলের তীক্ষ্ণ ডাকটাও আমাকে যেন উদাস করে দিত। অনেকদিন সেই ডাকটা আমার কানে আসে নি। আজকাল যে চিল ডাকে না তা নয়—আমারই এখন চিন্তা বেশি কাজও ঢের; প্রকৃতির সঙ্গে আর আমার সে রকম ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। এখন সময় ফেলে রাখা চলে না; যদি বা মনের গতিকে কোনো বিশেষ কাজ করতে প্রবৃত্তি না হয় তবু একটা কাজের চেষ্টা করতে হয়, নিদেন অন্যমনস্কভাবেও একটা বই পড়বার ভান না করলে মন সুস্থ থাকে না।—এটা কিন্তু কলকাতায়। মফস্বলে গেলে চুপ করে চেয়ে থাকলেও হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, কাজের অন্ধ দাসত্ব করতে হয় না। কর্ত্তব্য কাজের বিরুদ্ধে কিছু বলতেই সাহস করিনে কিন্তু যখন উপস্থিত কোনো কাজ নেই কিম্বা ভাল করে সম্পন্ন করবার শক্তি নেই তখনো কেবল অভ্যাসবশতঃ বা সময়যাপনের তাগিদে যদি কাজ খুঁজে বেড়াতে হয়, তখনো যদি আপনাকে নিয়ে আপনি শান্তি না পাওয়া যায়, তাহলে অবস্থাটা খারাপ হয়েছে বলতে হবে। কাজ একটা উদ্দেশ্যসাধনের উপায়মাত্র; মানুষত কাজের যন্ত্র নয়, পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে বিরামলাভ করবার শক্তিটা একেবারে হারানো ত কিছু নয়, কেননা তার মধ্যেও মনুষ্যত্বের একটা উচ্চ অধিকার আছে। দিন ও রাত্রি কাজ ও বিরামের উপমা। দিনের বেলায় পৃথিবী ছাড়া আর আমাদের কিছুই নেই, রাত্রে পৃথিবীটাই কম, অনন্ত জ্যোতিষ্ক-জগৎটাই বেশি। তেমনি কাজের দিনে যুক্তিতর্কের আলোকে পৃথিবীটাকেই খুব স্পষ্ট করে চোখের সামনে রাখা চাই—কিন্তু যখন বিশ্রামের সন্ধ্যা তখন পৃথিবীটাকে হ্রাস করে দেওয়াই দরকার, তখন বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যে বিরাট যোগ আছে সেইটেকেই বড় করে দেখা চাই। সকালবেলায় উঠে জানা চাই আমরা পৃথিবীর মানুষ, দিন অবসান হয়ে এলে অনুভব করা চাই আমরা জগৎবাসী।

——*——

১৯৩

শিলাইদা,

২৮শে নবেম্বর, ১৮৯৪।

দিগন্তের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত বালির চর ধূধূ করচে—তাতে না আছে ঘাস, না আছে গাছ, না আছে বাড়িঘর, না আছে কিছু। আকাশের শূন্যতা সমুদ্রের শূন্যতা আমাদের চিরাভ্যস্ত, তার কাছে আমরা আর কিছু দাবি করিনে,—কিন্তু ভূমির শূন্যতাকে সব চেয়ে বেশি শূন্য বলে মনে হয়। কোথাও গতি নেই, জীবন নেই, বৈচিত্র্য নেই; যেখানে ফলে শস্যে তৃণে পশুপক্ষীতে ভরে যেতে পারত সেখানে একটি কুশের অঙ্কুর পর্য্যন্ত নেই,—কেবল একটা উদাস কঠিন নিরবচ্ছিন্ন বৈধব্যের বন্ধ্যাদশা। ঠিক পাশ দিয়ে পদ্মা চলে যাচ্চে, ওপারে ঘাট, বাঁধা নৌকা, স্নানরত লোকজন, নারকেল এবং আমের বাগান, অপরাহ্ণে নদীর ধারের হাটে কলধ্বনি—দূরে পাবনার পারে তরুশ্রেণীর ঘননীল রেখা—কোথাও গাঢ়নীল, কোথাও পাণ্ডুনীল, কোথাও সবুজ, কোথাও মাটির ধূসরতা—আর তারই মাঝখানে এই রক্তশূন্য মৃত্যুর মত ফ্যাকাসে সাদা। সন্ধ্যাবেলা সূর্য্যাস্তের সময় এই চরের উপর আর কিছুই নেই, কেউ নেই, কেবল আমি একলা।

শিলাইদা,

১২৮

৭ই ডিসেম্বর, ১৮৯৪।

শুক্লসন্ধ্যার চরে যখন একলা বেড়াই, খানিকবাদে শ—প্রায় আসে। কালও সে এসেছিল কাজকর্ম্মের কথা কওয়ার পর যেই একটু চুপ করেছি অমনি হঠাৎ দেখ্‌লুম অনন্ত জগৎ সেই সন্ধ্যার আকাশে নীরবে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। কানের কাছে একটি মানুষের তুচ্ছ কথায় এই অসীম আকাশভরা একটি আবির্ভাব আবৃত হয়ে গিয়েছিল। যেই মানুষ চুপ করলে অমনি দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিস্তব্ধ নক্ষত্রলোক হতে শান্তি নেমে এসে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করে তুললে;—যে সভার মধ্যে অনন্তকোটি জ্যোতিষ্ক নীরবে সমাগত আমিও সেই সভার একপ্রান্তে স্থান পেলুম। অস্তিত্ব নামক এক মহাশ্চর্য্য ব্যাপারের মধ্যে ওরা এবং আমি এক আসন পেয়েছি।

সকাল সকাল বেড়াতে বেরই। যতক্ষণ না শ—আসে ততক্ষণ মনটাকে শান্তশীতল করে নিই। তারপরে হঠাৎ শ—এসে যখন জিজ্ঞাসা করে, আজ দুধ খেয়ে কেমন ছিলেন, কিম্বা আজ কি মাসকাবারী হিসাব দেখা শেষ হয়ে গেছে তখন বড় খাপছাড়া শুনতে হয়। আমরা নিত্য এবং অনিত্যের ঠিক এমন মাঝখানে পড়ে দুই দিকের ধাক্কা খেয়ে চলে যেতে থাকি। যখন আধ্যাত্মিক কথা হচ্চে তখন গায়ের কাপড় এবং পেটের ক্ষিদের কথা আন্‌লে ভারি অসঙ্গত শুনতে হয়, অথচ আত্মা এবং পেটের ক্ষিদে চিরকাল একত্রেই যাপন করে এল। যেখানটাতে জ্যোৎস্নালোক পড়চে সেইখানেই আমার জমিদারী,—অথচ জ্যোৎস্না বলচে তোমার জমিদারী মিথ্যা, জমিদারী বলচে তোমার জ্যোৎস্নাটা আগাগোড়াই ফাঁকি। আমি ব্যক্তি এরি ঠিক মাঝখানে।

১১৮

শিলাইদা,

১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৯৪।

এই চরগুলো একসময়ে জলের নীচে ছিল কি না সেইজন্যে এক এক জায়গায় অনেক দূর পর্য্যন্ত বালির উপর জলের ঢেউখেলানো পদচিহ্ন পড়ে গেছে। সেই সমস্ত থাকে থাকে ভাঁজ করা বালির উপর নানারঙের চিকন আভা পড়ে ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড সাপের নানারঙা খোলসের মত দেখাচ্ছিল। আমি মনে করলুম, পদ্মা ত একটা প্রকাণ্ড নাগিনীই বটে। সে এক সময় এই বৃহৎ চরের উপর বাস করত, এখন সেখানে কেবল তার একটা বৃহৎ খোলস সন্ধ্যার আলোয় পড়ে চিক্‌চিক্ করচে। বর্ষার সময় সে আপনার সহস্র ফণা তুলে ডাঙার উপর ছোবল মারতে মারতে গর্জ্জন করতে করতে কেমন করে আপনার প্রকাণ্ড বাঁকা লেজ আছড়াতে আছড়াতে ফুলতে ফুলতে চলত সেই দৃশ্যটাও মনে পড়ল। এখন সে শীতকালের সরীসৃপ বিবরের মধ্যে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট হয়ে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় প্রতিদিন ক্ষীণতর হয়ে যাচ্চে।

বেড়াতে বেড়াতে ক্রমে এত বিচিত্র রং কখন আস্তে আস্তে মিলিয়ে এল— কেবল জ্যোৎস্নায় একরঙা শুভ্রতায় জলস্থল মণ্ডিত হয়ে গেল। একসময় যে পূর্ব্বদিকে দিনের উদয় হয়েছিল জগতে কোথাও তার আর কোনো স্মৃতিচিহ্নই রহিল না।

১৩৯

শিলাইদা,

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫।

ইচ্ছা করচে শীতটা ঘুচে গিয়ে প্রাণ খুলে বসন্তের বাতাস দেয়—আচ-কানের বোতামগুলো খুলে একবার খোলা জালিবোটের উপর পা ছড়িয়ে দিই এবং কর্ত্তব্যের রাস্তা ছেড়ে দিনকতক সম্পূর্ণ অকেজো কাজে মন দিই। বছরের ছমাস আমি এবং ছমাস আর কেউ যদি সাধনার সম্পাদক থাকে তাহলেই ঠিক সুবিধামত বন্দোবস্ত হয়। কারণ, সম্বৎসর খ্যাপামি করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই এবং সম্বৎসর অপ্রমত্ততা বজায় রেখে চলা আমার মত লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য। এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছমাস অন্তর ঋতুপরিবর্ত্তন হচ্চে—আর আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য বারোমাস সমভাবে ভদ্রতারক্ষা করে চলি কি করে? মানুষের মহা মুস্কিল এই, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সমাজের আইন অনুসারে তাকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন একভাবেই চলতে হয়। আসলে নিজের মধ্যে যে একটা চিরনূতন চিররহস্য আছে সেটাকে সলজ্জে সভয়ে গোপন করে নিজেকে সর্ব্বসাধারণের কাছে নিতান্ত চিরাভ্যস্ত রুটীন-চালিত যন্ত্রটির মত দেখাতে হবে। সেই জন্যে থেকে থেকে মানুষ বিগড়ে যায়, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; সেই জন্যে অবাধে আপনাকে উপলব্ধি করতে শিল্পসাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়। সেইজন্যে সাহিত্য দস্তুরের আঁচলধরা হলে নিজের উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে। সেইজন্যে বৈঠকখানা ঘরে শিষ্টালাপে যে সব কথা চলে না সাহিত্যে সেগুলি গভীরতা ও উদারতা লাভ করে অসঙ্কোচে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে। এই জন্যই ড্রয়িং রুমের চা-পান সভার সুসভ্য সীমার মধ্যে সাহিত্যকে বদ্ধ করতে গেলে বিরাট বিশ্ব-প্রকৃতিকে ছিটের গাউন পরানোর মত হয়।

শিলাইদহ

৮৯

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪।

অদৃষ্টের পরিহাসবশতঃ, ফাল্গুনের এক মধ্যাহ্নে এই নির্জ্জন অবসরে এই নিস্তরঙ্গ পদ্মার উপরে এই নিভৃত নৌকার মধ্যে বসে, সমুখে সোনার রৌদ্র এবং সুনীল আকাশ নিয়ে আমাকে একখানা বই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হতে হচ্চে। সে বইও কেউ পড়বে না সে সমালোচনাও কেউ মনে রাখ্‌বে না মাঝের থেকে এমন দিনটা মাটি করতে হবে। জীবনে এমন দিন কটাই বা আসে! অধিকাংশ দিনই ভাঙাচোরা জোড়া-তাড়া; আজকের দিনটি যেন নদীর উপরে সোনার পদ্মফুলের মত ফুটে উঠেচে, আমার মনটিকে তার মর্ম্মকোষের মধ্যে টেনে নিচ্চে। আবার হয়েচে কি, একটা হলদে-কোমরবন্ধ্ পরা স্নিগ্ধ বেগ্‌নিরঙের মস্ত ভ্রমর আমার বোটের চারদিকে গুঞ্জনসহকারে চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্চে। বসন্তকালে ভ্রমরগুঞ্জনে বিরহিণীর বিরহ বেদনা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এ কথাটাকে আমি বরাবর পরিহাস করে এসেছি, কিন্তু ভ্রমরগুঞ্জনের মর্ম্মটা আমি একদিন দুপরবেলা বোলপুরে প্রথম আবিষ্কার করেছিলুম। সেদিন নিষ্কর্ম্মার মত দক্ষিণের বারান্দায় বেড়াচ্ছিলুম—মধ্যাহ্নটা মাঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল, গাছের নিবিড় পল্লবগুলির মধ্যে স্তব্ধতা যেন রাশীকৃত হয়ে উঠেছিল। সেই সময়টায় বারান্দার নিকটবর্ত্তী একটা মুকুলিত নিমগাছের কাছে ভ্রমরের অলসগুঞ্জন সমস্ত উদাস মধ্যাহ্নের একটা সুর বেঁধে দিচ্ছিল। সেইদিন বেশ বোঝা গেল মধ্যাহ্নের সমস্ত পাঁচমিশালি শ্রান্তসুরের মূল সুরটা হচ্চে ঐ ভ্রমরের গুঞ্জন—তাতে বিরহিণীর মনটা যে হঠাৎ হাহা করে উঠ্‌বে তাতে আশ্চর্য্য কিছুই নেই। আসল কথাটা হচ্চে, ঘরের মধ্যে যদি খামখা একটা ভ্রমর এসে পড়েই ভোঁভোঁ করতে সুরু করে এবং ক্ষণে ক্ষণে শাসির কাঁচে মাথা ঠুক্‌তে থাকে তবে তাতে করে তার নিজের ছাড়া আর কারো কোনো প্রকার ব্যথা লাগ্‌বার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ঠিক জায়গাটিতে সে ঠিক সুরই দেয়। আজকের আমার এই সোনার মেখলাপরা ভ্রমরটিও ঠিক সুরটি লাগিয়েছে। নিশ্চয়ই বোধ হচ্চে কোনো গ্রন্থের সমালোচনা করচে না—কিন্তু কেন যে আমার নৌকার চারপাশে ঘুর-ঘুর করে মরচে আমি ত বুঝতে পারচিনে—নিরপেক্ষ বিচারকমাত্রই ত বলবে আমি শকুন্তলা বা সে জাতীয় কেউ নই।

শিলাইদা

১৩৫

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪।

সাধনার জন্যে লিখতে লিখতে অন্যমনস্ক হয়ে যাই; নৌকা চলে যায় মুখ তুলে দেখি, খেয়া পারাপার করে তাই দেখতে দেখতে সময় কাটে। ডাঙার আমার বোটের খুব কাছে মন্থরগতি মোষগুলো তাদের বড় বড় মুখ তৃণগুল্মের মধ্যে পূরে দিয়ে সেগুলো নেড়েচেড়ে নিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ নিশ্বাস ফেলে কচ্‌কচ্ শব্দ করতে করতে খেতে খেতে ল্যাজের ঝাপটায় পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে চল্‌তে থাকে,—তার পর একটা অতি দুর্ব্বল উলঙ্গপ্রায় মনুষ্যশাবক এসে এই প্রশান্তপ্রকৃতি প্রকাণ্ড জন্তুটার পিঠে পাঁচনির গুঁতো মেরে হঠ্ হঠ্ শব্দ করতে থাকে, জন্তুটা তার বড় বড় চোখে এক একবার এই ক্ষীণ মানবকটির প্রতি কটাক্ষপাত করে' পথের মধ্যে দুই এক গ্রাস ঘাস-পাতা ছিঁড়ে নিয়ে অব্যাকুলচিত্তে মৃদুমন্দগমনে খানিকটা দূর সরে যায়—আর ছেলেটা মনে করে তার রাখালি কর্ত্তব্য সমাধা হল। আমি রাখালবালকদের মনস্তত্ত্বের এ রহস্যটা এ পর্য্যন্ত ভেদ করে উঠ্‌তে পারলুম না। গোরু কিম্বা মোষ যেখানে নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক তৃপ্তভাবে আহার করচে, অকারণে উৎপাত করে সেখান থেকে তাড়িয়ে আর খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ঠিক জানিনে। পোষমানা সবল প্রাণীদের উপর অনাবশ্যক উৎপীড়ন করে প্রভুগর্ব্ব অনুভব করা বোধ করি মানুষের স্বভাব। ঘন সরস তৃণগুল্মের মধ্যে মোষের এই চরে খাওয়া আমার দেখ্‌তে বড় ভাল লাগে। কি কথা বল্‌তে কি কথা উঠ্‌ল। আমি বল্‌তে যাচ্ছিলুম আজকাল অতি সামান্য কারণেই আমার সাধনার তপোভঙ্গ হচ্চে। পূর্ব্বপত্রে বলেছি কদিন ধরে গোটাকয়েক ভ্রমর আমার বোটের ভিতরে বাইরে অত্যন্ত চঞ্চলভাবে ব্যর্থগুঞ্জনে ও বৃথা অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্চে—রোজই বেলা নটা দশটার সময় তাদের দেখা যায়,—তাড়াতাড়ি একবার আমার টেবিলের কাছে ডেস্কের নীচে রঙীন শাসির উপরে আমার মাথার চারি ধারে ঘুরে আবার হুস্ করে বেরিয়ে চলে যায়। আমি অনায়াসে মনে করতে পারি লোকান্তর থেকে কোনো অতৃপ্ত প্রেতাত্মা রোজ সেই একই সময়ে ভ্রমর আকারে একবার করে আমাকে দেখেশুনে প্রদক্ষিণ করে যাচ্চে। কিন্তু আমি তা মনে করিনে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওটা সত্যকার ভ্রমর, মধুপ, সংস্কৃতভাষায় যাকে কখনো কখনো বলে দ্বিরেফ।

১২৬ শিলাইদা

১৬ই ফাল্গুন, ১৮৯৫।

নিজের সেই সুগভীর স্বপ্নাবিষ্ট বাল্যকালের উদ্ভ্রান্ত কল্পনার কথা মনে পড়চে—খুব বেশি দিনের কথা বলে ত মনে হচ্চে না—অথচ এবারকার মানবজন্মের অর্দ্ধেক দিন ত চলে গেছেই। আমরা প্রত্যেক মুহূর্ত্ত মাড়িয়ে মাড়িয়ে জীবনটা সম্পূর্ণ করি কিন্তু মোটের উপরে সবটা খুবই ছোট; ছটিঘণ্টাকালের নির্জ্জন চিন্তার মধ্যে সমস্তটাকে ধারণ করা যেতে পারে। শেলি ত্রিশটা বছর প্রতিদিন সহস্র কাজে সহস্র প্রয়াসে জীবন ধারণ করে ছটিমাত্র ভলুম জীবনচরিতের সৃষ্টি করেছেন; তার মধ্যেও ডাউডেন সাহেবের বাজে বকুনি বিস্তর আছে। আমার জীবনের ত্রিশটা বছরে বোধকরি একখানা ভলুমও পোরে না। এইত ব্যাপার, এইটুকুমাত্র কাণ্ড, কিন্তু এরই কত আয়োজন কত দুশ্চেষ্টা। এইটুকুর রসদ জোগাবার জন্যে কত ব্যবসা, কত জমিদারী, কত লোকজন। আছি ত এই দেড় হাত চৌকিতে চুপটি করে বসে কিন্তু কত রকমে পৃথিবীর কত জায়গাই জুড়ে আছি,—সেই সমস্ত বাদসাদ পড়ে কেবল বাকি থাকে দুটি ঘণ্টার চিন্তা—তাও বেশি দিনের জন্যে নয়। আজকের আমার এই একলা বোটের দুপুরবেলাকার মনের ভাব, এই একটা দিনের কুঁড়েমি সেই কয়েকখানা পাতার মধ্যে কোথায় বিলুপ্ত হয়ে থাক্‌বে। এই নিস্তরঙ্গ পদ্মাতীরের নিস্তব্ধ বালুচরের উপরকার নির্জ্জন মধ্যাহ্নটি আমার অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতের মধ্যে কি কোথাও একটি অতি ক্ষুদ্র সোনালি রেখার চিহ্ন রেখে দেবে?

১৩৫

শিলাইদা

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫।

আজ আমি এক অনামিকা চিঠি পেয়েছি—তার আরম্ভেই আছে—

পরের পায়ে ধরে প্রাণদান করা

সকল দানের সার।

আমাকে লেখক কখনো দেখেনি ; আমার সাধনার লেখা থেকে পরিচয়। লিখেছে :— "তোমার সাধনায় রবিকর পড়িয়াছে, তাই রবি-উপাসক যত ক্ষুদ্র যত দূরে থাকুক্ তবুও তার জন্যও আজি রবিকর বিকীর্ণ হইতেছে। তুমি জগতের কবি, তবুও সে ভাবিতেছে আজি তুমি তাহারো কবি।" ইত্যাদি। মানুষ প্রীতিদানের জন্য এত ব্যাকুল যে শেষকালে নিজের আইডিয়াকেই ভালবাস্‌তে থাকে। আইডিয়াকে রিয়ালিটির চেয়ে কম সত্য কেন মনে করি! ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা পাচ্চি সেটা বস্তুত যে কি তারই ঠিকানা মিলচে না ; আর আইডিয়া দিয়ে যেটা পাই সেই মনের সৃষ্টির প্রকৃত সত্তার প্রতিই বা কেন তার চেয়ে বেশি অনাস্থা করতে যাব? মানুষমাত্রের মধ্যেই একটি আইডিয়াল মানুষ আছে তাকে কেবল মাত্র ভক্তিপ্রীতিস্নেহের দ্বারা খানিকটা নাগাল পাওয়া যায়। প্রত্যেক ছেলের মধ্যে যে একটি বৃহৎ আইডিয়াল আছে সে কেবল ছেলের মা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করে, অন্য ছেলের মধ্যে সেই অনির্ব্বচনীয়টিকে দেখতে পায় না। মা তার ছেলেকে যা মনে করে' প্রাণ দেয় সেইটেই কি মায়া আর যা মনে করে' আমরা দিতে পারিনে সেইটেই সত্য? প্রত্যেক মানুষই অনন্ত যত্নের ধন, তার মধ্যে সৌন্দর্য্যের সীমা নেই। কি কথা থেকে কি কথা উঠ্‌ল! আসল কথাটা হচ্চে, এক হিসাবে আমি আমার ভক্তটির প্রীতিউপহার গ্রহণের যোগ্য নই—অর্থাৎ যদি সে আমাকে আমার প্রত্যহের আবরণের মধ্যে দেখ্‌ত তাহলে এরকম প্রীতি অনুভব করতেই পারত না,—আর এক হিসাবে আমিও এই পরিমাণে, এমন কি, এর চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে প্রীতি পাবার অধিকারী।

১৭

শিলাইদা

৬ই মার্চ্চ, ১৮৯৫।

সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা ও সুবিধার চর্চ্চা এর মধ্যে কোন্‌টাকে প্রাধান্য দিতে হবে তর্কটা যদি এই হয় তবে ছাতা মাথায় দিয়ে ঘোড়ায় চড়ার দৃষ্টান্তটা সে তর্কের মধ্যে ঠিক পড়ে না। কেননা ঘোড়ায় চড়ে ছাতা মাথায় দিলে সেটা যে অসুন্দর হতেই হবে তা নয়, ওদিকে তাতে ঘোড়া চালাবার অসুবিধাও ঘটতে পারে। আসলে ওটা অসঙ্গত। অসুবিধা, অসৌন্দর্য্য এবং অসঙ্গতি এই তিনটেকেই আমাদের এড়িয়ে চল্‌তে হবে—কিন্তু বোধহয় শেষটাকেই সব চেয়ে বেশি। মেয়েদের মত সাড়ি পরলে যদি কোনো পুরুষকে সুন্দর দেখ্‌তেও হয় তবু সে অদ্ভুত কাজে না যাওয়াই ভাল। সে সম্বন্ধে লজ্জাটা স্বাভাবিক লজ্জা। নিজেকে বেশি করে লোকের চোখে ফেল্‌তে একটা স্বভাবতই সঙ্কোচ হওয়া উচিত কেননা যথার্থ ভদ্রতার স্বভাবই হচ্চে অপ্রগল্‌ভ। যেমন নিজের সম্বন্ধে সর্ব্বদা অতিমাত্র সচেতন থাকাটা কিছু নয় তেমনি পরের চেতনার উপর নিজেকে প্রবলবেগে আছড়ে ফেল্‌তে বিশেষ একটা অপ্রবৃত্তি থাকাই উচিত। অবশ্য এর একটা সীমা আছে, কিন্তু সে সীমা অনেক দূরে। যখন কোনো প্রচলিত প্রথাকে আমি অন্যায় বা অনিষ্টকর মনে করি তখন সে বিষয়ে সাধারণকে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হলে চল্‌বে না। কিন্তু সেই উচ্চ লক্ষ্যটা থাকা চাই। আমাদের দেশে যে মেয়েরা প্রথম জুতা পায়ে এবং ছাতা মাথায় দিয়েছেন নিশ্চয়ই তাঁরা লোকের বিদ্রূপ-চোখেই পড়েছেন—তাই বলে এখানে লোকব্যবহারকে খাতির করা চলে না। কিন্তু মোটের উপর, সাধারণ মানুষের মত চলার সুবিধা এই যে তাতে অন্য লোকেরও চলার সুবিধা হয়। ছোটখাটো সুবিধা অসুবিধার জন্যও যদি সাধারণের অভ্যাস ও সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ করে চল্‌তে হয় তাহলে সেটা ঠিক মশা মারতে কামান পাতার মতই অদ্ভুত হয়ে পড়ে,—সেই অদ্ভুত অসঙ্গতির মধ্যে যে হাস্যকরতা ও বিরক্তিজনকতা আছে তাকে অতিক্রম করবার উপযুক্ত কোনো উচ্চ অভিপ্রায় তার মধ্যে পাওয়া যায় না।

১৩৮

শিলাইদা

৮ই মার্চ্চ, ১৮৯৫।

পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, তার মধ্যে সামান্য চিঠিখানি কম জিনিষ নয়। চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নূতন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে যতটা লাভ করি, চিঠিপত্র দ্বারা তার চেয়ে আরো একটা বেশি কিছু পেয়ে থাকি। চিঠিপত্রে যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি তা নয়, ওর মধ্যে আরও একটু রস আছে যা প্রত্যক্ষ দেখাশোনায় নেই। মানুষ মুখের কথায় আপনাকে যতখানি ও যেরকম করে প্রকাশ করে লেখার কথায় ঠিক ততখানি করে না। আবার লেখায় যতখানি করে মুখের কথায় ততখানি করতে পারে না। এই কারণে, চিঠিতে মানুষকে দেখবার এবং পাবার জন্য আরো একটা যেন নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয় যারা চিরকাল অবিচ্ছেদে চব্বিশ ঘণ্টা কাছাকাছি আছে, যাদের মধ্যে চিঠি-লেখালেখির অবসর ঘটেনি তারা পরস্পরকে অসম্পূর্ণ করেই জানে। যেমন বাছুর কাছে এলে গোরুর বাঁটে আপনি দুধ জুগিয়ে আসে তেমনি মনের বিশেষ বিশেষ রস কেবল বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় আপনি সঞ্চারিত হয় অন্য উপায়ে হবার জো নেই। এই চার পৃষ্ঠা চিঠি মনের ঠিক যে রস দোহন করতে পারে কথা কিম্বা প্রবন্ধে কথনোই তা পারে না। আমার বোধ হয় ঐ লেফাফার মধ্যে একটি সুন্দর মোহ আছে—লেফাফাটি চিঠির প্রধান অঙ্গ—ওটা একটা মস্ত আবিষ্কার।

——•——

১৪০

কলিকাতা

৯ই এপ্রিল, ১৮৯৫।

ঢং ঢং করে দশটা বাজ্‌ল। চৈত্র মাসের দশটা নিতান্ত কম বেলা নয়। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে, কাকগুলো কেন যে এত ডাকাডাকি করচে জানিনে, নকেট কমলালেবু এবং কাঁচামিঠে আমওয়ালা চুপড়ি মাথায় উচ্চস্বরে সুর করে আমাদের দেউড়ির কাছ দিয়ে ডেকে যাচ্চে।

ইচ্ছা করচে কোনো একটা বিদেশে যেতে—বেশ একটি ছবির মত দেশ—পাহাড় আছে, ঝরণা আছে, পাথরের গায়ে খুব ঘন শৈবাল হয়েছে, দূরে পাহাড়ের ঢালুর উপরে গোরু চরচে, আকাশের নীল রংটি খুব স্নিগ্ধ এবং সুগভীর, পাখী পতঙ্গ পল্লব এবং জলধারার একটা বিচিত্র মৃদু শব্দমিশ্র উঠে মস্তিষ্কের মধ্যে ধীরে ধীরে তরঙ্গাভিঘাত করচে। দূর হোক্‌গে ছাই, আজ আর কিছুতে হাত না দিয়ে দক্ষিণের ঘরে একলাটি হাত পা ছড়িয়ে একটা কোনো ভ্রমণবৃত্তান্তের বই নিয়ে পড়ব মনে করচি—বেশ অনেকগুলো ছবিওয়ালা নতুন-পাতকাটা বই। আলোচনা করবার মত, মনের উন্নতি সাধন করবার মত বই পৃথিবীতে অসংখ্য আছে কিন্তু কুঁড়েমি করবার মত বই ভারি কম; সেই রকম বই লিখ্‌তে অসামান্য ক্ষমতার দরকার। অবকাশের অবকাশত্ব কিছুমাত্র নষ্ট করবেনা বরং তাকে রঙীন ও রসালো করে তুল্‌বে, অথচ তাকে মন দিয়ে পড়বারও খোরাক দেবে এই দুই দিক বাঁচিয়ে লেখা শক্ত। ষ্টীল্‌পেনে লিখে মনের উপর দাগ কেটে দিয়ে যাবে না, পালকের কলমে লিখে লেখাটা মনের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে এমন পুষ্পকরথের সারথী পাওয়া যায় কোথায়?

১৪৪

কলিকাতা

২৪শে এপ্রিল, ১৮৯৫।

এদিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এসে গুরুগুর করে মেঘ ডাক্‌তে লাগল, এবং মাঝে মাঝে প্রবল বাতাসে দক্ষিণের বাগানের ছোটবড় সমস্ত গাছগুলো হুসহাস্‌ করে নিশ্বাস ফেলতে লাগল। মধ্যাহ্নটি স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে চারিদিক ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। মনের ভিতরটা একটা অকারণ চঞ্চলতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠ্‌ল—তার হাতে যে কাজটাই দিই সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগ্‌ল।

মনের গতিক আকাশের গতিকের মত,—কিছুই বলা যায় না। মাসের মধ্যে উনত্রিশ দিন সে ছোটখাট উপস্থিত কাজ নিয়ে বেশ চালিয়ে দেয়, কোনো গোল করে না,—হঠাৎ ত্রিশ দিনের দিন সেসমস্ত কাজে সে পদাঘাত করতে থাকে—বলে আমাকে এমন একটা কিছু দাও যা খুব মস্ত, যাতে আমার সমস্ত দিনরাত্রি, সমস্ত ভূত ভবিষ্যৎ একেবারে গ্রাস করে ফেল্‌তে পারে। তখন হাতের কাছে কোথায় বা কি পাওয়া যায়—কেবল ঘরে ঘরে বারান্দায় বারান্দায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকি। কতক-গুলো ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ডবিখণ্ড দস্তুরবাঁধা কাজের মধ্যে মনটা যখন লাফ দিয়ে দিয়ে বেড়ায় তখনি তার সুস্থ অবস্থা বলি, আর যখন সে একটা প্রবল আবেগ একটা বৃহৎ কর্ম্মের মধ্যে একটা অহংবিস্মৃত ঐক্য লাভ করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তখন তাকে বলি পাগলামি। কিন্তু আমি ত মনে করি মানুষের যথার্থ স্বাভাবিক অবস্থাই হচ্চে সেই একটি প্রবল নিষ্ঠার মধ্যে সমস্ত জীবনটাকে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ করবার ইচ্ছা। এই জন্যেই প্রতিদিন সমাজের মধ্যে থেকে এক একদিন মনে হয়—"আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!"

———০———

১৮৮

সাজাদপুর,

২৮ জুন, ১৮৯৫।

বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখ্‌চি—খুব একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। একটু একটু করে লিখচি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্চে। আমি যে সকল দৃশ্য লোক ও ঘটনা কল্পনা করচি তারই চারিদিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি, নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যেরক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে ও সৌন্দর্য্যে সজীব করে তুল্‌চে! কিন্তু পাঠকেরা এর অর্দ্ধেক জিনিষও পাবে না। তারা কেবল কাটা শস্যই পায় কিন্তু শস্যক্ষেত্রের আকাশ বাতাস, শিশির এবং শ্যামলতা সমস্তই বাদ পড়ে যায়। আমার গল্পের সঙ্গে যদি এই মেঘ-মুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধরৌদ্ররঞ্জিত ছোট নদীটি এবং নদীর তীরটি, এই গাছের ছায়া, এবং গ্রামের শান্তিটি এমনি অখণ্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম তাহলে সবাই তার সত্যটুকু একেবারে সমগ্রভাবে একমুহূর্ত্তে বুঝে নিতে পারত। অনেকটা রস মনের মধ্যেই থেকে যায়, সবটা পাঠককে দেওয়া যায় না। যা নিজের আছে তাও পরকে দেবার ক্ষমতা বিধাতা মানুষকে সম্পূর্ণ দেন নি।

১৪৩

সাজাদপুর,

২রা জুলাই, ১৮৯৫।

কাজ করতে করতে কোনো একদিকে মুখ ফেরালেই দেখতে পাই নীল আকাশের সঙ্গে মিশ্রিত সবুজ পৃথিবীর একটা অংশ একেবারে আমাদের ঘরের লাগাও হাজির— যেন প্রকৃতিসুন্দরী কুতূহলী পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মত আমার জানলা দরজার কাছে উঁকি মারচে; আমার ঘরের এবং মনের, আমার কাজের এবং অবসরের চারিদিকে নবীন ও সুন্দর হয়ে আছে। এই বর্ষণমুক্ত আকাশের আলোকে এই গ্রাম এবং জলের রেখা, এপার এবং ওপার, খোলা মাঠ এবং ভাঙা রাস্তা একটা স্বর্গীয় কবিতায় এপলোদেবের স্বর্ণবীণাধ্বনিতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। আমি আকাশ এবং আলো এত অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি! আকাশ আমার সাকি, নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা উপুড় করে ধরেছে—সোনার আলো মদের মত আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাকে দেবতাদের সমান করে দিচ্চে। যেখানে আমার এই সাকির মুখ প্রসন্ন এবং উন্মুক্ত যেখানে আমার এই সোনার মদ সব চেয়ে সোনালি ও স্বচ্ছ সেইখানে আমি কবি, সেইখানে আমি রাজা, সেইখানে আমার সঙ্গে বরাবর ঐ সুনীলনির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় অসীমতার এই রকম প্রত্যক্ষ অব্যবহিত যোগ থাকবে।

১৪৬

পাবনা পথে,
৯ জুলাই, ১৮৯৫।

এই আঁকাবাঁকা ইছামতী নদীর ভিতর দিয়ে চলেছি। এই ছোট খামখেয়ালী বর্ষাকালের নদীটি, এই যে দুইধারে সবুজ ঢালুঘাট, দীর্ঘ ঘন কাশবন, পাটের ক্ষেত, আখের ক্ষেত, আর সারি সারি গ্রাম—এ যেন একই কবিতার কয়েকটা লাইন, আমি বারবার আবৃত্তি করে যাচ্চি এবং বারবারই ভাল লাগ্‌চে। পদ্মার মত বড় নদী এতই বড় যে সে যেন ঠিক মুখস্থ করে নেওয়া যায় না—আর এই কেবল ক'টি বর্ষামাসের দ্বারা অক্ষরগোণা ছোট বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার হয়ে যাচ্চে।

পদ্মানদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ কিন্তু ইছামতী মানুষ-ঘেঁসা নদী;—তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের কর্ম্মপ্রবাহের স্রোত মিশে যাচ্চে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী। স্নানের সময় মেয়েরা যে সমস্ত গল্পগুজব নিয়ে আসে সেগুলি এই নদীটির হাস্যময় কলধ্বনির সঙ্গে একসুরে মিলে যায়। আশ্বিনমাসে মেনকার ঘরের পার্ব্বতী যেমন কৈলাসশিখর ছেড়ে একবার তাঁর বাপের বাড়ি দেখে শুনে যান ইছামতী তেমনি সম্বৎসর অদর্শন থেকে বর্ষার কয়েকমাস আনন্দহাস্য করতে করতে তার আত্মীয় লোকালয়গুলির তত্ত্ব নিতে আসে। তারপরে ঘাটে ঘাটে মেয়েদের কাছে প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত নূতন খবর শুনে নিয়ে, তাদের সঙ্গে মাখামাখি সখীত্ব করে আবার চলে যায়।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আকাশ মেঘে অন্ধকার; গুরুগুরু মেঘ ডাকচে, এবং ঝোড়ো হাওয়ায় তীরের বনঝাউগুলো দুলে উঠ্‌ছে। বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঘন কালীর মত অন্ধকার এবং জলের উপর গোধূলির একটা বিবর্ণ ধূসর আলো পড়ে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার মত দেখ্‌তে হয়েছে। আমি ক্ষীণালোকে কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে চিঠি লিখ্‌চি—উচ্ছৃঙ্খল বাতাসে টেবিলের সমস্ত কাগজ পত্র উড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলবার উপক্রম করচে। ছোট নদীটির উপরে ঘনবর্ষার সমরোহের মধ্যে একটি চিঠি লিখতে ইচ্ছা করচে—মেঘলা গোধূলিতে নিরালা ঘরে মৃদুমন্দস্বরে গল্প করে যাবার মত চিঠি। কিন্তু এটা একটা ইচ্ছামাত্র। মনের এইরকম সহজ ইচ্ছাগুলিই বাস্তবিক দুঃসাধ্য। সে গুলি, হয় আপনি পূর্ণ হয়, নয় কিছুতে পূর্ণ হয় না—তাই অনেক সময় যুদ্ধ জমানো সহজ, গল্প জমানো সহজ নয়।

১৪৫ শিলাইদা

১৪ আগষ্ট, ১৮৯৫।

যত বিচিত্র রকমের কাজ হাতে নিচ্চি ততই কাজ জিনিষটার পরে আমার শ্রদ্ধা বাড়চে। কর্ম্ম যে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ সেটা কেবল পুঁথির উপদেশরূপেই জানতুম। এখন জীবনেই অনুভব করচি কাজের মধ্যেই পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা; কাজের মধ্য দিয়েই জিনিষ চিনি, মানুষ চিনি, বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ঘটে। দেশদেশান্তরের লোক যেখানে বহুদূরে থেকেও মিলেছে সেইখানে আজ আমি নেমেছি; মানুষের পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ এই একটা প্রয়োজনের চিরসম্বন্ধ, কর্ম্মের এই সুদূরপ্রসারিত ঔদার্য্য আমার প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। কাজের একটা মাহাত্ম্য এই যে কাজের খাতিরে নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে অবজ্ঞা করে যথোচিত সংক্ষিপ্ত করে চলতে হয়। মনে আছে সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা একদিন সকালে দেরি করে আসাতে আমি রাগ করেছিলুম; সে এসে তার নিত্যনিয়মিত সেলামটি করে ঈষৎ অবরুদ্ধকণ্ঠে বল্লে কাল রাত্রে আমার আটবছরের মেয়েটি মারা গেছে। এই বলে ঝাড়নটি কাঁধে করে আমার বিছানাপত্র ঝাড়পোচ করতে গেল। কঠিন কর্ম্মক্ষেত্রে মর্ম্মান্তিক শোকেরও অবসর নেই। অবসরটা নিয়েই বা ফল কি? কর্ম্ম যদি মানুষকে বৃথা অনুশোচনার বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্মুখের পথে প্রবাহিত করে নিয়ে যেতে পারে তবে ভালই ত! যা হবার নয় সেত চুকেছে, যা হতে পারে তা হাতের কাছে প্রস্তুত। যে মেয়ে মরে গেছে তার জন্যে শোক ছাড়া আর কিছুই করতে পারিনে—যে ছেলে বেঁচে আছে তার জন্যে ছোট বড় সব কাজই তাকিয়ে আছে। কাজের সংসারের দিকে চেয়ে দেখি—কেউ চাকরি করচে, কেউ ব্যবসা করচে, কেউ চাষ করচে, কেউ মজুরি করচে—অথচ এই প্রকাণ্ড কর্ম্মক্ষেত্রের ঠিক নীচে দিয়েই প্রত্যহ কত মৃত্যু কত দুঃখ গোপনে অন্তঃশীলা বহে যাচ্চে, তার আবরু নষ্ট হতে পারচে না—যদি সে অসংযত হয়ে বেরিয়ে আসত তাহলে কর্ম্মচক্র একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত। ব্যক্তিগত শোকদুঃখটা নীচে দিয়ে ছোটে আর উপরে অত্যন্ত কঠিন পাথরের ব্রিজ বাঁধা—সেই ব্রিজের উপর দিয়ে লক্ষলোকপূর্ণ কর্ম্মের রেলগাড়ি আপন লৌহপথে হুহুঃ শব্দে চলে যায়, নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনটি ছাড়া আর কোথাও কারো খাতিরে মুহূর্ত্তের জন্যে থামে না। কর্ম্মের এই নিষ্ঠুরতাও মানুষের কঠোর সান্ত্বনা।

———o———

১৪৬

শিলাইদা,

৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯৫।

একটা ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আসন্ন হওয়াতেই আজকের এই নিভৃত নিস্তব্ধ উপভোগটি মনের মধ্যে এমন নিবিড়তর হয়ে এসেছে। যেন আমার কাছে আমার এই অভিমানিনী প্রবাসসঙ্গিনী করুণ অনিমেষ নেত্রে বিদায় নিতে এসেছে; আমাকে যেন বল্‌চে, কিসের তোমার ঘরকন্না, এবং আত্মীয়তার বন্ধন—আমি যে তোমার চিরদিনের সাধনা, তোমার সহস্র জন্মপূর্ব্বের প্রিয়তমা, অনন্ত জীবনের অসংখ্য খণ্ড পরিচয়ের মধ্যে তোমার একমাত্র চিরপরিচিতা। কিন্তু বর্ত্তমানের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সংসারে এ সব কথা অলীক শোনাবে। তা হোক্, এই শরতের অপর্য্যাপ্ত শান্তির মধ্যে আমার আত্মাকে স্তরে স্তরে সিক্ত করে নেওয়া আমার পক্ষে কম ব্যাপার নয়। এ জীবনে আমার যা-কিছু গভীরতম তৃপ্তি ও প্রীতি সে কেবল এই রকম নির্জ্জন সুন্দর মুহূর্ত্তে পুঞ্জীভূতভাবে আমার কাছে ধরা দেয়। আমার জীবনের অন্তস্তলে ক্রমশই যেন একটা নূতন সত্যের উন্মেষ হচ্চে; কেবল তার আভাস পাই, যে, আমার পক্ষে সে একটা স্থায়ী নিত্য সম্বল, আমার সমস্ত জীবন-খনিজ-গলানো খাঁটি সোনাটুকু, আমার সমস্ত দুঃখ-কষ্টের তুষের ভিতরকার অমৃত শস্যকণা; সেটাকে যদি কখনো পরিস্ফুট করে পাই তাহলে সে আমার টাকাকড়ি খ্যাতিপ্রতিপত্তি সব চেয়ে বেশি হয়—যদি সম্পূর্ণ নাও পাই তবু সেই দিকে চিত্তের অনিবার্য্য স্বাভাবিক প্রবাহ সেও একটা পরম লাভ।

১৪৯

কুষ্টিয়া,
৫ই অক্টোবর, ১৮৯৫।

কে আমাকে গভীর গম্ভীরভাবে সমস্ত জিনিষ দেখতে বল্‌চে—কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থির কর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সঙ্গীত শুন্‌তে প্রবৃত্ত করচে—বাইরের সঙ্গে আমার সমস্ত সূক্ষ্ম এবং প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে প্রতিদিন সজাগ সচেতন করে তুল্‌চে। হৃদয়ের প্রাত্যহিক পরিতৃপ্তির প্রাচুর্য্যে মানুষের কোনো ভাল হয় না—তাতে প্রচুর উপকরণের অপব্যয় হয়ে কেবল অল্পই সুখ উৎপন্ন করে এবং কেবল আয়োজনেই সময় কেটে গিয়ে উপভোগের অবসরমাত্র থাকে না। কিন্তু ব্রতযাপনের মত জীবনযাপন করলে দেখা যায় অল্প সুখই প্রচুর সুখ এবং সুখই একমাত্র সুখকর নয়। চিত্তের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ মননশক্তিকে যদি সচেতন রাখ্‌তে হয়—যা কিছু পাওয়া যায় তাকেই পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করবার শক্তিকে যদি উজ্জ্বল রাখ্‌তে হয় তাহলে নিজেকে অতিপ্রাচুর্য্য থেকে বঞ্চিত করা চাই। Goetheর একটি কথা আমি মনে করে রেখেছি সেটা শুনতে সাদাসিধা কিন্তু বড়ই গভীর—

Entbehren sollst du, sollst entbehren.
Thou must do without, must do without.

কেবল হৃদয়ের অতিভোগ নয়, বাইরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিষপত্রও আমাদের অসাড় করে দেয়। বাইরের সমস্ত যখন বিরল তখনি নিজেকে ভালরকমে পাই।

* * * * *

আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্ম্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে হয় তার পরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি। যা মুখে বল্‌চি, যা লোকের মুখে শুনে প্রত্যহ আবৃত্তি করচি তা যে আমার পক্ষে কতই মিথ্যা তা আমরা বুঝতেই পারিনে। এদিকে আমাদের জীবন ভিতরে ভিতরে নিজের সত্যের মন্দির প্রতিদিন একটি একটি ইট নিয়ে গড়ে তুল্‌চে। জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে দেখি তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারিনে—প্রত্যেক পদটা বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত বাক্যটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না

সেই রকম। কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনব্যাপারের অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সর্জ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি। বুঝতে পারি যেমন গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠ্‌চে আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন চল্‌চে—আমার সুখদুঃখ বাসনা বেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ করচে—এর থেকে কি যে হয়ে উঠ্‌চে তা আমরা স্পষ্ট জানিনে কারণ আমরা একটি ধূলিকণাকেও জানিনে। কিন্তু নিজের প্রবহমান জীবনকে যখন নিজের বাহিরে নিখিলের সঙ্গে যুক্ত করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই—আমি আছি, আমি চল্‌চি, আমি হয়ে উঠ্‌চি এইটেকেই একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝ্‌তে পারি। আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সমস্তই আছে—আমাকে ছেড়ে কোথাও একটি অণুপরমাণুও থাক্‌তে পারে না; এই সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে এই জ্যোতির্ম্ময় শূন্যের সঙ্গে আমার অন্তরাত্মার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার যোগ; অনন্ত জগৎপ্রাণের সঙ্গে আমার এই যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধেরই প্রত্যক্ষভাষা এই সমস্ত বর্ণগন্ধগীত। চতুর্দ্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমার মনকে লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ক্রমাগতই আন্দোলিত করচে, কথাবার্ত্তা দিন-রাত্রিই চল্‌চে। এই যে আমার অন্তরের সঙ্গে বাহিরের কথাবার্ত্তা আনাগোনা আদানপ্রদান—আমার যা কিছু পাওয়া সম্ভব তা কেবলমাত্র এর থেকেই পেতে পারি, তা অল্পই হোক্ আর বেশিই হোক; শাস্ত্রথেকে যা পাই তা এইখানে একবার যাচাই করে না নিলে তা পাওয়াই হয় না। এই আমার অন্তরবাহিরের মিলনে যা নিরন্তর ঘটে উঠ্‌চে আমার ক্ষুদ্রতা তার মধ্যে বিকার ও বাধার সঞ্চার করে' তাকে যেন আচ্ছন্ন না করে—আমার জীবন যেন এই পরিপূর্ণ মিলনের অনুকূল হয় নিখিলকে আমার মধ্যে যেন আমি বাধা না দিই। কৃত্রিম জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলি একে একে উন্মুক্ত হয়ে যাক্, মুগ্ধ সংস্কারের এক একটি বন্ধন কঠিন বেদনার দ্বারা একান্ত ছিন্ন হোক্, নিবিড় নিভৃত অন্তরতম সান্ত্বনার মধ্যে অন্তঃকরণের চিরসঞ্চিত উত্তাপ একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মুক্তিলাভ করুক্ এবং জগতের সঙ্গে সরল সহজ সম্বন্ধের মধ্যে অনায়াসে দাঁড়িয়ে যেন বল্‌তে পারি আমি ধন্য!

১২৮

কুষ্টিয়া

৬ই অক্টোবর, ১৮৯৫

আমার দিনগুলিকে রথীর কাগজের নৌকার মত একটি একটি করে ভাসিয়ে দিচ্চি। কেবল মাঝে মাঝে একটি আধটি গান তৈরি করচি এবং শরৎকালের প্রহরগুলির মধ্যে কুণ্ডলায়িত হয়ে পড়ে আছি। এই অপর্য্যাপ্ত জ্যোতির্ম্ময় নীলাকাশ আমার হৃদয়ের মধ্যে অবনত হয়ে পড়েছে, আলোক রক্তের মধ্যে প্রবেশ করচে, সর্ব্বব্যাপী স্তব্ধতা আমার বক্ষকে দুই হাতে বেষ্টন করে ধরেছে, একটি সকরুণ শান্তি আমার ললাটের উপর চুম্বন করচে। পূজার ছুটিতে সবাই কাজকর্ম্ম ছেড়ে বাড়িতে এসেছে—আমারো এই বাড়ি;—আমার বাড়ির লোকটি আমার সমস্ত খাতাপত্র কেড়েকুড়ে নিয়ে বল্‌চে তুমি কাজ ঢের করেচ, এখন একটুখানি থাম। আমিও তাই নিরাপত্তিতে থেমে আছি,—এর পরে কর্ম্ম যখন আবার আমাকে একবার হাতে পাবেন তখন টুঁটি চেপে ধরবেন—তখন আমার এই ঘরের লোকটি, আমার এই ছুটির কর্ত্রী, কোথায় থাকবেন তাঁর আর উদ্দেশ পাওয়া যাবে না। প্রায় মাঝে মাঝে মনে করি সাধনার লেখার ঝুড়ি পদ্মার জলে ভাসিয়ে দেব—কিন্তু জানি, ভাসিয়ে দিলেও সে আমাকে তার পিছন পিছন টেনে নিয়ে চল্‌বে।

১৪৯

শিলাইদা

১২ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫।

সে দিন সন্ধ্যাবেলায় একখানা ইংরিজি সমালোচনার বই নিয়ে কবিতা সৌন্দর্য্য আর্ট প্রভৃতি মাথামুণ্ড নানা কথার নানা তর্ক পড়া যাচ্ছিল। এক এক সময় এই সমস্ত কথার বাজে আলোচনা পড়তে পড়তে শ্রান্ত চিত্তে সমস্তই মরীচিকাবৎ শূন্য বোধ হয়—মনে হয় এর বারো আনা কথা বানানো। সেদিন পড়তে পড়তে মনটার ভিতরে একটা নীরস শ্রান্তির উদ্রেক হয়ে একটা বিদ্রূপপরায়ণ সন্দেহ সয়তানের আবির্ভাব হল। এদিকে রাত্রিও অনেক হওয়াতে বইটা ধাঁ করে মুড়ে ধপ্ করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে শুতে যাবার উদ্দেশে এক ফুঁয়ে বাতি নিবিয়ে দিলুম। দেবামাত্রই হঠাৎ চারিদিকের সমস্ত খোলা জানলা থেকে বোটের মধ্যে জ্যোৎস্না একেবারে ভেঙে পড়ল। হঠাৎ যেন আমার চমক্ ভেঙে গেল। আমার ক্ষুদ্র একরত্তি বাতির শিখা সয়তানের মত নীরস হাসি হাসছিল, অথচ সেই অতিক্ষুদ্র বিদ্রূপহাসিতে এই বিশ্বব্যাপী গভীর প্রেমের অসীম আনন্দচ্ছটাকে একেবারে আড়াল করে রেখেছিল। নীরস গ্রন্থের বাক্যরাশির মধ্যে কি খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। সে কতক্ষণ থেকে সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করে নিঃশব্দে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। যদি দৈবাৎ না দেখে অন্ধকারের মধ্যে শুতে যেতুম তাহলেও সে আমার সেই ক্ষুদ্র বাতির ব্যঙ্গের কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করে নীরবেই নিলীন হয়ে যেত। যদি ইহজীবনে নিমেষের জন্যও তা কে না দেখ্‌তে পেতুম এবং শেষরাত্রের অন্ধকারে শেষবারের মত শুতে যেতুম তাহলেও সেই বাতির আলোরই জিৎ থেকে যেত অথচ সে বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে সেই রকম নীরবে সেই রকম মধুর মুখেই হাস্য করত—আপনাকে গোপন করত না, আপনাকে প্রকাশও করত না।

১৫৩

নাগর নদীর ঘাট,

১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫।

কাল অনেকদিন পরে সূর্য্যাস্তের পর ওপারের পাড়ের উপর বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে উঠেই হঠাৎ যেন এই প্রথম দেখ্‌লুম, আকাশের আদিঅন্ত নেই—জনহীন মাঠ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হাহা করচে—কোথায় দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম কোথায় একপ্রান্তে সঙ্কীর্ণ একটু জলের রেখা! কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা,—মনে হয় যেন একটি সোনার চেলিপরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেচে; ধীরে ধীরে কত শত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্ব্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগযুগান্তর কাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে, মৌনমুখে, শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আস্‌চে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ?